নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ

প্রথম খণ্ড

প্রথম মুদ্রণ
মাঘীপূর্ণিমা—১৩৪১ বঙ্গাব্দ

লীলা

প্রকাশন :
স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী
সারস্বত মঠ
জোড়হাট (আসাম)

মুদ্রণ :
শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ অঙ্কন :
শিল্পী শ্রীনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
ভাটপাড়া (২৪ পরগণা)

প্রাপ্তিস্থান :
(১) দক্ষিণ বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম
হালিসহর : ২৪ পরগণা

(২) মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

(৩) সর্ব্বোদয় বুকস্টল
হাওড়া স্টেশন, পোঃ হাওড়া (পঃ বঃ)

শ্রীশ্রীজগন্নাথো জয়তি

ক্ষেত্র—পুরুষোত্তমধাম, দেবতা—জগন্নাথ, দেবী—বিমলা, তীর্থ—মহোদধি, বেদ—ঋক্, মহাবাক্য—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।

গোবর্ধন মঠ—পূর্বাম্নায়

—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য

মহাম্বুধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে

বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

* * *

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো

নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।

রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো

জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে॥

—মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

সুনীল বারিধিবক্ষ দিগন্তপ্রসারী
মিলাইয়া আত্মপ্রাণ সুনীল অম্বরে,
অনন্তে অনন্ত মিশি' অনন্তবিথারী
অনন্ত-আভাস দেয় মানব-অন্তরে।
তটে তার ভুক্তিমুক্তিক্ষেত্র নীলাচল
লীলাচ্ছলে ধরি' বক্ষে স্বামী জগন্নাথে,
সাম্য মৈত্রী উদারতা আনন্দ উছল
শিক্ষা দেয় জগতেরে স্নিগ্ধ আঁখিপাতে॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণ-বিবর্জিত
পরমতত্ত্বের হেথা অচল বিশ্রাম;
সগুণ-নির্গুণ-মূর্ত্তি দারুব্রহ্ম চির-বিরাজিত
রচি' হেথা সম্মিলিত ভোগ-মোক্ষ-ধাম॥
এই পুরুষোত্তমভূমে চারুব্রহ্ম শ্রীচৈতন্ত করেন বিহার।
ঠাকুর নিগমানন্দ বিশ্রাম করেন হেথা অন্ত্যপর্ব্বে তাঁর॥

—সিদ্ধানন্দ

…শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমধাম পূর্বভারতের তীর্থ-চূড়ামণি। জগন্নাথদেব বৈষ্ণবের বামনমূর্তি শ্রীবিষ্ণু। শাক্তমতে শ্রীক্ষেত্র একান্ন পীঠের অন্যতম শক্তিপীঠ—বিমলা দেবী ক্ষেত্রাধিশ্বরী ভৈরবী। শৈবের কাছে জগন্নাথ মহাভৈরব। তিনি যে গাণপত্যেরও পরমদেবতা, এটি বোঝাতেই তাঁর গণেশবেশ হয়। বেদে বিষ্ণু সপ্তাদিত্যের একজন। পুরাণে বিষ্ণু-অবতার বামনদেব অদিতিপুত্র, সুতরাং আদিত্য। অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ সৌর সম্প্রদায়েরও ব্রহ্মস্বরূপ। এমনি করে এক জগন্নাথবিগ্রহে হিন্দুভারতের পঞ্চোপাসকই স্ব স্ব ইষ্টকে দর্শন করেন। তার কারণ—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ

জগন্নাথদেব এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত অমূর্ত ব্রহ্মের মূর্ত রূপ। তিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পুরুষোত্তম। সর্বধর্ম-সমন্বয়ে অ-সাম্প্রদায়িক ব্রহ্মোপাসনাই শ্রীশ্রীজগন্নাথপূজার প্রকৃত তাৎপর্য। তাই পুরুষোত্তমধামে গোবর্ধন মঠ প্রতিষ্ঠা করে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য ঘোষণা করলেন এখান হতেই পূর্বাঞ্চলে বেদানুশাসন করা হবে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই 'লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ'। জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণ যে তত্ত্বত অভিন্ন, ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ আবার সুদৃঢ়রূপে এটি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। গীতোক্ত কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির মিলনে ভগবদ্‌ভক্তের সিদ্ধদশাপ্রাপ্তি। ভাগবতের সিদ্ধ দৃষ্টিতে 'এ-সংসার ধোঁকার টাটি' নয় আর, 'সুখের কুটি'। তখন 'খাই-দাই'; 'আনন্দবাজারে মজা লুটি'। পুরীর আনন্দবাজারে বর্ণাশ্রমধর্ম শাস্ত্রাচার ভুলে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পরস্পরের মুখে মহাপ্রসাদ তুলে দিয়ে প্রমাণ করেন—

"যিনি যেরূপ পূজাপদ্ধতি অবলম্বন করুন না কেন, (হিন্দুর) সে-সকল পূজাই এক অদ্বয় ব্রহ্মের উপাসনা।…চূড়াদেশের অনন্ত আকাশে কেবল 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।" (জ্ঞানীগুরু)

বেদবিভাগকর্তারূপে যিনি ব্রহ্মকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সরস্বতী-তীরে শ্রীমদ্‌ভাগবতরচনাতে সেই বেদব্যাসের অখিল কর্ম মহাজ্ঞানে পরমা বিশ্রান্তি লাভ করেছিল। ব্রহ্মানন্দলোলুপ পুত্র শুককেও তিনি লীলারস আস্বাদনের জন্য ডেকে ফিরালেন। গুরু-পিতার কৃপায় 'নিগমকল্পতরুর গলিত ফল' আস্বাদ করে শুকদেব হলেন 'হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতিঃ ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।' হলেন 'প্রেমী পরমহংস'। 'প্রেমী পরমহংস লোকশিক্ষা দেন' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন। (কথামৃত ৩।১১।২)

"জ্ঞানপথে অদ্বৈততত্ত্ব লাভ করিলে যে-কোন সংশ্লেষণ অর্থাৎ ভক্তিপথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। * * জ্ঞান-ভক্তি উভয় মার্গাবলম্বনে যুগপৎ নিত্য ও লীলা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মবিৎ—তিনিই প্রেমিক-শিরোমণি। একমাত্র তাঁহার জীবনই সম্পূর্ণ।" (প্রেমিকগুরু)

অতএব পুষ্করতীর্থের সাবিত্রী পাহাড়ে জ্ঞানসিদ্ধ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর উপদেশে যিনি সন্ন্যাস-যোগে সমারূঢ় হয়েছিলেন, ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়ে এই জীব-জগৎ তাঁরই বিকাশ জেনে জগদ্রূপী জগন্নাথের লীলানন্দ উপলব্ধি করে জীবন্মুক্ত দশায় সেই পরমহংস নিগমানন্দদেব স্থিত হলেন পুরুষোত্তমধামে। এটি ভারতের সনাতন সারস্বত ধারা…

ভূমিকা

ভূমিকা লেখা সহজসাধ্য নয়। ভূমিকা উদ্দিষ্ট গ্রন্থসৌধের তোরণ-দ্বার, আবার তাহা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচায়কও বটে। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে উদ্‌যুক্ত হইয়াছি স্বয়ং গ্রন্থকর্ত্রীর অনুরোধে। ইহা শুধু অনুরোধই নয়, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠার দাবিও বটে। সে দাবি জ্যেষ্ঠের পক্ষে এড়ানো দায়। তাই অক্ষমতা সত্ত্বেও ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি নির্ব্বিচারে।

লেখিকা এক লিপিতে আমাকে লিখিয়াছেন—"সর্ব্বশেষ কথা—এ-বইএর ভূমিকা আপনি লিখবেন এই আমার ইচ্ছা। 'বাংলার সাধনায় ঠাকুর' প্রকাশে সত্যদা* ছিলেন অগ্রণী। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহেই ও-বই লেখা। সুতরাং মঙ্গলাচরণের ভার তাঁকেই দিয়েছিলাম। কিন্তু এ-বই প্রকাশে আপনিই অগ্রণী—সত্যদা আছেন নেপথ্যে। এই উৎসাহের তর-তমে আমার মতে গূঢ় কারণও আছে। সত্যদার মেজাজটি হল মুখ্যত বুদ্ধিজীবী দার্শনিকের। আর আপনি মেজাজে আবেগপ্রধান কবি। লীলাকথায় সত্যদার তত রুচি নাই যত আছে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের শাস্ত্রীয় আলোচনায়। আর আপনার যে হৃদয়ানন্দ লীলামৃতেই সমধিক রুচি, তা কি অস্বীকার করতে পারেন? তা বলে ভাববেন না আমি সত্যদাকে বেরসিক ও আপনাকে তত্ত্ব ও সত্যবিমুখ একটি ভাবুক মনে করি। কার কিসে অধিক উল্লাস—কেবল সেইটাই বলতে চাই।

* বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী।

"মোট কথা ভূমিকা আপনি লিখুন এই আমার অভিলাষ। আপনার দৃষ্টিকোণ হতে ঠাকুরসম্বন্ধে কিছু লিখে (এবং তা নিছক কবিতা নয়! গল্প লেখাতে যে আপনার হাত ভালই চলে সত্যদা নিজে তা certify করেছেন) প্রচার বিভাগের কার্য্যাধ্যক্ষের ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করুন। কেবল মুদ্রণব্যাপার আর প্রুফরিডার হয়েই কি প্রচার বিভাগের দায়িত্ব শেষ করতে চান ?......... "

এই গ্রন্থ সারস্বত মঠ প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া গ্রন্থকর্ত্রীর এই দাবি। আমার অনুরোধক্রমেই তিনি সামান্য দক্ষিণার বিনিময়ে এই গ্রন্থের স্বত্ব সারস্বত মঠকে দিয়া দিয়াছেন। তিনি দক্ষিণা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই, আমিই তাঁহাকে জোর করিয়া উহা গছাইয়া দিয়াছি। এক্ষণে গ্রন্থপ্রকাশকালে প্রকারান্তরে তিনি তাহার অধিক ফিরাইয়া দিয়াছেন এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আলোকচিত্রাবলীর ব্লক নির্মাণ ও তাহাদের মুদ্রণব্যয় বহনের মাধ্যমে।

এই গ্রন্থের পরিচয় প্রদানের পূর্ব্বে গ্রন্থকর্ত্রীর পরিচয় প্রদান একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। গ্রন্থমধ্যেই গ্রন্থকর্ত্রী আত্মপরিচয় প্রদানপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"......এর পরই '৩২ সালের আষাঢ় মাসে দৈবচক্রে একটি অনাথা শিশুর ভার নিতে হল ঠাকুরকে। মেয়েটির মা জন্মক্ষণেই মারা যান; মেয়ের বাপ বরাবরই বৈরাগ্যপরায়ণ। তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ ক'রে সন্ন্যাসগ্রহণে ইচ্ছুক জেনে ঠাকুর তাঁকে ভারমুক্ত করলেন। কুটিরের মায়েরা তিনমাসের মেয়েকে মানুষ করতে হিমসিম খান। নীলাচল কুটির আশ্রম নয়—গৃহস্থবাড়ি, উত্তরকালে ওই মেয়েটির জন্যই ঠাকুরকে সবার কাছে এ কথা বলতে হত। 'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী'। আমিও ঠাকুর মহারাজের সর্ব্বশেষ দায়—বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতনের শেষ পোষ্য।" (৬১ পৃঃ)

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ "বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ" গ্রন্থের "পরিচিতি"তে ইহা আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন : "অতি শৈশবে শ্রীমতী নারায়ণীর জনক শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরীধামে তাহাকে গুরুপাদপদ্মে উৎসর্গ করেন। তিনি অদ্যাবধি জীবিত কিন্তু শাস্ত্রমতে কন্যার নিকট মৃত—কারণ নারায়ণীকে নীলাচল কুটিরে রাখিয়াই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম নিরঞ্জনানন্দ সরস্বতী। আমাদের ঠাকুর পিতার অধিক বাৎসল্যে তাঁহার এই শিশুকন্যাটিকে মানুষ করেন। আমরা তাহাকে 'লীলা' বলিয়া ডাকি। দুই নামই ঠাকুর মহারাজের দেওয়া। আমাদের লীলা পার্থিব বিদ্যায় এম. এ. ডিগ্রীধারিণী এবং পারমার্থিক বিদ্যাতেও সম্পন্না। বিজ্ঞানভৈরব মহামাহেশ্বর-পদবীতে আরূঢ় সাধনসিদ্ধ মহাপুরুষের উপযুক্ত মানসকন্যাই বটে। 'বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ'কে সে ক্রমবিকাশের পথে যে ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাতে তাহার দক্ষতা, বিচারশক্তি এবং অন্তর্দৃষ্টির নিখুঁত পরিচয় মিলে।"

ইহার সহিত আমি আর একটু সংযোগ করিয়া বলি—শিশুকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে দশ বৎসর এবং বিদ্যোত্তীর্ণ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিদগ্ধ সন্ন্যাসীশিষ্য শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতীর (অনির্বাণ) সান্নিধ্যে পাঁচ বৎসর অবস্থানের ফলে তাঁহার জীবন অনন্যসাধারণ অধ্যাত্ম চেতনায় এবং লৌকিক সারস্বত চেতনায় যুগপৎ সমারূঢ় হইতে সক্ষম হইয়াছে—তাঁহাকে আমরা সরস্বতীর বরপুত্রীরূপে পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছি।

তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলার কথাই মনে পড়িয়া যায়। জন্মাবধি শকুন্তলা মুনিবরের শান্তরসাস্পদ আশ্রম-আবেষ্টনীতেই লালিতা-পালিতা। আমাদের লীলাও তাই। পার্থক্য—শকুন্তলার জন্মান্তরীণ সংস্কার শকুন্তলাকে সংসার-পথে টানিয়া লইয়া

গিয়াছিল আর লীলার সংস্কার এবং তাহার পালক-পিতার অনুশাসন তাহাকে চিরতপস্বিনী করিয়া ছাড়িয়াছে। মাঝে মাঝে মনে হয় লীলা যদি আজ সংসার-লীলায় অনুপ্রবেশ করিত, তাহা হইলে কি আমরা তাহার লেখনীমুখে ঠাকুরের লীলা-কাহিনী প্রকাশ পাইতে দেখিতাম? সব 'অবিস্মরণীয়' বিস্মৃতির অতল সলিলে লীন হইয়া যাইত।

শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন অন্তর্য্যামী—জীবমাত্রেরই অন্তরের পরিচয় ছিল তাঁহার নিকট সুপরিস্ফুট। একজনকে দেখিবামাত্র তিনি তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। লীলার সংস্কার প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি তাহাকে ত্যাগের পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহার মধ্যে কি দেখিয়াছিলেন তিনিই জানেন। তবে আমরা তাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিতা, তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষিতা, তাঁহার আদরে লালিতা-পালিতা লীলার লেখনীমুখে যে অমৃত নির্ঝরের আস্বাদন পাইতেছি—বলা বাহুল্য তাহা তাঁহারই করুণার ফল।

মনে পড়ে ঠাকুর একবার বগুড়া গিয়াছেন, উঠিয়াছেন মালতীনগরের ভক্ত সুরেন্দ্রমোহন দাশগুপ্তের বাড়ীতে। কথাপ্রসঙ্গে সুরেনদাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন—"তোরা কি মনে করিস্ আমি লীলুকে ভালবাসি স্নেহে অন্ধ হয়ে? তা নয়; তার ভিতর এমন জিনিস আছে, এমন বৈশিষ্ট্য আছে যাতে আমি মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালবাসি।" আর লীলুও ভালবাসে ঠাকুরকে অতি আপনভাবে—একান্ত আত্মীয় পরমাত্মীয় পিতৃভাবে। ঠাকুর তাহার বাবা, সে তাহার মেয়ে; কোন পাতান সম্বন্ধ নয়—সহজ সম্বন্ধ। মাঝে মাঝে আবার ঠাকুর হইয়া যান তাহার অশান্ত দুষ্ট ছেলে, আর সে হইয়া যায় তাঁহার মা-মণি!

১৩৩৯ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠ—আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের একটি বিশিষ্ট ঘটনা—যাহা শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃতের ১২৫ পৃষ্ঠায় বিধৃত হইয়া আছে :—

"আজ আরতি-কীর্ত্তনের পর প্রণামের সময় ঠাকুর যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন এক আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে পাইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘর হইতে ছোট্ট মেয়ে লীলার হাতটি ধরিয়া বাহির হইলেন। ঠাকুরের চোখে-মুখে অপূর্ব্ব ভাব। করুণ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—

'এই যে দেখ্‌ছ লীলাকে, ও-ই ঠিক আমাকে মানুষভাবে ভালবাসে। ও ঠাকুর বুঝে না, গুরু বুঝে না—ও আমাকে বাবা বলেই জানে। এমন কি মাঝে মাঝে আমাকে বলে—বাবা! তুমি গুরু হতে যাও কেন?

অবশ্য এরও এই ভাব থাকবে না। যখন বড় হয়ে উঠবে তখন ভয়-সঙ্কোচ সবই এসে চিত্তকে সঙ্কুচিত করে দেবে।'......"

কিন্তু লীলার অন্তরে ভয়-সঙ্কোচ আসার পূর্ব্বেই ঠাকুর চলিয়া গেলেন চিরতরে এই সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইয়া। লীলার অন্তরে রহিয়া গেল সেই নিঃসঙ্কোচ ভালবাসার স্মৃতি—যাহার ফল আজিকার "নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ" গ্রন্থ।

এই গ্রন্থরচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি গ্রন্থারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রাচীনেরা অনেকেই গতায়ু। ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন যাঁরা যতদূর অনুমান আর বিশ বছরের মধ্যেই তাঁরা বিদায় নেবেন ধরাপৃষ্ঠ হতে। তারপর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের আর উপায় থাকবে না। থাকবে শুধু অবাধ কল্পনার অবসর। তার আগে আমাদের একটা দায় আছে বৈকি। জীবনী লেখার নয়, তথ্যপরিবেশনের দায়।"—(পৃঃ ৩)

এই গ্রন্থ সেই তথ্যপরিবেশনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ। ইহা ঠাকুরের জীবন-চরিত নহে, জীবন-চরিতের অনবদ্য উপাদান।

লেখিকা পুনরায় লিখিয়াছেন—"ঠাকুরের কথা জগতে প্রচার করার যদি অভিপ্রায় থাকে বিধাতার, তবে কোন-না-কোন দিন তেমন চরিতকার আসবেন যিনি বৈয়াসকি-চেতনায় আবিষ্ট, যাঁর সম্বন্ধে অনায়াসে বলা যাবে 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'। সত্য আর ভাব মিলিয়ে সত্যের কল্পমূর্ত্তি গড়ে তুলবেন তিনি—পরমহংস নিগমানন্দের দিব্য আলেখ্য। *** মুটে মজুরেরা বয়ে আনে বালি চুণ ইট সুরকি। মিশিয়ে মশলা তৈরি করে মিস্ত্রীর দল, আর সৌধ রচনার দায়িত্ব নেন স্থপতি স্বয়ং। আমার ভূমিকা এই কুলি-মজুরের ভূমিকা। কিছু মাল-মশলা বয়ে এনে দিতে পারি আমি, তার বেশি ক্ষমতা আমার নাই।......" (পৃঃ ৩-৪)

গ্রন্থরচয়িত্রীকে আমি মুটে মজুরের শ্রেণীতে নামাইয়া আনিতে রাজী নহি—তিনি নিষ্প্রাণ উপাদানসংগ্রহকারিণীর ভূমিকা লন নাই, লইয়াছেন প্রাণবন্ত জীবন্ত আলেখ্য-সরবরাহকারিণীর ভূমিকা। মর্ম্মরমূর্ত্তি রচনা করেন প্রখ্যাত ভাস্কর, কিন্তু তাঁহাকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সব দিকের আলোক-চিত্র সরবরাহ করিতে হয় আলেকচিত্রশিল্পী ফটোগ্রাফারকে—সম্মুখ, পশ্চাৎ, পার্শ্ব, ঊর্দ্ধ, অধঃ। এগুলি না হইলে যত বড় ভাস্করই হউন না কেন, যথাযথ মূর্ত্তি রচনা করিতে তিনি সক্ষম হন না। আমাদের নারায়ণী বা লীলা এই ফটোগ্রাফারের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল চেতোদর্পণে—শৈশবের স্বচ্ছ মানসপটে ঠাকুরের যে অনবদ্য আলেখ্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাই তিনি পরিবেশন করিয়াছেন এই গ্রন্থে। এ শুধু ঠাকুরকে সাজাইয়া গুজাইয়া তাঁহাকে সচেতন করিয়া ফটো তোলা নয়—

তাঁহার অজ্ঞাতসারে সর্ব্বাবস্থার ফটো উঠিয়া গিয়াছে আপনা-আপনি লীলার অন্তর-ফিল্মে, তাহারই প্রকাশ এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়।

অনেকে বলিতে পারেন অত ছোট বয়সের কথা লেখিকার স্মৃতিপটে জাগ্রত রহিল কেমন করিয়া? সেই সন্দেহের উত্তর দিয়াছেন লেখিকা স্বয়ং এই গ্রন্থমধ্যেই। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—"আমার স্মৃতিতে ঠাকুর ধরা দিয়েছেন হিমালয়ের পটভূমিকায়। দার্জ্জিলিঙ্ গিয়ে যেন তাঁকে ভাল করে দেখলাম, চিনলাম, বুঝি বা আত্মীয় ব'লে ভালবাসতেও শুরু করলাম। তাঁর চলাফেরা কথাবার্ত্তা আহার-বিহারের বৈশিষ্ট্য সেই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার পর থেকে সব মনে আছে—ভুলিনি। অথচ এর আগে পর্যন্ত মনটা ফাঁকা—কারও স্থান নেই সেখানে কোন ছাপই পড়েনি। স্মৃতির এই প্রবোধনীকৃত্য সম্পন্ন করেছে নিশ্চয়ই দার্জিলিঙ্—সেখানকার পরিস্থিতির অভিনবত্ব। তাই '৩৬ সালের দার্জিলিঙ্-পর্ব আমার জীবনের মাহেন্দ্রলগ্ন, অমৃতযোগ! আমার বয়স তখন চার।" (পৃঃ ৯১)

"১৩৪১ সালে ঠাকুর একাদিক্রমে প্রায় সাত মাস পুরীতে ছিলেন। ঠাকুরকে নিয়ে আমার যত স্মৃতি তার সব চেয়ে উজ্জ্বল অংশ এই ১৩৪১ সালেই ধরা আছে। এর আগে তাঁকে দেখেছি শিশুর চোখে। এবার দেখলাম বালিকার চোখে। তখন আমার বয়স নয়। লোকের কাছে ন' বছর বয়স হয় তো কিছু না। কিন্তু আমার কাছে তা যেন পরিণত মনের স্মৃতি হয়ে আছে। পরিষ্কার মনে আছে সে-সব দিনের কথা। খুব কাছে থেকে দিনের পর দিন তাঁকে দেখেছি। সেই শেষ। তার পর তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম চার মাসের জন্য। ছবির পর ছবি ধরা আছে মনের পাতায়।" (পৃঃ ১২, দ্বিতীয় খণ্ড)

এই মনের পাতায় ছবিগুলিই তিনি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন আর্য্যদর্পণের পাতায়। ১৩৬৯ সালের বৈশাখ হইতে ১৩৭০ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় তাঁহার "অবিস্মরণীয়" প্রবন্ধ এবং ১৩৭০ সালের বৈশাখ হইতে ১৩৭৬ সালের শ্রাবণ পর্য্যন্ত "নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ"। ১৩৭০ সালে যে কয়মাস "অবিস্মরণীয়" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কয়মাস "নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ" বন্ধ ছিল। অর্থাৎ একসঙ্গে প্রবন্ধদুইটি আর্য্যদর্পণে প্রকাশিত হয় নাই। "নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ" প্রবন্ধকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া এবং "অবিস্মরণীয়" প্রবন্ধটিকে (ভূমিকাংশ বিয়োগ এবং তৎস্থলে "সৌভাগ্য-স্মৃতি" সংযোগান্তে) তাহার অঙ্গীভূত করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল। এই গ্রন্থ মুখ্যতঃ ১৩২৯ সাল হইতে ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের অন্তিম চতুর্দ্দশ বৎসরের জীবনালেখ্য। ১৩৩৬ হইতে ১৩৪২ পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের ইতিহাস লেখিকার স্বপ্রত্যক্ষ, আর ১৩২৯ হইতে ১৩৩৫ পর্য্যন্ত তাঁহার পালিকা-মাতা সুরবালা দেবী এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শী ও দর্শিনীর নিকট হইতে শ্রুত। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়া শুধু নিজের স্মৃতিতে আস্থা না রাখিয়া সে ক্ষেত্রেও তিনি অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের নিকট হইতে যথাসম্ভব সেইগুলি যাচাই করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থে নিবদ্ধ তথ্যরাজির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোনও অবকাশ নাই। ১৩২৯ হইতে ১৩৪২ সাল পর্য্যন্ত এই চৌদ্দ বৎসরের অধিকাংশ সময় ঠাকুর নীলাচলে অবস্থান করিয়াছেন এবং লেখিকা মুখ্যতঃ এই স্থানেরই আলেখ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন—এইজন্য এই গ্রন্থের নামকরণ করা হইয়াছে "নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ"। এই মহাজীবনের সঙ্গে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের কয়েকজনের কথাও ইহাতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সংযোগ করিয়াছেন লেখিকা।

পরিশেষে যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা, তাঁহার সম্বন্ধে দু'চার কথা না বলিলে ভূমিকাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় কিছু বলিতেছি। এই গ্রন্থের প্রাণপুরুষ **শ্রীশ্রীঠাকুর নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব**। তিনি শুধু তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ এবং প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া অর্ব্বাচীন যুগ পর্য্যন্ত যতকিছু সাধন-পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বা হইয়াছে, সব পথে তিনি বিচরণ করিয়া প্রতিটি সিদ্ধির সৌধে উপনীত হইয়াছেন। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"যুগ যুগ ধরি' এই ভারতের যত সাধনার ধারা।
নিগমানন্দ-আধারে আসিয়া হয়েছে আত্মহারা॥"

তাই তো তাঁহাকে বলিতে শুনি—"তোমরা মনে কর, পরাশর-বিশ্বামিত্রের চেয়ে বুঝি আর কেউ বড় হতে পারে না। কত ব্যাস বশিষ্ঠ পরাশর এই দেহে লীন হয়ে আছে, তাঁদের জীর্ণ ক'রে ফেলেছি, অর্থাৎ তাঁদের সমস্ত জ্ঞানরাশি তো আয়ত্ত করেছিই, তা' ছাড়াও আরও কিছু জানি।" (জীবনী ও বাণী, পৃঃ ৯১)

তিনি আত্মপরিচয়-প্রদানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"আমি সাধারণ মানুষ; পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি জীবন অতিক্রম ক'রে জন্মজন্মান্তরের সাধনার পর এই জন্মে ভগবান্‌কে জেনেছি, সত্যলাভ করেছি, ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হওয়ায় আমার ভিতর দিয়ে জগদ্‌গুরুর ইচ্ছাই লীলায়িত হয়ে উঠেছে। আমাকে তোমরা সদ্‌গুরু ব'লে জেনে রাখ। আমি সাধনা-দ্বারা নিজে মুক্ত হয়েছি—তোমাদেরও মুক্তির পথ দেখিয়ে দেব এই আমার কাজ। আমার উপরে যারা নির্ভর করেছে—তাদের আমি হাতে ধ'রে মুক্তিধামে নিয়ে যাব।" (জীবনী ও বাণী, পৃঃ ২৩৯)

তিনি আরও বলিয়াছেন—"আমি একসঙ্গে ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেছি, আমি যুগপৎ তিনটাতেই প্রতিষ্ঠিত আছি। আমাকে ধরলে তোমাদের ভিতর ব্রহ্ম আত্মা ভগবানের জ্ঞান আপনা-আপনি ফুটে উঠবে।" (জীবনী ও বাণী, পৃঃ ২১১)

জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ে তাঁহার জীবন ছিল পূর্ণ। একদিকে তিনি যেমন নিজেকে "আত্মযাজী" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, অন্য দিকে দিয়াছেন তেমনি "ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু" বলিয়া। একদিকে যেমন তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন জগজ্জননীর "আদুরে ছেলে"রূপে, অপর দিকে তেমনি আত্মনিবেদন করিয়াছেন তাঁহার "প্রেমভিখারী"-স্বরূপে। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন জ্ঞানের উত্তুঙ্গ হিমাচল, অন্য দিকে ছিলেন তেমনি প্রেমে বিগলিত জাহ্নবীর করুণাধারা। একদিকে যেমন তিনি ছিলেন বজ্রাদপি কঠোর, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন কুসুম হইতেও কোমল। একসঙ্গে তাঁহার মধ্যে আমরা দেখিয়াছি পুরুষ-প্রকৃতির যুগ্ম বিহার। কখনও পিতার বিকাশ, কখনও মাতার প্রকাশ। তাই তো তিনি ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"জগজ্জননীকে বুকে করিয়া তোদের হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছি।" একদা নীলাচল কুটীরেই অন্নপূর্ণাপূজার দিন বগুড়ার হরপ্রসাদদা ঠাকুরকে দেখিয়াছিলেন অন্নপূর্ণামূর্তিতে—প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহার ঘটস্তন হইতে ক্ষীরধারা প্রসৃত হইতে। তাঁহাকে একাধারে আমরা বলিতে পারি অর্ধনারীশ্বরমূর্তি, ধর্মমূর্তি, কর্মমূর্তি, জ্ঞানমূর্তি, যোগমূর্তি, প্রেমমূর্তি, শাস্ত্রমূর্তি, শান্তামূর্তি, অভয়মূর্তি, হরিহরমূর্তি তাঁহার মধ্যে লৌকিক সর্ববিধ বিদ্যা এবং অলৌকিক সর্ববিধ শক্তির সমাবেশ দেখিয়া আমরা বিস্মিত, পুলকিত, স্তম্ভিত এবং মোহিত। হরপ্রসাদদ প্রায়ই বলিতেন "আমাদের ঠাকুর what not !"

ঠাকুর ছিলেন সনাতন ধর্মের প্রচারক, তাই তিনি সনাতন ধর্মের মুখপত্ররূপে আর্য্যদর্পণ মাসিক পত্রিকার প্রবর্তন এবং যোগীগুরু প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন ; তিনি ছিলেন ঋষিযুগভাবধারার বাহক এবং সংশিক্ষার বিস্তারক, তাই তিনি মঠাশ্রমে "ঋষিবিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ; তিনি ছিলেন সঙ্ঘশক্তির সংগঠক, তাই গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ; তিনি ছিলেন ভাববিনিময়ের মাধ্যমে ভক্তিভাবের উদ্বোধক, তাই ভক্তসম্মিলনীর প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন ; তিনি ছিলেন জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়-সাধক, তাই জগৎসমক্ষে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন "শঙ্করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ"।

তিনি চাহিয়াছিলেন ধর্মের মধ্য দিয়া এই অধঃপতিত জাতিকে উঠাইয়া তুলিতে, ইহাদের মধ্যে সেই ঋষিযুগের মহান্ আদর্শগুলিকে ফুটাইয়া তুলিতে, সে-যুগের ঋষিদের মত মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ দান আত্মার স্বরূপজ্ঞান দান করিতে।

তিনি বলিয়া গিয়াছেন—"ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। তোমরা ধর্মে উন্নত হও, জগতে তোমরা গুরুর স্থান অধিকার কর। পাশ্চাত্যদেশ ঐহিক উন্নতি করছে, তোমরা তাদের সঙ্গে নিজ নিজ সম্পদ আদান-প্রদান কর।"

ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন—"তোমরা আপন ভুলিয়া প্রেম-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ কর, গুরুর উপদেশমত চরিত্র গঠন কর, সংযত হও, পৃথিবীর নরনারীকে ভাইভগ্নীজ্ঞানে জড়াইয়া ধর, রোগীর শুশ্রূষা কর, শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা প্রদান কর, দুঃখীর অশ্রু মুছাইয়া দাও, তাপিতকে বুকে ধর, পাপীকে ঘৃণা না করিয়া তোমাদের প্রেমজলে তাহাদের পাপময়লা ধুইয়া দাও, স্বার্থপর শয়তানকে হৃদয় হইতে তাড়াইয়া প্রেমময় ভগবানকে আসন দাও—**ইহাই ধর্ম।**"

তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন—"তোমরা আগে নিজ নিজ পরিবারে আমার আদর্শকে রূপ দাও, পরিবারের আদর্শ তখন গ্রামে, গ্রামের আদর্শ দেশে, দেশের আদর্শ মহাদেশে—শেষে সমগ্র জগতে তা ছড়িয়ে পড়বে। আমার আদর্শকে রূপ দেওয়াই তোমাদের সাধনা—মুক্তি-মোক্ষের জন্য তোমাদের চিন্তা নাই। তোমরা আমার কাজ করে যাও—অন্তিমে আমি তোমাদের সকল ভার সকল বোঝা বহন করব।"

আজীবন শিষ্য-ভক্তদের কল্যাণচিন্তা করিয়া, তাহাদিগকে ভালবাসিয়া, স্নেহের শাসনে উদ্বুদ্ধ করিয়া কর্মক্লান্ত স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন কোন্ আনন্দলোকে। তিনি আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন শিষ্য ভক্তদিগকে—"তোমাদেরও একে একে আকর্ষণ করিয়া সেই আনন্দধামে লইয়া যাইব, আবার একদিন সকলের সঙ্গে সে মহামিলন হইবে।"

সেই মহামিলনের প্রতীক্ষায়—তাঁহার আহ্বানের অপেক্ষায় এখন বসিয়া আছি—তাঁহার মোহন রূপ অমিয় বাণী স্মরণ করিয়া দিনযাপন করিতেছি। এমন রূপ জীবনে দেখি নাই, এমন মধুর বাণী কোথাও শুনি নাই, এমন ভালবাসা কোথাও পাই নাই। ১৩২৭ সালে কোকিলামুখ মঠে তাঁহার প্রথম শ্রীচরণ দর্শন করি—১৫ বৎসর তাঁহার সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাই, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাঁহার নব নব ভাবের উদ্দীপন দেখিয়া মুগ্ধ হই। এক-একদিন মনে হইত ঠাকুরের দেহ রক্ত-মাংসের নয়—যেন রক্ত-মাংসশূন্য শুধু প্রেমে গড়া মূর্তি!- তাহা হইতে যেন অজস্র ধারে প্রেম বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। আমি ঠাকুরের প্রেমময় মূর্তিই দেখিয়াছি, দেখিয়াছি তাঁহাকে স্নেহময় করুণাময়রূপে। তাঁহার নিকট হইতে শুধু স্নেহ প্রীতি ভালবাসাই পাইয়াছি, তাঁহার শাসকমূর্তি রুদ্রমূর্তি আমার নয়নগোচর হয় নাই—তাঁহার নিকট হইতে একদিনও একটা

কঠোর কথা শুনি নাই, ঠাকুর আমার নিকট অন্তরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই, করিয়াছেন শুধু কৃপাপারাবার দক্ষিণামূর্তিরূপে।

লীলার সৌভাগ্য সে সব দিক্ দিয়া ঠাকুরকে দেখিয়াছে, আস্বাদন করিয়াছে এবং জগদ্‌বাসীকে আস্বাদন করাইতেছে। তাহার লেখনীমুখে আমরা ঠাকুরের অমিয়-মধুর কথা আরও শুনিতে চাই, শুনিয়া তৃপ্ত এবং ধন্য হইতে চাই। শ্রীশ্রীঠাকুরচরণে তাহার ব্যাধিমুক্ত দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তাহার দেহযন্ত্র-অবলম্বনে শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্যভাবরাশি নব নব ভাবে প্রকাশিত হউক, ঝঙ্কৃত হউক তাহার মনোবীণায় তাঁহার নিত্যনূতন স্বরলহরী!

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত

সিদ্ধানন্দ

আত্মনিবেদন

"নমঃ পরমহংসায় নিগমানন্দরূপিণে"

১৩৬৯ সালে 'অবিস্মরণীয়' নিবন্ধে এ-বইয়ের প্রথম সূচনা। ইতোমধ্যে ১৩৭৪ সালে 'বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়ে গেল। কালবিচারে অগ্রণী হলেও আত্মপ্রকাশে এ বইয়ের এত বিলম্ব কেন, তার হেতু আছে।

'যুক্তিনিষ্ঠ বিদগ্ধ সমাজ'কে তৃপ্ত করার মত 'তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে' শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী অবিলম্বে প্রয়োজন—এই প্রেরণা* হতে 'বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ' গ্রন্থের উদ্ভব। সুতরাং সেক্ষেত্রে প্রথিতযশা মনীষী শ্রীমৎ নির্বাণানন্দ সরস্বতীর (শ্রীঅনির্বাণ) অভিজাত রুচি এবং মেধাশাণিত পর্যবেক্ষণ ও তাঁর প্রিয় ছাত্র বেদান্তাচার্য শ্রীমৎ সত্যানন্দ সরস্বতীর বুদ্ধিনির্ভর মননশীলতার প্রতি বিশেষ পক্ষপাত, প্রতি পদে আমার দিঙ্‌নির্ণয় করেছে।

কিন্তু এ-বইটি নিতান্তই একটি মেয়ের প্রাণের তাপে উদ্‌ভিন্ন এবং তার সীমিত বুদ্ধির আলোয় ফলানো ফসল। তাই প্রথমাবধি এ-লেখা নিয়ে আমার কুণ্ঠা-সঙ্কোচের শেষ নাই। মনে পড়ছে স্বর্গত বনমালীদাকে। আর্যদর্পণের দুই সংখ্যায় ('৬৯, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) 'অবিস্মরণীয়' লিখে ইতি করেছি। তিনি পড়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমায় লিখলেন, 'লীলা, তুমি আক্ষেপ করেছ চিত্রকর হলে না কেন, তাহলে তুলি ধরে ছবি এঁকে দেখাতে ঠাকুরের কি চিত্র তোমার মনে ধরা আছে! কিন্তু কালি-কলম দিয়ে এ-ও তো ছবিই এঁকেছ। শেষ করে দিলে কেন? আরও লেখ!'

* দ্র পরিচিতি—'বাংলার সাধনায় নিগমানন্দ'।

তিনি নিজে সুপণ্ডিত এবং সুলেখক। তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে আবারও লিখলাম। আবার ছেদ। এমনি করে বার বৎসর কেটে গেল। আমার দ্বিধা-সংশয় আজও কাটেনি। যা বলতে চাই তা বলতে পেরেছি কি? শিব গড়তে পুতুল গড়ে বসিনি তো? কালক্ষেপের হেতুটা এইখানে।

স্মৃতি এবং বোধের কোনও বয়স নাই আধুনিক বিজ্ঞানও তা স্বীকার করে। বুদ্ধির ক্রিয়া যখন স্তম্ভিত, মন অপরিণত—তখনও এ-দুটির অস্তিত্ব থাকতে পারে। সুতরাং নিতান্ত বাল্যকালে দেখলেও ঠাকুরসম্পর্কে কতগুলি অত্যুজ্জ্বল স্মৃতি এবং আশ্চর্য একটি মহিমবোধ আমার নিজস্ব পুঁজি। পরিণত বয়সের মন-বুদ্ধি দিয়ে তার দাম কষে ভাষায় প্রকাশ করলে যা হয় তাই-ই এ-বইয়ের মূল ভিত্তি। সত্যদা, শক্তিদা ও দুর্গাচরণদা—সারস্বত সঙ্ঘের এই তিন সুসাহিত্যিক ক্রমান্বয়ে বারবার আমায় আশ্বস্ত না করলে, ওই সামান্য সম্বল নিয়ে দশের সামনে সদ্‌গুরু শ্রীনিগমানন্দের কথা বলবার মত দুঃসাহস আমার কখনই হত না।

পিছনে ফিরে চাই।

শ্রীক্ষেত্রের সিন্ধুসৈকতে পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সূর্যোদয় দেখব।

রাতের আঁধার তখনও ভাল করে সরেনি। দূরে ঝাউবন আবছা ঠেকছে। জোয়ারে ধুয়েযাওয়া মসৃণ ভিজা বালির অক্ষত চিকণ আস্তরণের উপর রঙ-বেরঙের কত ঝিনুক! কুড়িয়ে নেওয়ার লোক এখনও আসেনি।

পুবের আকাশ ফরসা হয়ে এসেছে। কীর্ণরশ্মি সবিতার অদৃশ্য ছটামণ্ডল হতে এক প্রভাতরল জ্যোতি 'উদেতি বসুধাতলাৎ'। সমুদ্র

আর আকাশে যেখানে মেশামেশি সেই দিগন্তে মুক্তাস্বচ্ছ আভা ফুটছে একটি। সাগরের বুকে পাতলা কুহেলীর অনচ্ছ আবরণ। শান্ততরঙ্গ সমুদ্র যেন তন্দ্রালস। ঢেউ ভাঙছে ছোট-ছোট। গর্জন নাই তার, শুধু মৃদু মর্মর।

ওদিকে পূর্বাচলে কার রঙের তুলি ফিরছে অবিরাম। মুক্তার লাবণ্য আলোহিতচ্ছটায় উপরঞ্জিত হয়ে গেল। মুহূর্তে-মুহূর্তে রঙ বদলে যাচ্ছে। এই ছিল গোলাপী, এই যেন হল ডালিমফুলী! আবার যেন দেখি সিঁদুরে আভা। না-কি, আগুনে রঙ? দিগন্তে মেঘ না থাকলে সোনালী ছটাই ফোটে বেশী। তারপর দেখতে-না-দেখতে সমুদ্রের সীমান্তলগ্ন উদয়াচলে জ্বলে উঠল সুবর্ণাবদাত একটি রেখা! আর, আলোর ঝিলিকে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে নিমেষে সে-রেখাটি একফালি বহ্নি-কলা হয়ে গেল। ভাস্বর জবারাগে আকাশ-সমুদ্র উদ্ভাসিত করে চক্ষের পলকে পূর্বাকাশে ভেসে উঠল সূর্যবিম্বের সিকি ভাগ। যেন উপুড় করা একটি সোনার হাঁড়ির তলাটুকু!

আলোয় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। মাথার উপরে প্রভাতের প্রসন্ন আকাশ, নীচে সমুদ্রের বুকে তারই প্রতিফলন—'নীলিমায় নীল'। কেবল উপরে যা প্রশান্ত অক্ষুব্ধ, নীচে তা ঊর্মিমুখর। তার সকালবেলার হালকা ঢেউয়ে বালসূর্যের অরুণাভার ঝিকিমিকি। দূরে যেখানে অন্যোন্যসম্পৃক্ত সেই সন্ধিভূমিতে জ্বলছেন দুর্নিরীক্ষ্য মহাদ্যুতি।

ভাগবতপ্রবক্তা নিশ্চয় এ-ছবি দেখেছিলেন। তাই লিখলেন, কল্প-প্রভাতে সহসা একটি পদ্মকোষ উত্থিত হল একার্ণব হতে। কি রকম জান?

স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্ অর্ক ইব।

—ভাঃ ৩।৮।১৪

'জ্যোতির কনকপদ্মখানি' ঠিক এমনি করেই নিত্যকাল শ্রীক্ষেত্রের বিশাল সিন্ধুবক্ষ আলো করে সহসা আবির্ভূত হয়।

আকাশ এবং সমুদ্র; ঋষির কাছে এ দুটিই বিরাটের রহস্য-গভীর প্রতিরূপ। আকাশ তাঁর ব্রাহ্মীতনু, সমুদ্র মহাপ্রাণের দ্যোতক—নির্গুণ ও সগুণ, শিব-শক্তি।

নীল সমুদ্রের ফণা-তোলা লক্ষ ঢেউ—নীলাঞ্জনসমপ্রভ বিষ্ণুর অনন্তশয্যা! সৃষ্টির আদিতে ওই সাগরের বুক হতেই 'প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্যঃ।' দেবকাব্যের এই একটি ছত্র প্রতি প্রভাতে নীলাচলের পুব আকাশে লেখা হয়ে চলেছে।

ছোটবেলায় কবে প্রথম সাগরে সূর্যোদয় হতে দেখেছিলাম বলতে পারি না। কিন্তু প্রথম দর্শনের সে-বিস্ময় কোনওদিন ফুরায়নি। যতবার দেখেছি ততবারই একটি মহিমবোধ (sense of sublime) অজানিতে কার পায়ে যেন মাথাটা নুইয়ে দিয়েছে।

ওই তো সাক্ষাৎ 'চারুব্রহ্ম'!

আবার এদিকে উত্তরাকাশে মাথা তুলেছে 'নীলচক্র'। ওখানে আছেন 'দারুব্রহ্ম'—

'মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে'

—এ কার কথা বলছেন 'গৌড়িয়ার মহাপ্রভু'? সমুদ্রতীরে, সোনার আভা ছড়ানো নীল আকাশে দেখা দিয়েছেন যে 'বৃহজ্জ্যোতি', শ্রীচৈতন্য কি তাঁকেই সম্বোধন করে বলছেন

'জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'?

পুরুষোত্তমধামের আকাশে-বাতাসে মহাপ্রভুর এই জলদমন্দ্র আহ্বান! সাগরের গর্জমান তরঙ্গে বুঝি তারই প্রতিধ্বনি, অহোরাত্র একতালে উচ্চারিত অনিঃশেষ সামগান,

"ভেদিয়া ধরার রণহুঙ্কার
ভেদি' বণিকের ধনঝঙ্কার
মহাকাশতলে ওঠে ওঙ্কার
কোন বাধা নাহি মানি ॥"

প্রাচীনরা তাই হয় তো বলতেন, এটি শঙ্খক্ষেত্র !

মন্দিরের মণিকোঠায় জমাটবাঁধা অন্ধকার। তার মধ্যে ছোট্ট একখানি প্রদীপ তুলে ধরে দেবতার আরতি হচ্ছে। সেই আলোটুকুতে জগবন্ধুকে কেমন দেখলাম ? চারপাশের ঘুটঘুটে আঁধারের সঙ্গে মিশে গেছে মুখের ঘোর কালো রঙ, কেবল জ্বল্‌জ্বল্ করছে প্রকাণ্ড দুটি চোখ ! কালোর উপর সাদা রঙের মস্ত দুটি চক্কর দিয়ে দেবশিল্পী যেন বলতে চেয়েছেন, মুখের মধ্যে ওই চোখদুটিই তাঁর মুখ্য,

"দিবীব চক্ষুর্ আততম্।"

আকাশে জ্বলছে তাঁর 'শশিসূর্যনেত্র'। অন্ধকার গর্ভগৃহে সেই চোখই অনিমেষে চেয়ে আছে তোমার-আমার দিকে। বিরাট পুরুষের হৃদয়ই যে সমুদ্র, বেদে সে-উপমা আছে (ঋ. ৪।৫৮।৫,১১)। তা হতে 'প্রজ্ঞান ব্রহ্ম'র* উদয়ন সমুদ্রতটে নিত্যপ্রত্যক্ষ। সেই হৃদয় আবার ছোট্ট একটি 'পুণ্ডরীকবেশ্ম' (হৃদয়-পদ্ম) হয়ে গুটিয়ে এসেছে জীবদেহের বক্ষাভ্যন্তরে। আর ওই সূর্য সেখানে

"জ্যোতির্ ইব অধূমকো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি"।

দেহরথে তিনি বামন-মূর্তি। কিন্তু তবু তিনি 'ঈশানো ভূতভব্যস্য'।

* পুরীধামস্থ গোবর্ধন মঠের মহাবাক্য।

শ্রীক্ষেত্রের মহানিমকাঠে ইনিই 'দারুব্রহ্ম'—জড়ে নিগূঢ় চিৎ-সূর্যের অগ্নি-কণা। তিনি তাই আচণ্ডাল-ব্রাহ্মণের 'মহাপ্রভু'।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যেরও অভিধা। তিনি বললেন, জগন্নাথ আমার গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বপ্রকৃতিরূপা রাধার হৃদয়বল্লভ। পুরীধাম সেই হৃদয়-ব্রহ্মের* পুরী। এখানে আনন্দবাজারে সনাতনধর্মী হিন্দু বেদ-বিধি ভুলে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। কেননা তাঁর প্রসাদ যে অনুচ্ছিষ্ট! তাঁর প্রসাদে তাঁতে মতি-রতি হয়—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"

"ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"

সব সাধনার শেষ কথা হৃদয়ের আগল খোলা, বিশ্বজগৎকে বিশ্বেশ্বরের প্রকট বিগ্রহ জেনে বুকে জড়িয়ে ধরা! আপন-পরে ভেদজ্ঞান করায় যে অবিদ্যা, তা-ই হৃদয়-গ্রন্থি। ও যার গেছে তারই পরাবর ব্রহ্ম দর্শন হয়েছে জানতে হবে। তাঁর কৃপা না হলে কি এ হয়?

পুরুষোত্তমধামের এসব অনন্য বৈশিষ্ট্য কত ছোট হতে চিত্তপটে মুদ্রিত হয়েছে। বড় হয়ে বুঝেছি 'উদার বিশ্বব্যাপক সার্বভৌম হিন্দুধর্মের' বিচিত্র চরিত্রকেই জগন্নাথক্ষেত্র নানা দিক হতে প্রকট করেছে। তাই শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমধাম ও ঠাকুর নিগমানন্দ আজ আমার স্মৃতিতে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছেন।

সদ্‌গুরু নিগমানন্দ তাঁর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সেবকদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

* 'হৃদয়ং বৈ পরমং ব্রহ্ম'— বৃহ. উপনিষদ ৪।১।৭

"শাস্ত্রাদি পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে পার, কিন্তু হৃদয় জিনিসটি শাস্ত্রের মধ্যে নাই। আর জ্ঞানের সঙ্গে যদি হৃদয় জিনিসটির সংযোগ না হয় তাহলে সেই জ্ঞানে অপরের যথার্থ হিত হয় না।" —শ্রী নিঃ উপঃ, পৃঃ ৫০

"জ্ঞান চাই—কিন্তু সেই জ্ঞানকেও প্রেমে পরিণত করতে হবে। নিছক শুষ্ক জ্ঞানে কিছু হয় না। * * তোমরা জ্ঞানলাভ করেছ বুঝব তখনই, যখন তোমরা অপরের দুঃখদৈন্যে বিচলিত না হয়ে থাকতে পারবে না। * * * "**শঙ্করের মত জ্ঞানী** এবং **গৌরাঙ্গের মত হৃদয়বান** হও তোমরা—এই আমার আশীর্বাদ।" —ঐ পৃঃ ৮১

সুতরাং 'হৃদয়ই পরম ব্রহ্ম'—সোজা কথায়, সর্বজীবকে নারায়ণজ্ঞানে ভালবেসে সেবা করাই যে পারমহংস্য সংহিতা ভাগবতের চরম কথা—ঠাকুর এই সত্যটি সমাজকে নতুন করে শোনাতে এসেছিলেন। তিনি কোনও দিন বিরক্ত উদাসীন সন্ন্যাসী নন। বাল্যবন্ধুকে একদা নিজেই লিখেছিলেন "ভাই আমিও যে গৃহী। তুমি ক'জনের চিন্তা কর, কয় জনের অন্ন জুটাও, কতক্ষণ কাজ কর? আমার কাজের যে সীমা সংখ্যা নাই। আমার মনে হয়, এক আমি দশটা হইতাম, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া দশজনের সেবা করিতে পারিতাম।" —চিঠি ১।৫১

মায়ারাজ্যে ত্রিশবৎসর তিনি তাঁর অগণিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে বিরাট গৃহস্থালী ফেঁদে শিবের সংসার করে গেছেন। তাঁদের নিয়েই তাঁর হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সকলকে চেনা দূরে থাক, তাঁর সন্তানদের বহুজনের নামও অদ্যাবধি জানি না। যাঁদের চিনি-জানি, ঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতই তাঁদের কয়েকজনের কথাও বলেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন—

এক বাপের পাঁচ ছেলে। তাদের মধ্যে কেউ-বা পণ্ডিত কেউ-বা মূর্খ কেউ-বা কর্মী কেউ-বা অলস এরূপ আছে। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারার বেলা সকলের কড়ায়-গণ্ডায় সমান অধিকার!”

—জীবনী ও বাণী, পৃঃ ১৫১

আমিও তাই তাঁদের কথা বলতে গিয়ে—এঁরা প্রত্যেকে ঠাকুরের সন্তান অতএব আমার শ্রদ্ধাভাজন—এই বুদ্ধিতে অপক্ষপাতে যাঁর কথা যেটুকু জানি বলে গেছি।

প্রায় বার হাজার শিষ্য-ভক্ত*-সমন্বিত সারস্বত সঙ্ঘ ও সাতটি মঠাশ্রমের ভাগ্যনিয়ন্তা, তদুপরি নীলাচল কুটিরের গৃহস্বামী, সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবৃত সদ্‌গুরু শ্রীনিগমানন্দদেবকে ভাবতে গেলেই আচার্য শঙ্করের দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রের অষ্টম শ্লোকটি মনে পড়ে!

‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ এবং ‘পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্’ বেদান্তমতে এই হল ব্রহ্মোপলব্ধির পরম কোটি। অদ্বৈত ভাবনার এ কৈলাসশিখরে পরমহংস নিগমানন্দ আরূঢ় ছিলেন কি-না, ভাবী কাল তাঁর চারখানি বই ও সাড়ে তিনশ চিঠি হতে তার প্রমাণ সংগ্রহ করবে। আমি তার সম্যক্ মর্মানুধাবনে সমর্থ নই। কিন্তু গুরুভাব বা ব্রহ্মকর্মে নিষ্ণাত তাঁর মহাজীবনের শেষ অধ্যায়টি আমার চোখে দেখা।

মঠাম্নায়ে শঙ্করাচার্য বলেছেন গোবর্ধন মঠ হতেই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ উৎকল বর্বর গৌড় সুহ্ম পৌণ্ড্র ও লৌহিত্যাদি পূর্বদেশ বেদানুশাসনে শাসিত হবে। আধুনিক পরিভাষায় ওই দেশগুলি হল বিহার ওড়িশা বাংলা ও আসাম। আশ্চর্যের কথা, এই চারটি প্রদেশই ঠাকুর নিগমানন্দের কর্মক্ষেত্র বা ভাবধারণোপযোগী ভূমি। অন্ত্যপর্বে গোবর্ধন মঠেরই এক

* আর্যদর্পণ ১৩৬৩ আষাঢ় সংখ্যা—‘ঠাকুরের অন্তর্যামিত্ব’ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পথের উপর নীলাচল কুটিরে থেকে পুরুষোত্তমধামকে কেন্দ্র করে তিনি প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে তাঁর জ্ঞানশক্তি বিকীর্ণ করে গেছেন। আজ তাঁর দিনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি অনুস্মরণ করে বুঝি, সমাজে সংসারে সকল ভাবের ভাবুক সকল রসের রসিক হয়েও তিনি নিয়ত আত্মস্থ এবং স্ব-ভাবে স্বরূপে রমমাণ থাকতেন। দক্ষিণামূর্তি গুরুকে আচার্য শঙ্কর কিন্তু ঠিক এমনি লক্ষণাক্রান্ত একটি পুরুষরূপেই এঁকেছেন !

এখন, 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান' !!

এ বইয়ের বস্তারের ফটোখানি নরেশদার কাছে পেয়েছি। অন্যগুলি জিতেনদার ভাণ্ডার হতে যোগাড় করেছিলাম। আর সংগৃহীত তথ্য সম্বন্ধে এই মাত্র বলতে পারি যে যথাসাধ্য নির্ভুল করেই প্রতিটি তথ্য পরিবেশন করতে চেষ্টা পেয়েছি। তবু ভুল-ত্রুটি থাকা আশ্চর্য নয়, তা আগে থাকতে মেনে নেওয়াই ভাল।

শ্রীমৎ সিদ্ধানন্দ সরস্বতী মহারাজের (শক্তিদা) প্রস্তাবানুসারে শেষ পর্যন্ত সারস্বত মঠের প্রচার বিভাগ যে এই বইখানাকে সারস্বত গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করলেন, কলমপেষার এত বড় পুরস্কার আমার জীবনে আমি আর পাইনি।

শক্তিদার কাছে আমি কত ঋণী সে-হিসাব দিতে গেলে আরও খান-দুই পাতা লাগবে। কাজেই সে-চেষ্টা করব না। আমি জানি তথ্য সরবরাহ এবং তার সত্যাসত্যতা নির্ণয় হতে শুরু করে, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও এ-বইয়ের পিছনে তাঁর যত পরিশ্রম সে সবই তিনি করেছেন তাঁর 'প্রাণের ঠাকুরে'র প্রীত্যর্থে। তিনি যে ঠাকুরেরই 'শক্তি' ! তাই আমাদের ঠাকুরকেই আবার প্রণাম জানাই—

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

—ভাঃ ১১।৫।৩৩

প্রণতা

লীলা

প্রকাশকের নিবেদন

"নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ" গ্রন্থটি সামগ্রিকভাবে এক খণ্ডেই প্রকাশিত হয় ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ধারণা ছিল, উহা ২৫ ফর্মার মধ্যেই শেষ হইয়া যাইবে এবং তাহা ভক্তসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল আমাদের ধারণাকে নস্যাৎ করিয়া দিয়া তাহা ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ২০ ফর্মা ছাপা হইয়া যাইবার পর লক্ষ্যে পড়িল আরও অন্ততঃ ১৫।১৬ ফর্মা ছাপাইলে তবে বইটি শেষ হইতে পারে। এমতাবস্থায় বর্তমান কাগজমূল্য ও মুদ্রণ-ব্যয়ের ধারণাতিরিক্ত বৃদ্ধিহেতু বই-এর দাম অত্যধিক বাড়াইয়া দিতে হইবে এবং তাহা ভক্তসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় তাহার প্রতিরোধহেতু ২১ ফর্মাতেই ইহার মুদ্রণ শেষ করিয়া প্রথম খণ্ডরূপে ইহা প্রকাশ করিলাম, মূল্য নির্দ্ধারণ করিলাম ১৫.০০ টাকা। বর্তমান বাজার দর হিসাবে এবং অত্যুৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণপারিপাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই মূল্যকে কিছুতেই বেশী বলা চলে না। তদুপরি ইহার মধ্যে রহিয়াছে উৎকৃষ্ট আর্টপেপার মুদ্রিত ৭টি আলোকচিত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকিবে ৬টি আলোকচিত্র, সর্বজনপ্রশংসিত 'সৌভাগ্যস্মৃতি' ও 'অবিস্মরণীয়' প্রবন্ধের সমাবেশ এবং ১৩৪১ ও ১৩৪২ সালের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

ভক্তগণ এই গ্রন্থকে সাদরে গ্রহণ ও বরণ করিয়া লইবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ভক্ত ও ভগবানের জয় হউক। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীগুরুচরণাশ্রিত
স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী
প্রকাশক

চিত্র-সূচী

১।	শ্রীশ্রীঠাকুর	গ্রন্থমুখ
২।	ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর (ভাওয়াল ভক্ত-সম্মিলনী—১৩২৯)	৩০—৩১
৩।	নীলাচল কুটির (দোতলা ও সম্মুখের কিছু অংশ)	৪২—৪৩
৪।	নীলাচল কুটিরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ (জীর্ণসংস্কারের পর)	৪৬—৪৭
৫।	বস্তারে শ্রীশ্রীঠাকুর (রাজা-রাণীসহ)	৮৪—৮৫
৬।	সুরেশদা, সত্যদা, অন্নদাভাই, চিদানন্দজী, শরৎদা, আত্মানন্দজী, শক্তিদা, অনন্তদা।	২৫২—২৫৩
৭।	বেলঘরিয়ায় ঠাকুর (১৩৪০)	৩১৬—৩১৭



শ্রীশ্রীঠাকুর

নীলাচলে ঠাকুর নিগমানন্দ

কথামুখ—

ঠাকুরের কথা লিখতে আমার ভয় হয়। আমি তাঁকে কিছুই বুঝিনি কথা বলতে লজ্জা তো করে-ই না বরং মনে হয় এর উল্টোটা বলাই হবে থ্যাভাষণ। তাঁকে বুঝব কেমন করে? কোথায় তিনি আর কোথায় ামি?

"ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ"—রঘুকুলতিলকদের কথা খতে গিয়ে বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় নবরত্নের অন্যতম যিনি, সেই াকবি কালিদাস সসম্ভ্রমে বলছেন "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি গরম্"। 'কোথায় জগদুদ্ভাসক আদিত্যের তেজসম্ভূত মহামতি সূর্যবংশীয় জন্যকুল আর কোথায় অল্পবুদ্ধি সাধারণ জীব আমি; আমার এ চেষ্টা ন ভেলায় দুস্তর সাগর-তরণের অপপ্রয়াস।' সরস্বতীর বরপুত্র লিদাস। তবু তাঁর এ-কুণ্ঠা এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। স্তবিক পূর্ণব্রহ্ম সনাতন রামচন্দ্র যে-বংশের কুলপ্রদীপ, স্বয়ং আদিকবি ত্যাদিষ্ট হয়ে যে-বংশের মহিমা কীর্তন করে গেছেন, যত বড় মনস্বী ও বিই হন না কেন তবু রঘুবংশের কথা বলতে গিয়ে তাঁর দৈন্য ও দ্বিধা-ঙ্কোচ অবধারিত।

আবার পুরাণেতিহাসের প্রবর্ত্তক গুরু বেদব্যাসকে দেখি সবিনয়ে ত্র
স্বীকার করে বলছেন—

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্‌॥

তুমি অরূপ, আমি যে ধ্যানে রূপাতীত তোমার রূপকল্পনা করেছি
অনির্বচনীয় তুমি, স্তবস্তুতিতে আমি যে তোমার সেই অনির্বাচ্য স্বর
নির্বাচিত করেছি এবং সর্বব্যাপী তোমাকে তীর্থাদিতে বিরাজিত ব
তোমার ব্যাপকতা যে আমি সীমিত করেছি প্রভু, আমার এ তিন অপর
তুমি ক্ষমা কর।

নিতান্ত আধুনিক কালের কথাই ধরা যাক। স্বামিজীকে যখন কে
অনুযোগ দিত যে আপনি সভাসমিতিতে এত বক্তৃতা দেন, কিন্তু ঠাকুে
কথা তো তেমন বলেন না, তিনি নম্রস্বরে বলতেন "দেখ, আমি তাঁ
অল্পই বুঝেছি। তাঁর কথা বলতে আমার ভয় করে। পাছে নিজে
মনের মত করে আঁকতে গিয়ে তাঁকে ছোট করে ফেলি কেবলই এ
শংকা হয়।"

কালিদাস না হয় শুধুই একজন বাণী-উপাসক কিন্তু গুরু বেদব্যাস
আচার্য বিবেকানন্দ? আধিকারিক পুরুষ যাঁরা, তাঁদেরও এতখানি দৈ
বিনয়? দেখে-শুনে মন আরও পিছিয়ে যায়। আমার ঠাকুর—তিনি
যে পরতত্ত্বস্বরূপ। তাঁর কথা আমি কি বলব? মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ কে
এই গুরুবুদ্ধিতেই নয়; এমন কিছু দেখেছি এবং শুনেছি যাতে আম
মনে হয়েছে তাঁকে যারা আশ্রয় করেছে তাদের 'গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃ সা
নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' এক তিনিই। মহাজনেরাই যদি এই মহেশ্বরতে

ধা বলতে গিয়ে বারবার থমকে যান তাহলে অভাজনের সেখানে করণীয় ? "তাবচ্চ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে", এই নীতিবাক্য নে তার নীরব থাকাই শোভন।

তাই-ই ছিলাম। ১৩৫৬ সালে প্রথম একদিন আর্যদর্পণের বেদীমূলে সে প্রণাম জানিয়েছিলাম। সেদিনও ঠাকুরের বন্দনাই গেয়েছিলাম ট তবে সে নিতান্তই ছন্দোবদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস খানিকটা। তারপর আর তটুকু লিখেছি তাঁর কথা ? না লেখাই সমীচীন ভেবেছি। আমি কে তাঁর কথা বলব ?

("হায় ! গগন নহিলে তোমায় ধরিবে কেবা।
ওগো তপন ! তোমার স্বপন দেখি যে
করিতে পারিনে সেবা॥")

* * *

আজও যে এ-ভাব বদলেছে তা নয়। নিশ্চয় জানি তাঁকে আমি ছুই ধরতে পারিনি। কিন্তু কিছুদিন তাঁর সঙ্গ করেছিলাম, ভক্তসঙ্গে কে দেখেছি এই চোখে, আর শুনেছিও অনেক কিছু। সেই দেখা আর না কথাগুলোর ধারাবাহিক একটা বিবৃতি রেখে যাওয়া বোধহয় চত। কেন, তা বলি।

প্রাচীনেরা অনেকেই গতাসু। ঠাকুরকে সাক্ষাদ্দর্শন করেছেন যাঁরা দূর অনুমান আর বিশবছরের মধ্যেই তাঁরা বিদায় নেবেন ধরাপৃষ্ঠ ত। তারপর প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের আর উপায় থাকবে না। থাকবে অবাধ কল্পনার অবসর। তার আগে আমাদের একটা দায় আছে কি। জীবনী লেখা নয়, তথ্য পরিবেশনের দায়।

ঠাকুরের কথা জগতে প্রচার করার যদি অভিপ্রায় থাকে বিধাতার, ব কোন-না-কোনদিন তেমন চরিতকার আসবেন যিনি বৈয়াসকী

চেতনায় আবিষ্ট, যাঁর সম্বন্ধে অনায়াসে বলা যাবে 'সেই সত্য যা রচি
তুমি'। তথ্য আর ভাব মিলিয়ে সত্যের কল্পমূর্তি গড়ে তুলবেন তিনি-
পরমহংস নিগমানন্দের দিব্য আলেখ্য। কতদিন পরে তা হবে, আদৌ
কোনদিন হবে কি না তা-ও জানি না। 'কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণি
নাচদুয়ারে।' থলো থলো কৃষ্ণ ফলে আছে তাঁর কল্পবনে, 'নিগমার্থবিৎ
কত পরমহংসকে হয়তো গ্রাস করে বসে আছেন ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
সবই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা। কিন্তু যদি কখনও লেখা হয় আমাদের
ঠাকুরের জীবনী, সেদিনের কথা ভেবেই নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারি না
আমি বলে নয়, যাঁরা যতটুকু জেনেছিলেন তাঁকে তাঁদেরই দায় আছে
একটা—কালের দরবারে নিজের জানাটুকু জমা দিয়ে যাওয়া।

মুটে মজুরেরা বয়ে আনে বালি চুণ ইট শুরকি। মিশিয়ে মশলা তৈরি
করে মিস্ত্রীর দল আর সৌধরচনার দায়িত্ব নেন স্থপতি স্বয়ং। আমার
ভূমিকা ওই কুলি-মজুরের ভূমিকা। কিছু মালমশলা বয়ে এনে দিতে
পারি আমি, তার বেশি ক্ষমতা নাই আমার। তাঁকে কে বুঝবে? দ্বিতীয়
আর একটি নিগমানন্দ না হলে কে কবে ধারণা করতে পারবে কী বিরাট
ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি এসেছিলেন!

শুনেছি কখনও-কখনও তিনি আপন মনে গুন্ গুন্ করে গাইতেন-

"যেমন বনেরই ফুল বনেই ফোটে
দুদিন বনে সৌরভ ছোটে
তেমনি বনে ফুটিলাম বনেই টুটিলাম
আমার আসা-যাওয়া সার হল ভুবনে।
যাক্ যাক্ লয়ে যাক্ এ-প্রাণ হরি' শমনে॥"

ৄকালের যাত্রার গান। কালিদহে কমলে কামিনী দর্শন করেছি বলায় ়িংহল পাটনের রাজা প্রাণদণ্ড দিয়েছেন শ্রীমন্ত সদাগরকে। ইষ্টদেবীকে রণ করে মশানে শ্রীমন্ত গাইছে ওই গান।

এককালে এ-গান যিনি শুনেছিলেন, তিনি গান শুনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন, াবার্থ অত তলিয়ে দেখেননি। কিন্তু হঠাৎ যেদিন চলে গেলেন ঠাকুর, তাঁর রুগৌরব যেন তাঁর সঙ্গেই কালসমুদ্রে অস্ত গেল বলে শংকা হল, সেদিন ভীর ক্ষোভে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে শ্রোতা সবিস্ময়ে স্মরণ করলেন ওই ান। ঠাকুর তো ঠিক এই কথাই বলেছিলেন! বনের ফুলের মত বনের াড়ালেই ফুটে ঝরে পড়ল তাঁর মহাজীবন। কি অপূর্ব ফুলটি যে ফুটেছিল িরি-দরী-উপত্যকার আড়ালে, কেউ তা দেখতেই পেল না। নিজের িয়তি জানতেন বলেই বুঝি গানের ছলে বলতেন মাঝে-মাঝে?

এমনিই হয়। বিশ্বশিল্পী নিজের শিল্প নিজেই আস্বাদ করেন নিভৃতে -নিত্যকাল এ-ই চলেছে। ক্ষুদ্র মানুষের রসবোধ কই অত, আর দৃষ্টিই যায় কতদূর? ক'টা ফুল তার চোখে পড়ে? গহন অরণ্যে তুঙ্গ মগিরিশিরে অজানা কত বনফুল আশ্চর্য সুরভি বিলিয়ে রূপে বন আলো রে দেয় মানুষ তা কি জানে? যাঁর ফুল এক তিনিই সযত্নে চয়ন রেন ফুলটি। তাই তাঁর গলায় বনমালা, না? উদ্যানে ফোটা ফুল ড় তাঁর পায়ে। আর বনান্তরালে ফোটা ওই নিসর্গসম্পদ, ওরই মালা ক দোলে তাঁর! মহাপ্রকৃতি নিজের হাতে ওইসব ব্রহ্মকমল তুলে নর সাধে বনমালা গেঁথে পরিয়ে দেন তাঁকে। আমাদের ঠাকুরও জেকে অমনি বনফুল বলেই চিহ্নিত করেছিলেন তাহলে? বনে ফুটে বনেই টেছি যদি, জগতে আসা-যাওয়ার দরকার কি ছিল তবে? জগৎবাসী া আর জানল না। যার জিনিস তার ভাণ্ডারেই যাই না কেন ার? এ তাঁর আক্ষেপ নয় কিন্তু, পরমার্থতঃ বলা। "বাউলের দল

এল, নাচল গাইল চলে গেল। কেউ দেখল না”—পরমহংসদেবও তে বলেছিলেন গো! আর আক্ষেপই যদি ধরি সেটা নিজের জন্য নয় তাঁদের আক্ষেপ আমাদের জন্য। আমরা তো দেখলাম না, জানলাম না জগতের ধারা এ-ই। “যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। তাঁদের যে-ভূমিতে অবস্থান সে-ভূমিতে জীবের মন নিদ্রিত। দেখবে কে? কে জানবে? কে আস্বাদ করবে?

১৩৩১ সালে ১লা বৈশাখ নীলাচল কুটীরে গৃহপ্রবেশ করেছিলে ঠাকুর। ১৩৪২ সালে মহাপ্রয়াণের পূর্ব পর্যন্ত নীলাচল কুটীরেই থাকতে বেশির ভাগ সময়। এই শেষ বারবছরের বিবরণ যতদূর জানি বলে যাব

অবশিষ্ট জীবন পুরীতেই থাকবেন এই সংকল্প নিয়ে মঠ ছেড়ে ১৩২ সালে ৪ঠা বৈশাখ শ্রীক্ষেত্রে আসেন ঠাকুর; এর আগে নানা জায়গা ভ্রমণ করলেও যেমন তাঁর মূল বিশ্রামস্থলী ছিল আসাম মঠ, তখন থেকে পুরীই সে-স্থান অধিকার করেছিল।

মঠের মহিলাবিভাগ তুলে দিয়েছিলেন ১৩২৮ সালে। মায়েরা সা জন তখন ছিলেন মঠে। তার মধ্যে ১৩২৭ সালের ২৪শে আষা বিমলা-মার বিবাহ হয়ে গেল। বাকী ছ'জনের মধ্যে ভৈরবীমা, সুশীল ও করুণা মা ছিলেন প্রবীণা এবং মঠ ছাড়া তাঁদের আর কোথাও যাবা স্থানও ছিল না। স্থির হল এঁদের জীবনান্তে আর কোনও মহিলাে মঠে রাখা হবে না। গিরিজা মা ও হিরণ মা যে যাঁর আত্মীয়-গৃহে চ গেলেন। শ্বশুরালয় থেকে ফিরে বিমলা-মাও তখন মঠেই রয়েছেন তাঁকে ও সুর-মাকে নিয়ে ঠাকুর পুরী রওনা হলেন। রাজকুমার বা মা ও অশ্বিনীদা (ভজু'র) ছিলেন সঙ্গে। সেবক হিসাবে ছিলেন ব্রহ্মচা হরিদাস।

এত তীর্থ থাকতে পুরী কেন ? বরাবরই পুরীর উপরে ঠাকুরের একটা
পাতিত্ব ছিল। পরিব্রাজক অবস্থায় পুরী এসে বগলা ধর্মশালায়
দুদিন ছিলেন। খুব সম্ভব তখনই পুরুষোত্তমধাম তাঁর অত্যন্ত ভাল
গেছিল। ১৩১৭ সনে দুর্গাপুর আশ্রম হতেও ঠাকুর একবার পুরীতে
সছিলেন। সে-সময় চিদানন্দ মহারাজ নৃপেনদা ইত্যাদি সঙ্গী
য়ছিলেন তাঁর। দুর্গাপুর আশ্রম উঠে যাওয়ার পর মনোমত দু'চারটি
বক নিয়ে বাংলার বাইরে চলে যাওয়ার সংকল্প করেন ঠাকুর। তখন
পুরীতে আসার কথাই উঠে। আবার ১৩২৮ সালে স্বরূপানন্দজীকে
বক হিসাবে নিয়ে অশ্বিনীবাবুদের ভাড়া বাড়ি পুরীর কমলকুটিরে এসে
য়কমাস থেকে যান। আশ্বিন মাসে ঠাকুর পুরীতে এসেছিলেন।
ইবার অগ্রহায়ণ মাসেই প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ তাঁকে এখানে প্রথম দর্শন
রন।* দেখছি ঘুরে ফিরে শ্রীক্ষেত্রের দিকেই তাঁর মন টানছিল।
া শংকরসম্প্রদায়ের অন্যতম এক ধাম এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মৃতিধন্য।
ঠার বৎসর একাদিক্রমে নীলাচলে বাস করে গেছেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
করের মত ও গৌরাঙ্গের পথ যাঁর জীবনদর্শন তাঁর কাছে পুরুষোত্তমধাম
য় হওয়াই স্বাভাবিক। কাশীও তিনি পছন্দ করতেন। তবে

---

* প্রজ্ঞানন্দজী তাঁর লেখা শ্রুতি-স্মৃতিতে বলছেন তিনি ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ
া রাসপূর্ণিমায় পুরীতে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। সালটি তাঁর ভুল হয়েছে।
ানন্দজীর দিনলিপি এবং প্রেমানন্দজীর "সারস্বত মঠ ও স্বামী স্বরূপানন্দ" (২য় সংস্করণ
৪০) প্রমাণে জানি ১৩২৮ সালেই ঠাকুর আশ্বিন হতে ১৬ই অগ্রহায়ণ পর্যন্ত পুরীতে
লন। প্রজ্ঞানন্দজীর উল্লেখও স্বরূপানন্দজীর দিনলিপিতে পেয়েছি। অন্যান্য সব তথ্য
মিলে যায়। সেবার পুরী গিয়ে ঠাকুর সপরিকর গিরিকুটিরে উঠেছিলেন। তার
কমলকুটিরে উঠে যান। ৩টি দোতলা—উপরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও অন্যান্য সবাই নীচে
তেন।

কাশী জনবহুল এবং পুরাদস্তুর একটি সহর। সে তুলনায় তখনকা আমলে পুরী ছিল প্রান্তরবিশেষ। কেবল ফণীমনসার ঝোপ আর ঝা গাছ—ক'খানা বাড়ি ছিল সমুদ্রতীরে ? যাও বা ছিল, তাতে লো থাকত কদাচিৎ। মন্দিরকে কেন্দ্র করে যা কিছু জনবসতি। স্বর্গদ্বা অঞ্চল একরকম ফাঁকাই ছিল। 'বিবিক্ত জনসংসদি' যোগীর প শ্রীক্ষেত্র আদর্শ বিরামনিকেতন। কাশীতে আত্মগোপন করে থাকা কঠি হত। কিন্তু পুরীতে বার চোদ্দ বছর তিনি অনায়াসে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন এ যেন শেষ বার বৎসর মহাপ্রভুর গম্ভীরায় অবস্থান।

১৩২৯ সাল—৪ঠা বৈশাখ পুরী এসে দিনদশেক তিনি সঙ্গীদের
নিয়ে গোয়েঙ্কা ধর্ম্মশালায় থাকলেন। প্রথম দিন এসেই সন্ধ্যার সময়
দলবলে জগন্নাথদর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁর জগন্নাথদর্শন—সেও একটা
দেখার জিনিস। নাটমণ্ডপে ঢুকে বেশ কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকতেন
বিগ্রহের দিকে। ভিড় থাকলে শ্রীমুখশালায় সাধারণত যেতেন না। ওই
জগমোহন বা নাটমন্দির থেকেই দর্শন করতেন। খানিকক্ষণ নির্নিমেষে
দেখে তারপর ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে উঠে সাঙ্গোপাঙ্গদের আদেশ করতেন,
'প্রণাম কর'। তাঁরা জগন্নাথদেবকে প্রণাম করে ঠাকুরের পাদস্পর্শ
করতেন। রাজকুমার বাবুর মা (বুড়ো মা) প্রাচীন হিন্দু-মহিলা।
সন্ধ্যায় মন্দিরে দেব-দর্শন করে বৃদ্ধা বারবার প্রণামান্তে ঠাকুরের কাছে
নিবেদন করেন "গুরু-গোবিন্দ এক ঠাঁই দর্শন করব একদিন।" অর্থাৎ
মণিকোঠায় রত্নবেদীর কাছে যাবেন ঠাকুরের সঙ্গে এবং উভয়কে একত্রে
প্রণাম জানাবেন। ঠাকুর স্মিতমুখে অঙ্গীকার করেন 'আচ্ছা বেশ, যাওয়া
যাবে'। বৃদ্ধার আকিঞ্চন অপূর্ণ রাখেননি ঠাকুর। সঙ্গী চারজনকে নিয়েই
একদিন পাণ্ডার সঙ্গে মণিকোঠায় গিয়েছিলেন। এ সময় মানগোবিন্দ
মহাপান্নভোজীকে ঠাকুর পাণ্ডা স্বীকার করেছিলেন।*

* বছর কয়েক পরে মানগোবিন্দকে ছেড়ে নরসিংহ গুছিকারকে পাণ্ডা স্বীকার
করেন। খাতা পত্র দেখিয়ে গুছিকার মশাই তাঁকে এসে ধরেছিলেন নিশ্চয়। নীলাচল
কুটীরে খানকয়েক ছাপানো হ্যাণ্ডবিল দেখেছি। তাতে লেখা—"আমি জগন্নাথ ধামে
আসিয়া আমার পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃপুরুষের পাণ্ডা বাসেলিসাইনিবাসী শ্রীনরসিংহ গুছিকার
মহাশয়কে তীর্থের পাণ্ডা স্বীকার করিয়াছি। আমার সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ শিষ্যেরা এখানে
আসিলে ইহাকেই পাণ্ডা স্বীকার করিবে। ইনি অতি সজ্জন। বিশেষ যত্ন সহকারে
তাহাদিগকে দেবদর্শনাদি করাইয়া থাকেন এবং অর্থাদি সম্বন্ধে তাহাদিগকে বিশেষ

প্রসাদ খেয়ে নানা দ্রষ্টব্য দেখে ও সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে কোনখান দিয়ে কেটে গেল দশটা দিন। জগন্নাথদেবের প্রসাদও খুব তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতেন ঠাকুর। ঐ রকম তেলমসলাবর্জিত সাত্ত্বিক রান্না তাঁর প্রীতিকর ছিল। তাছাড়া আগে জগন্নাথদেবের যে-সব ভোগরাগ হত তার সঙ্গে এখনকার প্রসাদের তুলনাই চলে না। তখন সত্যই মন্দিরের প্রসাদ ছিল দেবভোগ্য। ভোগে তখন বাজারের পরিত্যক্ত নিকৃষ্ট তরিতরকারি, পচা আধপচা জিনিস দেওয়া হত না। চর্বি বা ডালডার ব্যবহার ছিল অজ্ঞাত। মঠবাড়িগুলির ও জগন্নাথের নিজস্ব জমি-জমার উৎকৃষ্ট দ্রব্যসম্ভারই ভোগে ব্যবহার হত। আবার পাণ্ডারা যে প্রসাদ এনে দিতেন তা সাধারণ প্রসাদের চেয়েও ভাল হত। এখন 'সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই'।

আন্দাজ ১৪ই বৈশাখ নাগাদ সহরাঞ্চল ছেড়ে ঠাকুর চক্রতীর্থের দিকে 'কমল-কামিনী-মন্দির' নামে একখানা বাড়িতে উঠে যান। প্রায় প্রতি দিনই সমুদ্রস্নান আর দু'বেলা সমুদ্রতীরে ভ্রমণই সে সময়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সূর্য্যোদয়ের অনেক আগেই সমুদ্রতীর ধরে পূর্ব্ব-মুখে ঠাকুর বহুদূর চলে যেতেন। চক্রতীর্থের পূর্ব্বদিকে শেষ বাড়ি নলডাঙ্গার রাজবাড়ী। তারপর কেবল বালিয়াড়ি আর ঝাউবন। সমুদ্রতীর ধরে ওই পূর্ব্বমুখে গেলে কনারক পৌছান যায়। সাড়ে চারশ বছর আগে আচম্বিতে মহাপ্রভুকে হারিয়ে একদিন স্বরূপাদি অন্তরঙ্গ

পীড়াপীড়ি করেন না।" উপরে তন্নোধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ সম্বলিত মঠের মুদ্রাটি ছাপা ডানদিকে মঠ ও পাঁচটি আশ্রমের নাম। তলায় টানা সই "নিগমানন্দ"—বইগুলিতে যেমন আছে। খুব সম্ভব পাণ্ডার বিশেষ অনুরোধেই তদানীন্তন সেবক প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ ওটি মঠ থেকে ছাপান।

ক্তেরা সমুদ্রের তীর ধরে ওই দিকেই ছুটেছিলেন তাঁকে খুঁজতে। চৈতন্যচরিতামৃতের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে আছে সে আখ্যান—

"পূর্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন।
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ॥"

খুজতে খুঁজতে চক্রতীর্থের বাঙ্কি মোহানা * ছাড়িয়ে আরও বেশ নিকটা যাওয়ার পর এক জেলের কাছে প্রভুর সন্ধান মিলেছিল। মাছ ধরতে জাল ফেলেছিল সে, শেষরাত্রেই মাছ ধরতে যায় ওরা। সেই জালে উঠেছে মহাপ্রভুর সংজ্ঞাশূন্য দেহ। আচ্ছা, স্বরূপ দামোদর কি ভেবে পূর্বমুখে ছুটেছিলেন মহাপ্রভুর সন্ধানে? প্রায়ই কি ওইদিকে বেড়াতে যেতেন তিনি? কোন কোন মহাজন বলেন পূর্বমুখে কনারকের সূর্যমন্দির। সূর্যোপাসিকা বৃষভানুনন্দিনীর আবেশে মহাপ্রভু ওই দিকে যেতেও পারেন, স্বরূপের এই মনে হয়েছিল। সূর্যপূজার ছলেই তো বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণদর্শন করতেন রাধারাণী। আমাদের ঠাকুরও যতদিন পুরীতে ছিলেন সবসময় পূর্বমুখেই এগিয়ে যেতেন সমুদ্রতীর ধরে। চক্রতীর্থ হতে তো বটেই, যখন স্বর্গদ্বারে বাড়ি হল তখনও বরাবর তাঁকে ওই দিকেই বেড়াতে যেতে দেখেছি। হয়তো পূর্বমুখে চাইলেই তাঁর মনে পড়ত মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ। দেখতেন, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কার সোনার বরণ দীঘল তনু অবশে ভেসে চলেছে। হতে পারে চক্রতীর্থের ওদিকে বালুবেলায় দৃষ্টি পড়লেই তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠত—

"ভূমিতে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ মহাকায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম লটকায়।
দূর পথ উঠাই ঘরে আনন না যায়॥"

* বাঙ্কি মোহানাতেই দারুব্রহ্মরূপী মহানিমকাঠ ভেসে এসেছিল ইন্দ্রদ্যুম্নের জন্য।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদে নীলাচল ধামের আকাশ-বাতাসও পবি হয়ে আছে যেন। বাংলার রূপকথা কি এই সাগরকূলে বসেই লেখা ? সে যে মধুমালার কাহিনী—"সমুদ্রের উথাল পাথাল ঢেউয়ের জলে মদনকুমা 'মধুমালা মধুমালা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভাসিয়া চলিলেন। ** ভাসিতে ভাসিতে কাঁদিতে কাঁদিতে 'মধুমালা-জপনা' মদনকুমার সমুদ্রে জলে অচেতন হইলেন।" মদনকুমার তো নয়, এ যেন কৃষ্ণপ্রেমোন্ম গোরাচাঁদেরই অন্ত্যলীলার এক অধ্যায় গল্পচ্ছলে বলা। কোনও সন্দে নাই সমুদ্রতীরে বেড়াতে গিয়ে এই সব মধুমাধবী লীলা নিত্য স্মরণ হ ঠাকুরের। কিন্তু শেষদশায় তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানে অতলস্পর্শী ছিল তাঁর ভাব। আবেগের বহিঃপ্রকাশ একেবারেই রু হয়ে গিয়েছিল তাঁর। সাক্ষীচেতা-র মত দুই চোখ মেলে কেবল দেখে যেতেন যেন। হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে কিসের তরঙ্গ উঠেছে মু দেখে তা ধরবার উপায় ছিল না একটুও। শুধু নির্বাক প্রশান্তি, শু আপূর্যমাণ অচলপ্রতিষ্ঠা। তাই কেন যে চক্রতীর্থ হতে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় পূর্বদিক ধরে তিনি বহুদূর চলে যেতেন, তার প্রমাণসিদ্ধ কো কারণ দর্শানো আজ আর সম্ভব নয়।

একদিন একটা কাণ্ড হল। প্রতিদিনের মত সেদিন বৈকালে ঠাকুর পূবমুখে বেড়াতে চলেছেন। যেতে যেতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তা ফুটল আকাশে। ঘোর কল্লোল আর সাদা ফেনা দেখে সমুদ্র অনুমা করা যায়, নইলে সব লেপা-মোছা একাকার। ঠাকুরের সঙ্গে আছে বিমলা ও সুর-মা। একটু পিছনে গল্প করতে করতে ঠাকুরকে অনুস করছেন দুইজন। ঠাকুর আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ ধা খেয়ে থেমে যাওয়ার মত থমকে দাঁড়ালেন তিনি। 'কি হল ঠাকুর মায়েদের একজন সাশ্চর্যে প্রশ্ন করেন। লাঠিতে ভর দিয়ে ঠাকুর এ

দিক চাইছেন—যেন স্তম্ভিত ভাব। পরক্ষণে দুইহাতে দুজনের হাত চেপে ধরে বললেন 'চল্ ফিরি। তাড়াতাড়ি চল্।' অজানা আতঙ্কে প্রাণ কেঁপে ওঠে, ক্ষিপ্রগতিতে ফিরলেন মায়েরা। লাঠি-শুদ্ধই একজনের হাত ধরে রেখেছেন এমনই সতর্কতা—দুজনের এক-এক হাতই সমানে ধরা, ছাড়েননি। বেশ খানিকটা এসে থেমে দাঁড়িয়ে গেলেন মায়েরা—'ঠাকুর! একটু জিরিয়ে নিন এবার, হাঁপাচ্ছেন যে!' তাঁদের হাত ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর বললেন 'আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্'। অবাক হয়ে মায়েরা তাঁর হাতে হাত বুলিয়ে দেখেন প্রতিটি রোমকূপ ব্রণের মত স্ফীত হয়েছে যেন, ফুলে উঠেছে গা। ঘন শ্বাস মোচন করছেন তিনজনই। একটু সুস্থ হয়ে বিমলা-মা জানতে চান 'কি হয়েছিল ঠাকুর? অত ভয় পেয়ে গেলেন কি দেখে?' 'এখন নয় কাল বলব—চল্ এবার' বলে দ্রুততরে আবার পা বাড়ালেন তিনি। রাত্রে আর সে প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেলেন না বলে কথাটা আলোচনা করতে মায়েদের সাহস হল না। নিজেরাই বলাবলি করেন কি না জানি ব্যাপার, যা দেখে অত ভয় পেলেন ঠাকুর।

পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই 'কাল যেখানে গিয়েছিলাম চল্ তো সেই আবার' বলে মায়েদের ডেকে নিয়ে ঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন। বহুদূর গিয়ে একজায়গায় থেমে বললেন 'ওই ঝাউবনটা নিশানা রেখেছিলাম। কাল এইখান অবধি এসেছিলাম আমরা কেমন?' সায় দিলেন মায়েরা 'এই পর্যন্তই আসা হয়েছিল বটে!' কিন্তু রাতের বেলা দেখা যায়নি, আজ দিনের আলোয় সাদা সাদা ঢিবি মতন ওগুলো কি? অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়ানো রয়েছে ঢিবিগুলো। কোন কোনটা আবার একটু ঘেরা দেওয়া ছোট মন্দিরের মতন। কি ওসব? ঠাকুরও দেখছিলেন। হাত তুলে ঢিবিগুলো নির্দেশ করে বললেন 'নুলিয়াদের কবর এগুলো।

কাল এইজন্যই অত বিপত্তি। আমি কি জানি এদিকে ওদের কব আছে আর প্রেতযোনির আড্ডা সেগুলো?' মেয়েদের দিকে চে সস্নেহে বললেন 'আমি সঙ্গে না থাকলে কাল এখান থেকে ফিরে পারতিস্ না তোরা। আচমকা ভয় পেয়ে প্রাণ যেত হয়তো!' এরপ থেকে মায়েরা সঙ্গে থাকলে সন্ধ্যার পর খুব বেশিদূর আর বেড়া যেতেন না। কিছুদিন পর ও-অঞ্চলই ছেড়ে গেলেন। বাজার হা সবই বড় দূরে। সেবক হরিদাসের অবশ্য কিছুতেই আপত্তি ছিল না সকালবেলা ঠাকুরের যাবতীয় কাজ সেরে রান্নাঘরে উনানে ডাল বসি ছুটতে-ছুটতে সিংদরজায় গিয়ে বাজার করে এনেছেন কতদিন। ঠাকুরে জন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট মনে করতেন না তিনি। তাঁর সেবার কথা প আরও বলব। যাই হ'ক, তিনি যাতায়াতের অসুবিধা গ্রাহ্য না করলে ঠাকুরের এ-বিষয়ে উদাসীন থাকা সম্ভব ছিল না। তিনি বাড়ির খোঁ নিতে বললেন। আনুমানিক ১৮ই আষাঢ় ৩নং গিরিকুটির নামে একখা বাড়িতে চলে এলেন সকলকে নিয়ে। এ-বাড়ি থেকে সমুদ্রও বেশি দূ নয়, আবার দোকান বাজারও অত বেশি দূরে পড়ে না। পোষ্টাফি কাছে, পাড়াটিও ভাল।

রথযাত্রা পর্যন্ত সেবার ঠাকুর পুরীতেই ছিলেন। রথের আ বড়দাণ্ডের উপরে কোন একটা মঠের (বোধহয় মঙ্গু মঠ) ছাদ ভাড়া ক হয় দশ টাকা দিয়ে। সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে বসে রথের আদ্যন্ত কৃ (পহণ্ডি, ছেরা পহরা ইত্যাদি) দেখার পর নেমে এসে সশিষ্য ঠা রথের দড়ি ধরে খানিকটা টেনে রথযাত্রা দেখা সম্পূর্ণ করলেন। চিঠি থেকে যতদূর জানা যায় এর পর বুড়ামা, ভজু'র অশ্বিনীদা ও বিমলা এ সুর-মাকে রেখে হরিদাসকে নিয়ে ঠাকুর বাংলায় চলে যান।

১৩২৯-এর ১লা শ্রাবণ সৈয়দপুর হতে লিখছেন 'উত্তরবঙ্গের সর্বত্র ৩ দিন করে বেড়াতে হবে। শেষে বগুড়া হয়ে মঠে যাব। শ্রাবণের ।১২ তারিখে মঠে পৌছানর সম্ভাবনা।'

এই সময় শ্রদ্ধেয় বিহারী শর্মা সারস্বত মঠে এসে কিছুদিন ছিলেন। ারদীয়া পূজার পর ঠাকুর পুরী ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে াহারীদাকে সেবক হিসাবে সঙ্গে যেতে বলেন। হরিদাসদা ছাড়াও ার একজন সেবক থাকলে নূতন জায়গায় সুবিধা। অশ্বিনীদার ীবাসের সাধ মিটেছিল। কাজেই তাঁর পরিবর্তে আর একজন কাউকে ওয়া যেতে পারে এজন্য ঠাকুর বিহারীদাকেই সে-সুযোগ দিতে য়েছিলেন। পরে মঠের যুগলদা যেতে চাওয়ায় বিহারীদার পরিবর্তে কে এবং হরিদাসদাকে নিয়েই ঠাকুর পুরী আসেন।

বিহারীদার 'ঠাকুরমাহাত্ম্য' দেখছি ঠাকুর তাঁকে ডেকে বলছেন, খ যুগল বুড়ো মানুষ, বহুদিন আগেই আমি তাকে পুরী নেব বলে া দিয়েছিলাম। কাজেই এবার তোমার যাওয়াটা থাক্।' এখন ই ব্রহ্মচারী যুগলকিশোর সম্পর্কে কিছু বলার আছে।

তার আগে একটা কথা বলে রাখি। ভক্ত-ভগবানে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। বৎমহিমা ভক্তই প্রচার করেন বলে সহজ বুদ্ধিতেই বুঝি, দেবলীলা- নে ভক্তের ভূমিকা অসামান্য। ঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে আমাকেও বার তাঁর শিষ্যভক্তদের প্রসঙ্গ তুলতে হবে। শুধু ঠাকুরকে নয়, র প্রিয় পরিকরদের অনেককেই আমি দেখেছি। যাঁদের দেখিনি দের কথা শুনেছি, পড়েও-ছি। আজ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁদের স্মৃতি- লেখ্য এঁকে যাওয়া আমার পক্ষে অপরিহার্য।

অন্তেবাসী যুগলকিশোরদাকে চোখে দেখা দূরে থাক নামটাও বিশেষ রা কাছে শুনিনি। এক পড়েছিলাম বিহারীদার বইখানায়। আর,

ঠাকুরের বহু পুরাতন সন্ন্যাসী শিষ্যদের নাম জানতে চাওয়ায় ম
(শ্রীসুরবালা দেবী) এঁর নাম করেছিলেন। সন্ন্যাস দিয়ে ঠাকুর তাঁ
নাম রাখেন কিশোরানন্দ। তিনি সন্ন্যাস পাওয়ার আগে একবার
পুরী এসেছিলেন, বিহারীদার এ কথাটাও যাচাই করে নিই মায়ে
কাছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এ ছাড়া দীর্ঘকাল আর কিছু জানতা
না। কিন্তু বছর কয়েক আগে একখানা বই-এ যুগলকিশোরদার নতু
পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

নিবেদিতার জীবনীকার শ্রীমতী লিজেল রেমঁ Ma Vie Ch
Les Brahmanes নাম দিয়ে ফরাসীতে যে বইখানা লিখেছেন, শুনল
তাতে আমাদের ঠাকুরের কথা আছে। এ দেশে ও-সব বই বড় আ
না। অপেক্ষায় থাকতে হল, গ্রন্থকর্ত্রী আশ্বাস দিলেন সুযোগমত আম
জন্য একখানা বই তিনি পাঠাবেন। ইতোমধ্যে বইখানার ইংরে
অনুবাদ হয়ে গেল—My Life with a Brahmin family। ফরা
ভাষায় ভাল দখল না থাকায় রসগ্রহণে বাধা হবে বিবেচনায় রেমঁ
পর্যন্ত ওই ইংরেজী অনুবাদেরই এক কপি আমাকে পাঠিয়ে দেন।*

তার মধ্যে দেখি যুগলকিশোরের নাম, অনির্বাণজীর মুখে তাঁর ক
শুনেছেন বিদুষী রেমঁ। ও বইতে আমাদের ঠাকুর, তাঁর মঠাশ্রম
যুগলকিশোর সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য তা শ্রদ্ধেয় অনির্বাণজীর জবানিতে
লেখিকা পরিবেশন করেছেন। আমি এখানে যুগলকিশোরদার প্রসঙ্গ
অনুবাদ করে দিলাম—

"আশ্রমে যখন প্রথম দেখলাম তাঁকে, তাঁর বয়স তখন প্রায় প
হবে। মাথার চুল দুধের মত সাদা হয়ে গেলেও শরীর বেশ শক্ত

* দ্র. ইউরোপীয় সাহিত্যে ঠাকুর নিগমানন্দ।

হ। কিন্তু মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে—ক্রুশবিদ্ধ ঈশার যেন। বিষাদমাখা দুটি চোখ—কারও দিকে তিনি চোখ তুলে াতেন না কখনও। শান্তশিষ্ট মানুষটি, গলায় তুলসীকাঠের মালা। নবেলায় চা-বাগানের কুলি হয়ে তিনি আসামে এসেছিলেন। কটা লুশিয়ানার নিগ্রোদের মতই দাসত্বের জীবন সেটা। বিশ্ব-হাসে কলঙ্কের অধ্যায় এসব। ওই চা-বাগান আর নীলকরদের কায় যা ঘটনা সব ঘটে গেছে, শুনলে বুক ভেঙ্গে যায়। আইনের নির্মম অত্যাচারেরও সমর্থন মিলেছে।

"যুগলকিশোরকে আসলে পাঁচ বছরের জন্য ঠিকা নেওয়া হয়েছিল—একবার চুক্তিনামায় টিপসই দিলে জীবনে আর চা-বাগান ছাড়া শক্ত মানুষের আর তখন স্বাধীনতা বলে কিছু থাকত না—টাকা দিয়ে নতা কেনবার সামর্থ্যও নয়। যুগলকিশোর অন্যজাতের একটি কে বিয়ে করেছিলেন। কুলিদের মধ্যে এটায় কেউ তেমন গুরুত্ব না। সুখে-দুঃখে এক যারা, তারা অনায়াসে যার যাকে ইচ্ছা বিয়ে পারে। নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী পনের বছর সংসার পর বার বছরের একটি রুগ্ন ছেলে রেখে স্ত্রী মারা যায়। ছেলেটিও অল্পদিন পরে চলে গেল। যুগলকিশোর নিজেকে ভয়ানক নিঃসঙ্গ করতে লাগলেন।

যাই হ'ক, যুগলকিশোর শেষ পর্যন্ত কোন রকমে চা-বাগান থেকে পেয়ে অন্য কয়েকটি কুলির সঙ্গে স্বাধীন ভাবে দিনমজুরী করতে ন; সে জায়গাটা বজু-র (Badjo)* কাছাকাছি। বেচারীরা ্যেত, তা হ'ক তবু তো স্বাধীন! বাংলায় একটা কথা আছে 'জাত

ভজু" (Bhajo)।

হারালে বৈষ্ণব'। বাস্তবিক বৌদ্ধযুগের পর থেকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-ধর্মই এই হতভাগ্যদের একমাত্র আশ্রয়।

"একজন বৈরাগী ঐ অঞ্চলে গেলেই ওদের সঙ্গে দেখা করতেন। উৎসবে-পর্বে তিনিই ওদের আশ্রমে নিয়ে আসতেন আমাদের সঙ্গে ভজন গাইবার জন্য। প্রায়ই আমাদের ওখানে আসাটা ক্রমে যুগলকিশোরের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। শেষে তিনি আশ্রমে থাকার অনুমতি চাইলেন —সাধন ভজনে চিত্তশুদ্ধি তাঁর বড় প্রয়োজন।

"যে কোন কারুশিল্পেই যুগলকিশোরের দক্ষতা ছিল—বিশেষ করে মাটির ঘর তোলা, খড়ের চাল ছাওয়ানোর কাজে। দেখলে মনে হত কাজ-কর্মে বেজায় ঝোঁক লোকটির, সব ভুলে মেতে আছেন ওইসব নিয়ে। একটা কাজ ফুরালেই আর একটাতে লেগে পড়তেন সমান উদ্যমে। তাঁর মনের ভাব কিন্তু কেউ ধরতে পারতাম না। আমাদের সবার সঙ্গেই তাঁর নির্বিরোধ শান্ত ব্যবহার।

"একদিন তিনি উধাও হয়ে গেলেন। আশ্রমে অনেকেরই এমন বিদ্রোহের ভাব আসে—কেউ-ই এতে অবাক হল না। কোন একটা গণ্ডগোল হয়ে থাকবে কোথাও তাই উনি চলে গেছেন। দু সপ্তাহ পরে কিন্তু ফিরে এলেন যুগলকিশোর—হতশ্রী দশা, পাগলের মত ভাব, চোখ দুটো জলছে। এসে গুরুদেবের পায়ে আছড়িয়ে পড়ে বলতে লাগলেন, 'মাথা বিগড়িয়ে গিয়েছিল আমার, জাহান্নামে গিয়েছিলাম আমি। তুমি যে আমার গুরু এ আর মানতে চাইনি।' আমাদের উদ্দেশ করে বললেন, তিন আনা দিয়ে জংশন ষ্টেশন অবধি একখানা টিকিট কেটেছিলেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেলেন। 'দিনে দুপুরে যেন রাত্রি নেমে এল' উনি বলেন 'কিছু দেখতে পাইনে, না ট্রেন, না রেলের লাইন। আমার ঠাকুরকে যে ছেড়ে গেছি—এ আর কিছু নয় শুধু সেইজন্য।'

"এর পর থেকে আবার আগের মত চুপচাপ হয়ে গেলেন যুগলকিশোর —যথারীতি নিজের কাজ করে যান। এই সময় ছেলেদের আমি সাংখ্যের পাঠ দিচ্ছিলাম। হাটে মাঠে কাজ করতে যাওয়ার আগে খুব ভোরে আমাদের পাঠের আসর বসত। যুগলকিশোর এই আসরে যোগ দিতে লাগলেন—দূরে এক প্রান্তে মাথাটি নীচু করে বসে শুনতেন তিনি। একটা দিনও বাদ দিতেন না। আমরা বলাবলি করতাম, 'এক অক্ষর সংস্কৃতও যে জানে না, তার এ শুনে কি হয়?'

"তারপর দ্বিতীয়বার উধাও হলেন তিনি—আমরা ভাবলাম আবারও মঠ ছেড়ে পালালেন না-কি! যা হ'ক পরে শুনলাম—না, আশ্রমসংলগ্ন একটা খামারবাড়িতে গিয়ে আছেন, ভালই রয়েছেন সেখানে। কাজকর্ম্ম কিছু করেন না, ধ্যানধারণা উপবাসব্রত নিয়ে নীরবে দিন কাটছে। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে দেখতাম চোখ লাল, যেন একেবারে তলিয়ে গিয়েছেন নিজের ভাবে। আমাদের ভয় হ'ল মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার, এবার মরবে। কিন্তু করার কি আছে তা-ও জানি না।

"তিনি কিন্তু মরলেন না। তিন হপ্তা বাদে আশ্রমে ফিরে এলেন, দেহটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, খুব দুর্বল। এসে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন—যা কিনা এর আগে কোনও দিন চাননি। একান্তে কথা হল গুরু-শিষ্যে।

"সেইদিন সন্ধ্যায় গুরুদেব আমায় ডেকে বললেন, 'এখন থেকে যতদূর পার চোখে চোখে রাখবে যুগলকিশোরকে, সযত্নে ওর পরিচর্যা করবে। তার কারণ সিদ্ধপদবীতে আরূঢ় হয়েছে ও। সাংখ্যের প্রতিটি তত্ত্ব ওর ধারণা হয়েছে। তোমরা যতজন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী আছ, ওর মত কেউ নও। ও সন্ত একজন, সহজাত বোধে পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব অধিগত হয়ে গেছে যুগলকিশোরের।'

"বাকী জীবনটা তিনি ওই রকম নির্ব্বাক হয়েই ছিলেন। কিন্তু তাঁর ওই নীরব প্রশান্তিই আমাদের একটা অভিনব প্রেরণা দান করত।"

রেমঁর লেখায় ব্রহ্মচারী যুগলদার এ-পরিচয় পেয়ে একেবারে অবাক আমি। বিহারীদার বইখানায় নিতান্তই প্রসঙ্গক্রমে যাঁর নামটা পেয়েছিলাম, কে জানত আজ ইউরোপে তাঁর সাংখ্যানুভূতির বার্তা প্রচারিত হচ্ছে? সাংখ্যযোগী যুগলকিশোর সত্যই এককালে মঠের সেবক ছিলেন,—না এ আর কেউ?

আমার প্রশ্নের উত্তরে রেমঁর বিবৃতিকে সমর্থন করে অনির্বাণজী লিখলেন—

"যুগলকিশোর দাস মঠেরই একজন সেবক ছিলেন। *** কালো মানুষটি কিন্তু মুখের গড়ন গ্রীক দেবতার মত ছিল। লেখাপড়া সামান্যই জানতেন। আমি তখন আশ্রমের ছেলেদের সাংখ্যের পাঠ দিচ্ছি। যুগলকিশোর এক ধারে বসে প্রতিদিন মন দিয়ে শুনতেন। আমি একটু অবাক হয়ে ভাবতাম সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় বিচারের মাঝে বৈষ্ণব যুগলকিশোর কী রস পাচ্ছেন? দু'তিনমাস সাংখ্য শোনার পর যুগলকিশোর গুম হয়ে গেলেন। কাজকর্ম করেন না, ঘর থেকে বেরোন না, খাওয়া-দাওয়া করেন না, পরনে কাপড় থাকে না। *** একদিন যুগলকিশোর কষ্টেস্যষ্টে এসে বললেন, ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করব। নির্জনে দেখা হল। সেইদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর বললেন যুগলের সাংখ্যানুভূতির কথা—কেমন করে পুরুষের আলোয় মোমের মত প্রকৃতির গুণগুলি একে একে গলে পড়তে লাগল।

তারপরও যুগলকিশোর কিছুদিন ছিলেন। কিন্তু অসঙ্গ পুরুষের মত থাকতেন।"

অদ্ভুত ব্যাপার! প্রায় নিরক্ষর এক বাউল—শুধু শুনেই তাঁর চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হয়ে পুরুষতত্ত্বে স্থিতি হ'ল? যুগলকিশোর যেন সনাতন ভারতবর্ষের প্রতীক—দেশ-কাল-পাত্রের হিসাব কষে তাঁকে মাপা যায় না। 'অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ!' আর, যেমন গুরু তাঁর তেমনি চেলা। যুগলকিশোরের আসা-যাওয়ার মধ্যে কোথাও এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই। যেমন নিঃশব্দে গুরুগৃহে আসা তেমনি নীরবেই "যোগেনান্তে তনুত্যাগঃ"। কে জানল কতবড় প্রাণটি নিভৃতে ফুটে ঝরে পড়ল? যুগলদার বিবরণ জেনে ঠাকুরকেও যেন আবার নূতন করে চিনলাম। অতবড় একটা সাধু—সে যে একদিন তাঁর পায়ে ধরে বলেছিল 'আমার ঠাকুরকে ছেড়ে গিয়ে দিনে দুপুরে অন্ধ হয়ে গেলাম আমি,—ঠাকুর! আর তোমায় ছাড়ব না কখনও' তা কই? ঠাকুর তো একদিনও সেই সাংখ্যযোগীর গুণকীর্তন করে পরোক্ষে নিজের গুরু-গৌরব জাহির করেননি? ঠাকুরকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন এমনি সব গভীর কথা সহজে তাঁর মুখে ফুটত না। যুগলকিশোরের অপূর্ব পরিণতি যেখানে-সেখানে বলার জিনিস নয়, বললে খেলো হয়ে যায় তার দাম। আর নিজের দাম? একটা কেন দুটো দশটা যুগলকিশোর এলেই বা কি গেলেই বা কি? নিগমানন্দ যা তাই-ই—ওতে তাঁর বাজারদর কমে-বাড়ে না, এই ভাবতেন নিশ্চয়। 'কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।' ভাবি, যুগলকিশোরের মত আরও কত মুমুক্ষু তাঁর দুয়ারে এসেছে, সাধনসঙ্কেত পেয়ে কৃতকাম হয়ে বিদায় নিয়েছে, আমরা সে খবর অল্পই রাখি। সম্ভবতঃ এঁদের কথা ভেবেই তিনি বলেছিলেন—'যারা সাধন-ভজনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমার কাছ থেকে সাধনার নির্দেশ নিয়ে চলে গেছে তারা উত্তম অধিকারী'। তাঁদের কথা মনের মণিকোঠায় লুকিয়েই রেখেছেন ঠাকুর,

হাটে মাঠে বলতে রুচি হয়নি। জানতেন, তাঁদের বুঝবেন এক তিনি, অন্যে কি বুঝবে?

ব্রহ্মচারী হরিদাস ও যুগলকিশোরকে নিয়ে পুরী ফিরে খুব বেশি দিন সেবার ঠাকুর ওখানে ছিলেন না। রাজকুমারবাবুর মা বুড়োমানুষ,—বিমলা ও স্বর-মা দুজনেই ছেলেমানুষ, বৃদ্ধ ভজু'র অশ্বিনী মাত্র তাঁদের রক্ষক। এজন্য উদ্‌বিগ্ন হয়ে একবার মায়েদের খোঁজ খবর নিতেই যেন এসেছিলেন। ২রা কার্তিক পুরী আসব লিখছেন। দেখছি ২৪শে কার্তিক গিরিকুটির থেকে বিহারীদাকে চিঠি লিখছেন।

ঠাকুর ৩নং গিরিকুটিরে থাকার সময় এই কার্তিক মাসেই শক্তিদা (স্বামী সিদ্ধানন্দ মহারাজ) দ্বিতীয় বার এসে তাঁকে ধরলেন। ১৩২৭ সালে একবার তিনি অন্তেবাসী হওয়ার আশায় আসাম মঠে ছুটে গিয়েছিলেন। সে এক মজার কাহিনী।

পড়া-শোনার জন্য সাত বছর বয়স থেকেই শক্তিদা অনেকটা প্রবাসী হয়ে পড়েন। প্রথমে ছিলেন আদ্রা তারপর পুরুলিয়ায়। নীতিবাগীশ কড়া অভিভাবকের কঠোর বিধিনিষেধে এবং প্রাক্তন সৎসংস্কারে শক্তিদার ব্রহ্মচর্যব্রতে বড় উৎসাহ ছিল। এক বন্ধুর কাছে কোকিলামুখ সারস্বত মঠের 'নগানন্দ' স্বামীকৃত ব্রহ্মচর্য-সাধনের সুখ্যাতি শুনলেন। অমনি চিঠি লিখলেন ওই ঠিকানায়—'নগানন্দ' স্বামীর অমুক বইটি চাই। গ্রন্থপ্রণেতার নাম যা-ই লিখুন মঠ হতে বইটি এল। তার মধ্যে প্রথম দেখলেন ঠাকুরের চিমটা-করঙ্গাধারী সেই ফটো। শক্তিদার ভাষায় 'আমি প্রেমিকগুরু কি জ্ঞানীগুরুর ফটো প্রথম দেখিনি। দেখলাম ওই কাঠখোট্টা মূর্তি। তা-ও কিন্তু ভা-রী পছন্দ হয়ে গেল এবং মনে মনে গুরুবরণ করাও হল।'

বইখানা সাগ্রহে পড়ে সাধ্যমত নিয়ম-নীতি পালন করতে লাগলেন। তারপর ওই বিষয়ে নানা প্রশ্ন করে চিঠি দেন আর উত্তরে তদানীন্তন

ঋষিবিদ্যালয়ের আচার্য বরদা ব্রহ্মচারী (নির্বাণানন্দজী) বড় বড় চিঠি দেন। ঠাকুরের অন্যান্য বই এনেও পড়লেন। ক্রমেই অন্তেবাসী হয়ে আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত পালনের উৎসাহ বাড়ে। শেষে '২৭ সালের বিজয়া-দশমীর পর ত্রয়োদশীতে বাড়ি ছেড়ে পলায়ন। জানলে তো কেউ ছাড়বেন না!

শক্তিদা তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলের বড় ম্যাপে রেল লাইন দেখে দেখে আসাম যাওয়ার পথ ঠিক করে নেন। বহু দূরের পথ—পাথেয়? পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান বলে অভিভাবকদের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন। যে-আলমারীতে তাঁদের টাকা পয়সা থাকত তা শক্তিদার কাছে ছিল অবারিত-দ্বার। অতএব এক রাত্রে সে-ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে একমুঠো টাকা সরানো হল এবং সকালে পদব্রজে ১৫ মাইল দূরের আসানসোল। যে বন্ধু একদা 'নগানন্দ' স্বামীর সন্ধান দিয়েছিলেন পূর্বপরামর্শমত তিনিও তাঁর সঙ্গী হলেন।

শক্তিদা ট্রেনে দূরের পথ কখনও যাননি। সোজা যোরহাটের টিকিট কাটবেন সে বুদ্ধি নাই। এক জংশনে নামেন আর পরবর্তী জংশনের টিকিট করেন। এর মধ্যে টাকা চুরি হয়ে গেল। কাটিহার পর্যন্ত কোন মতে গিয়ে পায়ের নতুন জুতো আর বন্ধুর আংটি বিক্রী করে রেলভাড়া যোগাড় হল। শেষে এক সন্ধ্যায় যোরহাটে নেমে কার্তিকের শীতে হি হি করতে করতে স্টেশনে রাত কাটালেন। পরদিন সকালে ট্রেনে জাহাজঘাট গিয়ে 'টেঙা গাখির' (দইয়ের আসামী নাম) আর চিঁড়া জলযোগ করে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মঠে পৌঁছালেন।

মঠে যাব—সেখানে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব তখনও এই আগ্রহই কিন্তু মুখ্য। এমন-কি সেই প্রথম শোনা 'নগানন্দ' সরস্বতীদেবকে দেখারও তত ঔৎসুক্য ছিল না। বিকাল বেলায় ঠাকুরকে প্রথম দেখলেন। আবার

শক্তিদার ভাষায় বলি—'তাঁর ফটো দেখে তো ভাল লেগেইছিল। চোখে দেখে এত ভাল লাগল যে সে আর বলার নয়।' ঠাকুর তাঁদের কাপড়-বিছানার অভাব দেখে মঠকর্তৃপক্ষকে আদেশ করলেন, "ওদের কাপড়-চোপড় আর কম্বল দিস্।"

যুগলদার ঘরে থাকার জায়গা হল। প্রবোধদা† রোহিণীদা*কর্মসঙ্গী। শক্তিদা পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই ঘর-বাড়ি সব ভুলে অন্তেবাসীদের একজন হয়ে গেছেন। সন্ধান নিতে নিতে কয়েক দিন পরে তাঁর পিতৃদেব যখন মঠে এলেন শক্তিদা তখন মহোৎসাহে ক্ষেতে আলু লাগাচ্ছেন। চোখে জল—বাবা এসে সামনে দাঁড়ালেন এক সময়। শক্তিদার মনে হয় যেন কে না কে! এই তো তাঁর আপন ঠাঁই, এরাই তো স্বজন! তিনি স্পষ্ট বলেই ফেললেন—"পিতা কস্য মাতা কস্য" ইত্যাদি।

অভিভাবকরা কৌশল ক'রে সেবার তাঁকে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু মঠের স্মৃতি ও সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের ত্যাগপূত জীবন সেই তরুণ বয়সে তাঁকে কিরকম অভিভূত করেছিল, ভুবনদা ও চিদানন্দ মহারাজের স্মৃতি-তর্পণকালে তিনি তার অপূর্ব পরিচয় দিয়ে রেখেছেন। পুরুলিয়ায় আত্মীয়-স্বজনের মাঝখানে ফিরে এলেও তাঁর ভাষাতেই বলব—'মঠের গুরুগম্ভীর ভাব, স্নিগ্ধ পরিবেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনকে মুগ্ধ করিয়াছে। ঋষিগণ-অধ্যুষিত প্রাচীন তপোবন যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে এইস্থানে'—এমনই তাঁর প্রাণে দাগ কেটেছিল সারস্বত মঠ ও সেবকসঙ্ঘ। কটক মেডিকেল স্কুলে পড়তে পড়তে যেমনি খবর পেলেন ঠাকুর পুরীতে এসে আছেন—শক্তিদা আর স্থির থাকতে পারলেন না। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃতের শুরুতেই ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সে-সময়ের আলাপের সারাংশ

† পরলোকগত ট্রাষ্টী প্রবোধকুমার কুণ্ডু। * বর্তমানে স্বামী নিত্যানন্দ সরস্বতী।

ধরা আছে। '২৯ ও '৩০ সালে ঠাকুর ঘুরে-ফিরে পুরী এলেই শক্তিদা একবার ক'রে ছুটে আসতেন তাঁর কাছে—নিজেই লিখেছেন।

চিঠিপত্রে মঠের সঙ্গে যোগ রাখা তিনি ছাড়েননি। মঠ হতেই তাঁকে জানান হয় যে '২৯ সালের বৈশাখ হতে ঠাকুর পুরীতে থাকা স্থির করেছেন। এখন তিনি ৩ নং গিরিকুটিরে। এ-খবর পাওয়ার পর 'কালকেই পুরী যাব' স্থির করে রাত্রে শুয়ে পড়লেন। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিতে ভুল হয়ে গেল। তখন রাত্রি ৪টা নাগাদ পুরীর গাড়ী কটকে আসত। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই শক্তিদা ধড়মড়িয়ে উঠে দেখেন, সর্বনাশ! ঘড়িতে তো চারটা বাজে! হষ্টেল হতে মাইল খানেক পথ এক জংলা রাস্তায় 'শর্টকাট' করে ছুটতে ছুটতে স্টেশনে এসেই চোখে পড়ল দূরে লাল সিগ্‌ন্যাল্। একটা মস্ত ট্রেন সেখানে দাঁড়িয়ে। তার ইঞ্জিন ফোঁস-ফোঁস করছে! টিকিট ঘরে জানতে যান 'পুরীর গাড়ি কি চলে গেছে?' 'না, ওই তো' কেউ একজন হাত তুলে দেখাতে-না-দেখাতে নীল সিগ্‌ন্যাল পড়ল। পুরী একস্‌প্রেস এসে দাঁড়াল স্টেশনে।

সঙ্গে এক ওড়িয়া বন্ধু ছিল। পুরীতে নেমে সে বলল 'চল আগে জগন্নাথ দর্শন করে আসি'। শক্তিদা বলেন 'তুমি যাও, আমি এদিকে আগে আমার জগন্নাথকে দর্শন করি'। কিন্তু কোথায় ৩নং গিরিকুটির! রাস্তার নাম নাই, জায়গাটার কোনও হদিশ নাই! তবু হাল ছাড়েন না শক্তিদা। আশ্চর্যভাবে ট্রেনটা পেয়ে যাওয়ায় বুকে বল বেড়েছে। মনে আশা, ভাগ্যে থাকলে ঠিক দেখা পাব। স্টেশন হতে সমুদ্রের ধার ধরে খুঁজতে খুঁজতে চলেন। আবার ভাবেন: তাঁকে দেখলে ঠিক চিনতে পারব তো? তিনিই কি আমায় চিনবেন? দু'বছর হয়ে গেল · ।

দৈবের নির্বন্ধ—চলতে-চলতে শেষে শক্তিদা যে-পথ ধরেছেন সেই পথ ধরেই সপরিকর ঠাকুর আসছেন সমুদ্রস্নানে। সুতরাং দেখা হয়ে

গেল, শক্তিদা দেখেই চিনলেন এবং ঠাকুরও দেখা মাত্র চিনে ফেললেন! প্রণাম গ্রহণ করে 'এস আমার সঙ্গে' বলে ঠাকুর সমুদ্রতীরে এলেন। তারপর পায়ের পাম্পসু খুলে হাতের লাঠি রেখে পাঞ্জাবী ছেড়ে শক্তিদাকে বললেন 'তুমি এখানে পাহারায় থাক, আমরা স্নান করে আসি'। তিনি গিয়ে সমুদ্রে নামলেন। শক্তিদা ওদিকে চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কি এক অসংবরণীয় আবেগে 'পাম্পসু' জোড়া নিয়ে বুকে চেপে ধরেন। মনে হল প্রাণ জুড়িয়ে গেল যেন।

এর পর আলাপাদি হল। তাঁর আসা-যাওয়ার পথে কটক স্টেশনে দেখা করার সুযোগ চিঠি লিখে ঠাকুরই করে দিতেন।

তার পরই পাচ্ছি ১১ই অগ্রাণ ঝাওয়াইল থেকে লেখা চিঠি। ১৩ই অগ্রাণ সিরাজগঞ্জ থেকে বিহারীদাকে লিখছেন—"বন্যা-সেবায় সেবকগণকে পাঠানোর জন্য পুরীর বাসা খালি রাখিয়া আসিতে হইয়াছে। * * * পুরীধামে একটী বাড়ি করাই স্থির সঙ্কল্প করিয়াছি। এতদর্থে সমুদ্রের ধারে দেড় হাজার টাকায় একটা জমি বায়না করিয়াছি, এবার পুরী গিয়া লেখাপড়া শেষ করিব। এবং বাড়ি করিতে চেষ্টা করিব।"

১৭ই অগ্রাণ তাড়াশ অবিনাশ গোস্বামীর বাড়ি হয়ে স্থলে যাচ্ছেন এইরকম উল্লেখ আছে। চিঠিখানায় তিনি মায়েদের আশ্বাস দিয়ে লিখছেন—"কোন সেবক পুরী না আসিলেও ক্ষতি নাই। মহারাণী তোমাদের সহায়। তাহার নামে যমেও ভয় পায়।"

আমরা স্বয়ং মাহেশ্বরীর পরিরক্ষিত—সাক্ষাৎ সদাশিবের কাছ থেকে এ-আশ্বাস পেয়েছি। ওই ছত্রদুটি চিত্তপটে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকার কথা যে! থাকে কই?

এ-যাত্রায় ঠাকুর যে 'স্থলে' গিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে একটা বিশেষ ঘটনা শুনেছি। সেবার ওখানে কোন এক সুকৃতিশালী কীর্তনীয়ার মুখে কুঞ্জভঙ্গ কীর্তন শুনতে শুনতে নাকি তাঁর সমাধি হয়ে গিয়েছিল। জগতে আর ফিরতে চায়নি মন, ঠাকুরাণী জোর করে ফিরিয়ে এনেছিলেন। মনে পড়ে বহুদিন আগে নবদ্বীপে সাতপহরিয়া মহাপ্রকাশের পর সমাধিতে ডুবে গেলেন গৌরকিশোর। কোন মতেই তাঁর সমাধি ভঙ্গ হয় না দেখে ভক্তরা প্রমাদ গণেন। শেষে অন্তরঙ্গ পার্ষদরা পরস্পর পরামর্শ করে কুঞ্জভঙ্গ কীর্তন শুরু করলেন। অল্পক্ষণ পরেই হুঙ্কার করে উঠে বসলেন গৌরহরি—কৃতকাম বৈষ্ণবরা জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলেন আনন্দভরে। কি আছে ওই কুঞ্জভঙ্গ কীর্তনে?

পদাবলী নেড়ে চেড়ে দেখি নিশান্তলীলারই নামান্তর কুঞ্জভঙ্গ। বৃন্দা-দেবী এসে সখীদের বলছেন 'দেখহ নিশি বহি গেল। দশদিশি অরুণিম ভেল॥'—এবার জাগাও যুগলকিশোরকে। বনাধ্যক্ষার ইঙ্গিত পেয়ে বিশ্বপ্রকৃতি বিহগঝঙ্কারে সূচিত করেন প্রভাতী ললিত আলাপ—

জাগহ রে বৃষভানুকুমারি !
শ্যামর কোরে গোরি কিয়ে ভোরলি পুন
বোলত শুক-সারি ॥
যামিনী তিমির থির নাহি হেরিয়ে
পরশি অরুণরুচি রঙ্গ।
নাগরী নীল পটাঞ্চলে লাগল
জনু বিরহানলে অঙ্গ ॥

শুকসারী 'রাই জাগ রাই জাগ' বলেই ডাকে। ভাবলোকে ঠাকুরাণীরই সমধিক প্রতাপ। সে রাজ্যের রাণী তিনিই, পরমপুরুষ তাঁর নগরপাল—অধীন সেবক মাত্র। অন্ততঃ সেখানকার ভাবুক প্রজাদের তা-ই

মত। এজন্য বৃষভানুকুমারীকেই প্রবোধিত করছে শুকসারী। আবার ভাবি, তত্ত্বে আর ভাবে প্রভেদ-কল্পনাটা আমাদেরই পল্লবগ্রাহিতা। কল্পপ্রভাতে পদ্মযোনিও তো ঠাকুরাণীরই বোধন গেয়েছেন—

"যয়া ত্বয়া জগৎস্রষ্টা জগৎপাতাঽত্তি যো জগৎ।
সোঽপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্ত্বা স্তোতুমিহেশ্বরঃ॥"

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তাকেই যখন নিদ্রাভিভূত করেছ তুমি, তখন তোমার মহিমার কথা বলবে কে? মহাদেবি! "প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু"—জগৎস্বামীকে অবিলম্বে প্রবোধিত কর তুমি।

পদকর্তা মহাজনরাও তাই রাধারাণীকেই জাগাচ্ছেন। রজনী প্রভাত-কল্পা,—রাত্রির আঁধার যেন অরুণ-কিরণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কেমন লাগছে দেখতে? ঠিক যেন নাগরীর নীলাঞ্চলে বিরহানলের আঁচ লেগেছে।

আমাদের অনুমান রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত মহাপ্রভু ওই 'রাই জাগ রাই জাগ' আলাপেই বাহ্য ফিরে পেয়েছিলেন। বিরহের মাধুর্যাস্বাদ করতেই সে-বার আসা। বিরহানলের আঁচ নিয়েই নবদ্বীপে সেদিন চোখ মেলে চাইলেন তিনি—ছুটে গেল মহারাসের ঘোর।

বিহগের কল-কাকলীতে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ সূচনা হচ্ছে। রসপিপাসু সখীরা কিন্তু তখনই আলাদা করতে পারছেন না দুজনকে। শেষবারের মত একবার জালরন্ধ্রে নয়ন দিয়ে দেখে নিচ্ছেন মহদন্তঃপুরের সামরস্য। অদ্বয়তত্ত্বকে মরমীয়ারা কি মধুর ভাবেই না এঁকেছেন—

"দেখ গোরী শুতল শ্যাম-কোর।
লাগল নীলরতনে কিয়ে কাঞ্চন
কুবলয় চম্পক জোর॥"

পরঃকৃষ্ণ নীলিমার বুকে শুদ্ধসত্ত্বের আভাস খেলছে—দ্বিদলচণক পুরুষ-প্রকৃতি কিংবা চিন্তামণিগৃহে মায়াচ্ছাদিত পরমাত্মা।

"ঘন সঞে দামিনী দুকূলে দুকূল
তুহুঁ জনু এক পটবাস।
চরণ বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ
মধুকর গোবিন্দদাস॥"

কে বলবে কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তনে এই মহাভাবসম্মিলনের পদ শুনেই আমাদের ঠাকুরের সামনেও অপ্রাকৃত নিত্যলোকের দুয়ার খুলে গিয়েছিল কি-না? অন্ততঃ আর একজন শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীকে জানি অদ্বয়-তত্ত্বকেই যিনি ভাবনেত্রে দর্শন করে সমাধিসুখ আস্বাদ করতেন মুহুর্মুহু! বিল্বমঙ্গলের কথাই বলছি—কর্ণামৃতে একটি শ্লোক আছে—

"তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।
রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে॥"

প্রথম কথাটি লক্ষ্যণীয় 'তেজসে নমোঽস্তু'—নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিই উদ্দিষ্ট এখানে। পরক্ষণেই ব্রহ্মবস্তুকে সবিশেষরূপে দর্শন, সাকারে সগুণে ফুটে উঠলেন নিরাকার—"(যেন) হিরণ কিরণ আধ বরণ আধ নীলমণি জ্যোতি। আধ গলে বনমালা বিরাজিত আধ গলে গজমোতি॥" আবার এর পরের শ্লোকেই লীলাশুক এই যুগলকিশোরকে উদ্দেশ করে বলছেন "ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ"—বিশ্বব্যাপ্ত মহাজ্যোতিকে প্রণাম। 'লীলা থেকে নিত্য আবার নিত্য থেকে লীলা'—এটি পরমহংসদেরই আস্বাদনের বস্তু। তাই বলছি কুঞ্জভঙ্গ কীর্ত্তনে যুগলরূপের মাধুরীবর্ণন শুনতে শুনতেই হয় তো আমাদের ঠাকুর তলিয়ে গিয়েছিলেন ব্রহ্মপারাবারে।

২৯ সালের পৌষে ভাওয়ালে ৮ম বার্ষিক ভক্ত-সম্মিলনী। নানা কারণেই ৮ম বার্ষিক ভাওয়াল সম্মিলনী সারস্বত মঠের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। একটা কারণ হল আর কখনও কোন সম্মিলনীতেই এমন আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়নি। ৮ম বার্ষিক ভক্ত-সম্মিলনীর যে ফটোখানি আছে তার মধ্যে ঠাকুরের আনন্দময় মূর্ত্তিই এর মস্তবড় প্রমাণ। তাঁর এমন হাসিভরা বালকের মত মুখভাব অন্য কোন ফটোতে দেখিনি। সেবার তিনি গিরিকুটিরে লিখেছিলেন—"ঢাকা আশ্রমে মহাসমারোহে ভক্ত-সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। বেশ আনন্দ হইয়াছে। নানা দেশের বহু ভক্ত সমবেত হইয়াছিল। উৎসবের দিনও ৪।৫শত লোক সমাগত হইয়াছিল। কোন আশ্রমেই কখনও এরূপ আনন্দ হয় নাই। সাক্ষাতে সব বলিব।" এ চিঠিখানার তারিখ ১৭ই পৌষ। ওতেই রয়েছে ২৩শে পৌষ রবিবার ঠাকুর পুরী পৌছাবেন।

এবার বিহারীদা সেবক হিসাবে হরিদাসদার সঙ্গী হয়ে পুরী এসেছিলেন। তিনি আসার কিছুদিন পরেই প্রজ্ঞানন্দ মহারাজও * সেবক হয়ে গিরিকুটিরে আসেন। অন্য কাজ থেকে ছুটি দিয়ে ঠাকুর তখন বিহারীদাকে দিলেন বিমলা-মাকে শিক্ষাদানের ভার। মাঘের শেষে ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিহারীদা নবদ্বীপ যাত্রা করেন। যাওয়ার সময় বিমলা-মাকে তাঁর সঙ্গে ঠাকুর পাঠিয়ে দিলেন। চৈত্র মাসে পুরী ছেড়ে বেশ কিছুদিনের মত বাংলা ও আসামে থাকতে হবে

* ১৩২৮ সালে মঠে যাওয়ার পর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যে দীক্ষা নিয়ে ঠাকুরের নির্দেশেই প্রজ্ঞানন্দজী তীর্থভ্রমণে যান। তাঁর মঠে প্রথম যোগদানের ঘটনা পরে মঠ-প্রসঙ্গে বিবৃত করেছি। ১৩২৯ সালের মাঘে পুরীতে এসে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে তিনি সে-বারই প্রথম ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করেন। শ্রুতি-স্মৃতিতে '২৯ সাল স্থলে ভুলে '২৮ সাল লেখা আছে। কিন্তু ২৮ সালের ফাল্গুনে ঠাকুর পুরীতে ছিলেন না, মঠেই ছিলেন।



ভক্ত-সম্মিলনী — ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর — ৮ম অধিবেশন

ঠাকুরকে। কাজেই স্থর-মাকে ময়মনসিংহে সবজজ অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে রেখে যাবেন। আর বিমলা-মা থাকবেন হাওড়ায় ফণীবাবুর বাসায়। ওখান থেকে তাঁর স্বামী তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যাবেন। গিরিকুটির আপাতত ছেড়ে দেওয়া হবে এইরকম স্থির হল।

এইখানে বিমলা-মার কথা কিছুটা বললে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৩২০ সালে মেদিনীপুর বর্ধমান অঞ্চলে প্রবল বন্যা হয়। তখন মঠ হতে স্বামী স্বরূপানন্দ যোগানন্দ প্রমুখ কয়েকজন সন্ন্যাসী আর্তসেবায় ব্রতী হয়ে কাঁথি কেন্দ্রে কাজ করতে থাকেন। ওখানে বন্যায় সর্বহারা অসংখ্য দুঃস্থ নারীপুরুষের মধ্যে করুণাবালা দাসী নামে জানুবসান গ্রামের এক দরিদ্রা রমণীও ছিলেন। স্বামী কার্ত্তিক সাউত আগেই মারা গেছেন। চারটি সন্তানকে করুণা-মা বহুকষ্টে মানুষ করছিলেন এমন সময় এল প্রলয়ঙ্করী বন্যা। রূপনারায়ণ অজয় ও দামোদরের মিলিত আক্রমণে মেদিনীপুর সমুদ্রের আকার ধারণ করে সেবার। সন্তানকটিকে নিয়ে করুণা-মা ঘরের মাচায় উঠে বসেছিলেন—বন্যাস্রোতে ঘর ভেঙে পড়ে ঘরের চাল শুদ্ধ ভেসে গেল অকূল সমুদ্রে। সে সময় করুণা-মার একটি মেয়ে জলে পড়ে যায়। পরে তিনটি ছেলে মেয়ে সহ করুণা-মাকে সেবা-ব্রতীদের কোনও দল আসন্ন সলিল-সমাধি হতে রক্ষা করে। কাঁথি কেন্দ্রে করুণা-মা সারস্বত মঠের সন্ন্যাসীদের দেখা পান। তাঁদের অক্লান্ত সেবা, সস্নেহ ব্যবহার দেখে আর সন্ধ্যায় সম্মিলিত ভজন শুনে সদ্য শোকাতুরা এই দুর্ভাগিণী অত্যন্ত আকৃষ্ট হলেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা বুঝে সন্ন্যাসীরা ঠাকুর মহারাজকে জানালে তিনি সাগ্রহে অনাথা করুণা-মাকে সপুত্রকন্যা মঠে স্থান দিতে সম্মত হন।*

* দামোদর বন্যায় সেবা-কার্য ও বিমলা-মার ইতিবৃত্ত সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আর্যদর্পণ দেখতে পারেন।

অনলস শ্রমে গুরুপাটে শ্রীগুরুনির্দ্দিষ্ট কর্মে আত্মনিয়োগ করে প্রাচীন বয়সে করুণা-মা আসাম মঠেই লোকান্তরিতা হন। তাঁর দুই ছেলে, কেনারাম এবং ঈশ্বরদাও মঠের অক্লান্তকর্মা সেবক ছিলেন। আর, একমাত্র মেয়েটিই আমাদের বিমলা-মা।

মঠে যখন এসেছিলেন, বিমলা-মায়ের বয়স তখন তিন বছরের কম হবে ত বেশি নয়। ছোট্ট এই খুকীটি ছিল সারস্বত মঠের বালক-বিভাগে সর্বকনিষ্ঠা সভ্যা। পরম সুকৃতিবশে প্রথম সাক্ষাতেই বিমলা-মা শ্রীশ্রী-ঠাকুরের অপার বাৎসল্যের ভাগী হয়েছিলেন। বিমলা-মার নিজ মুখে তাঁর শৈশবচাপল্য ও ঠাকুর মহারাজের সঙ্গে তাঁর সহজ সম্বন্ধের কথা অনেকেই হয়তো শুনেছেন। প্রাণচঞ্চলা ওই মেয়েটিকে যত শাসন করতেন ঠাকুর ঠিক ততখানিই ভালবাসতেন। বিমলাকে তিনি আদর করে ডাকতেন 'বিমু'। 'বিমু' না বলে যখন ডাকতেন 'বিমলা'—বিমলার প্রাণ উড়ে যেত ভয়ে, নিশ্চয় রেগেছেন ঠাকুর। উত্তম-মধ্যম কিছু হবে।

সে সময় মঠে বিকাল বেলায় ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা আসর বসাতেন ঠাকুর। সেখানে ঠাকুরও ওই শিশু ভোলানাথদের একজন। তাঁর নির্দ্দেশে বাচ্চারা সেখানে প্রাণখুলে নাচত গাইত গল্প বলত হাসত খেলত; তাদের মাঝখানে বসে তুড়ি দিয়ে ঠাকুর গান গাইছেন এ-দৃশ্যও বিরল ছিল না। একটা গান বেঁধেছিলেন নিজে—শুনেছি ওই শিশুমঙ্গল আসরের প্রিয় গান সেটি—

হরি বলে আমার বিমু নাচে।
নাচে রে নরসিং আমার সঙ্গে ঈশ্বরচন্দে।
মুতে মুতে ঘর ভিজায় মরি তাহার গন্ধে॥"

তাঁর মুখে এগান শুনে হা-হা হি-হি হু-হু করে হেসে গড়াগড়ি দিত ছোটরা। যাদের নাম নিয়ে গান তাদেরও পেটে খিল ধরে যেত

হাসতে হাসতে এবং হাসির চোটে কারও উপরোক্ত অকর্মটি করে ফেলে ঘর ভেজানও অসম্ভব থাকত না এক-একদিন।

বিমলা-মায়ের আরেকটি সৎ কীর্তির কথা বলি। দুরন্ত ওই মেয়ে স্বভাবদোষে প্রায়ই ঠাকুরের কাছে অপরাধ করতেন—মার-ধোরও খেতেন। একদিন অপরাধ গুরুতর হওয়ায় তাঁর খাওয়া বন্ধ হয়েছে। খিদের জ্বালায় মেয়েটা শুকনো মুখে ঘুর্ ঘুর্ করছে দেখে বড়রা কেউ একজন শিখিয়ে দেন 'ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চেয়ে আয়। তাহলেই খেতে পাবি।' শিশুর জিদ ও অভিমান কম থাকে না। একে পেটে খিদের জ্বালা তায় আবার ক্ষমা চাইতে হবে শুনে দুচোখে ধারা বয় 'বিমু'র। কিন্তু খিদের কষ্টও কম নয়। অগত্যা ফোঁপাতে ফোঁপাতে গিয়ে দাঁড়ালেন ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তখন মঠের শয়ন-মন্দিরে টেবিলে বসে কি সব লেখাপড়া করছেন। ফোঁসফোঁসানি শুনে আড়চোখে ব্যক্তিটিকে দেখে আরও ঝুঁকে পড়েন কাগজ-পত্রের উপর। ওমা! অপরাধী কথা আর কয় না! কেবল ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। একটু দয়া হল। বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে ঠাকুর নিজেই মুখ খোলেন 'কি? আবার কি করতে এসেছ আমার কাছে?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে 'বিমু' বলে 'তোমায় ক্ষমা করতে এসেছি।' 'ও, তাহলে ক্ষমা কর' বলে ঠাকুর তাড়াতাড়ি হুঁকোর নল মুখে গোঁজেন। রাগ পড়ে তাঁর তখন বেজায় হাসি পেয়ে গেছে।

'২৮ সালে ঠাকুর যখন পুরী যান তখন নিজে একদিন এই গল্পটি করতে গিয়ে তিনি হেসে আকুল। সপরিবার অশ্বিনীবাবু ও স্বরূপানন্দজী ছিলেন শ্রোতা। তাঁদের তো হাসির চোটে নাড়ি-ভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় আর কি!

১৩২৭ সালের ২৪শে আষাঢ় মঠের একটি নবাগত সেবকের সঙ্গে কিঞ্চিদধিক নবমবর্ষীয়া বিমলার বিবাহ দিয়ে ঠাকুর সম্ভবত কন্যাদায় হতে

উদ্ধার হলেন। একবার শ্বশুরালয়ে ঘুরে এসে বিমলা-মা মঠেই ছিলেন। '২৯ সালে পুরীবাসের সংকল্প নিয়ে মঠ ছাড়ার সময় ঠাকুর তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যান সেকথা আগেই হয়ে গেছে। '২৯ সালের মাঘে আবার বিমলা-মায়ের শ্বশুরবাড়ী যাবার ব্যবস্থা হল। মেয়ে বড় হয়ে গেছে, আর তাকে পিত্রালয়ে রাখা ভাল দেখায় না।

বিহারীদার কাছেই বিমলা-মায়ের আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদ্যাশিক্ষার ইতি। বিদেশে গিয়ে যাতে চিঠিপত্র অন্তত ভালভাবে লিখতে পারে—নিজের সংবাদটা দেওয়ার জন্য পরের মুখ চাইতে না হয়—এই ভেবেই বোধহয় শেষবারের মত শর্মামশাইয়ের মত বিচক্ষণ একটি পণ্ডিতকে ঠাকুর ভার দিয়েছিলেন বিমলা-মার লেখাপড়াটা একটু ঝালিয়ে দিতে। ঠাকুরের সদিচ্ছা ব্যর্থ হয়নি—পড়াশোনায় অবিরাম ফাঁকি দিলেও (এ সব গল্প বিমলা-মার নিজমুখে শোনাই ভাল) তাঁর বিমুর হস্তাক্ষর অনেক শিক্ষিতা মেয়ের চেয়েও ভাল হয়েছিল—চিঠিপত্রে বর্ণাশুদ্ধিও হত যৎসামান্য। মোটকথা, সালঙ্কারা কন্যাকে সম্প্রদান করা তো হয়েইছে তারপর যথাসাধ্য মেয়েটিকে শিখিয়ে পড়িয়ে উপযুক্ত করে এবার ঘর-বসতের উপযোগী দ্রব্যসম্ভার দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হবে।

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হল, দিন ক্ষণ সব ঠিক। সকাল থেকে স্বর-মা সেদিন লুকিয়ে চোখ মুছছেন, ঠাকুর অন্য দিনের চেয়ে বিমনা, গম্ভীর। বিমলা-মারও কষ্ট হচ্ছে বটে তবে তার গভীরতা নাই কিছু। তখনও নিতান্ত বালিকা তিনি। বিয়ের পর মাস তিনেক বুঝি ছিলেন ঠাকুরকে ছেড়ে, তার পর থেকে ঠাকুরের কাছেই রয়েছেন। এ-ও তাই, সাময়িক ছাড়াছাড়ি মাত্র। আবার আসা যাবে ঠাকুরের কাছে, মাঝখান থেকে এই বাক্স-পেটরা এই সব শাড়ি-জামা নতুন জিনিস সব আমার—বালিকার মনে এ বড় কম আনন্দ নয়, বিশেষত আবাল্য

আশ্রমবাসিনী রিক্তার পক্ষে। 'দারিদ পাওল যেন ঘট ভরি হেম'—একটা প্রচলিত উপমা তো! বিমলা-মা বলেন 'আমারও তো তখন তাই রে। একখানার বেশি দুখানা ভাল কাপড় পরিনি কখনও। সেই আমার এত ঐশ্বর্য! আনন্দ হবে না কেন বল্‌?' ভাব-ভক্তির বাড়াবাড়ি কোনদিন দেখিনি বিমলা-মায়ের মধ্যে। ঠিক যা হয়েছিল মনের ভাবটি—অকপটে তা তিনি স্বীকার করেন। ঠাকুরের কাছেও নিশ্চয়ই কখনও কপটতা করেননি। সরল অনাবৃত ছিল তাঁর মনটি। ভাবগ্রাহী তাই ভালবাসতেন ওই সরলাকে।

যাই হ'ক, ক্রমে যাওয়ার সময় হয়ে এল—'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি'। মালপত্র সব তোলা হয়েছে ঘোড়ার গাড়িতে। প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ কি হরিদাসদা যেই হ'ক একজন স্টেশন অবধি সঙ্গে যাচ্ছেন—বিমলা ঠিকঠাক ট্রেনে উঠল কি-না তদারক করে ঠাকুরকে সংবাদ এনে দেবেন। বিমলা-মা সেজে-গুজে ঘোমটা দিয়ে ছোট্ট বউটি হয়ে উঠে বসেছেন ঘোড়ার গাড়ির ভিতরে—ঠাকুরকে প্রণাম করা-টরা সারা। গাড়ি ছাড়বে এবার—কোচবাক্সে উঠে বসে গাড়োয়ান ঘোড়ার রাস তুলে নেয় হাতে। ঠাকুর বেরিয়ে এসেছেন খড়মপায়ে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাক্স-বিছানা জিনিসপত্র তুলিয়েছেন দেখে-শুনে, খোঁজ নিয়েছেন টাকা-পয়সা ঠিকমত সব দেওয়া হয়েছে কি-না বিহারীর হাতে। গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বার করে রয়েছেন বিমলা-মা। গাড়োয়ান 'রাস' তুলে নিতেই আরও এগিয়ে এলেন ঠাকুর। গাড়ির পা-দানীতে একটা পা রেখে দরজার দুই দিকে দুই হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে বললেন 'সাবধানে যেও সব, পৌছা সংবাদ দিও।' নির্বাক বিস্ময়ে বিমলা-মা চেয়ে দেখেন লাল হয়ে উঠেছে ঠাকুরের মুখখানা, চোখ ফেটে জল পড়ে আর কি—রুদ্ধ আবেগে ভার হয়ে উঠেছে

গলা। 'বিমু, এতদিনে তাহলে সত্যিই ছেড়ে চললি আমায়?' বলেই পা নামিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঠাকুর পিছন ফিরলেন। এতক্ষণ জল আসেনি চোখে, এবার কেঁদে ফেললেন বিমলা-মা, হু হু করে জল পড়তে লাগল চোখে। তার কতটা বিচ্ছেদ-বেদনা আর কতটা ঠাকুরের ওই মুখের ভাব দেখে এবং কথা ক'টি শুনে—তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন না। ছড়্ ছড়্ ঘড়্ ঘড়্ করে গাড়ি চলে গেল তাঁকে নিয়ে। চোখের জল মুছতে মুছতে সুর-মা দেখলেন ঠাকুরেরও গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে। দ্রুত পায়ে এসে চৌকীতে বসে পড়ে ফেলে-যাওয়া হুঁকার নলটা হাতে তুলে নিলেন, কোঁচার খুঁটে মুছে ফেললেন চোখ-মুখ। সন্ন্যাসীর এ-মমতা কেন? নির্মোহ নিরঞ্জনের এ-মায়া?

"মরুভূমিসম সন্ন্যাসীর হৃদয়ও তোদের ভালবাসায় দ্রব হইয়া যাইতেছে। আমি মায়া-পরিশূন্য সন্ন্যাসী হইয়াও পুনরায় তোদের কোমল-কঠোর বন্ধনে দিন-দিন জড়াইয়া যাইতেছি। ইচ্ছা করিয়াও সে-বন্ধন ঢিল করিতে পারিতেছি না।" চিঠি ১।৪৬

কেন এসব? ভাবতে গিয়ে মনে হয় ঠাকুরের ওই চোখের জল ও ব্যাকুলতা এ কি শুধুই মোহ আর মায়া? বিমলা-মাকে যে কথা ক'টি বলেছিলেন তার পিছনে একটা সর্বনাশা বিপদের সঙ্কেত ছিল। ঠাকুরকে ভুলে সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়লি কি তুই? এবার কি আমায় ছেড়ে জগৎকে আঁকড়ে ধরবি তাহলে? পরমাত্মীয়ের মত জলভরা চোখে এই কথাটাই খেয়াল করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ঠাকুর। তাঁর ব্যথা অজ্ঞানান্ধ জীবের জন্য জগৎপিতার ব্যথা—বুদ্ধের করুণা।

সেদিন কথাগুলির অর্থ না বুঝলেও তাঁর বেদনার্ত মুখচ্ছবি বিমলা-মা কোনদিন ভোলেননি, ভোলেননি তাঁর ওই সকাতর অভিযোগ। জ্ঞান-বুদ্ধি পাকবার পর মনে মনে কেঁদে হাজারোবার প্রতিবাদ করেছেন

ও-কথার 'তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব ঠাকুর? কে আছে আমার? না না, কখনও ছেড়ে যাব না তোমায়—যেতে পারি না।'

১৩২৯ সালের ১৬ই চৈত্র গিরিকুটির ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর সেবকদুটি ও স্নুর-মাকে নিয়ে বাংলায় চলে এলেন। ময়মনসিংহে তাঁর প্রিয় শিষ্য অশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় তখন যে-বাড়িতে থাকতেন তার নাম ছিল সত্যধাম। ওই ঠিকানায় লেখা দুখানা চিঠি থেকে জানা যায় এ-যাত্রা ঠাকুর ভাওয়াল ঢাকা বালিয়াটি মাদারিপুর ফরিদপুর ইত্যাদি নানা জায়গায় ভ্রমণ করেন। কয়েক দিন ময়মনসিংহেও ছিলেন।

১৩৩০ সাল—১২ই আশ্বিন আবার ঠাকুর পুরী ফিরে এলেন, সঙ্গে সেবক ব্রহ্মচারী প্রজ্ঞাচৈতন্য (প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ), ব্রহ্মচারী হরিদাস ও স্নুর-মা। মাস তিনেক ওই ৩নং গিরিকুটিরে বাস করার পর সম্ভবত অগ্রাণের শেষাশেষি শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাস ও স্নুর-মা সহ নবদ্বীপ যাত্রা করলেন *। প্রজ্ঞানন্দ মহারাজকে তিনি নীলাচল কুটির ক্রয় করার ভার দিয়ে গেলেন। এই কয় মাস নানা জায়গায় বাড়ি দেখার পর ঠাকুর ওই বাড়িখানাই পছন্দ করেন। হেমচন্দ্র রায় নামে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন নীলাচল কুটিরের মালিক।

* ঠাকুরের চিঠি দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৮ নং চিঠিখানার তারিখ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আছে। ওই চিঠির তারিখ ৫।৮।৩০। অথচ ঠাকুর লিখছেন "আমি আগামী শুক্রবার ২৮শে এখান হইতে বাংলায় রওনা হইব।" ৫ই অগ্রাণ যদি এক শুক্রবারও হয় তাহলেও আগামী শুক্রবার মাত্র সাতদিন—তারিখটা হবে তাহলে ১২ই। ২৮শে হয় কি করে? সন্দেহ হচ্ছে চিঠির তারিখে মুদ্রাকর প্রমাদ আছে। সম্ভবত তারিখটা হবে ২৫।৮।৩০। ৫-এর আগে ২ সংখ্যাটি পড়ে গেছে কি?

প্রজ্ঞানন্দজী এঁর কাছ থেকেই ছয় হাজার টাকায় ঠাকুর মহারাজের নামে নীলাচল কুটির কিনে নিয়েছিলেন।

'৩০ সালের ৫ই অগ্রাণ পুরী থেকে লেখা যে-চিঠিখানা পড়ে আমরা জানতে পারি ঠাকুর ২৮শে অগ্রাণ বাংলায় রওনা হয়েছিলেন সেই চিঠিতেই স্বরূপানন্দজীর মরণান্তিক পীড়ার উল্লেখ রয়েছে। ১২ই মাঘ ও ২০শে মাঘ (যথাক্রমে নং ২।৬৯ ও ২।৯৪) মঠ থেকে লেখা দুখানা চিঠিতেও ওই এক প্রসঙ্গ। এই বছরেই ২৭শে ফাল্গুন স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজ ইহধাম ত্যাগ করলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের সঙ্গে-সঙ্গে সারস্বত মঠের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল বলেই মনে করি। ঠাকুর মহারাজের অন্ত্যলীলায় প্রবেশের স্থচনা হল।

১২ই মাঘের চিঠিখানায় ঠাকুর মঠ থেকে লিখেছিলেন "শ্রীমান্ স্বরূপানন্দের অভাবে আমাদের যে ক্ষতি হইবে তাহা আর পূরণ হইবার উপায় নাই।"

১৩৩১ সাল—১লা বৈশাখ নীলাচল কুটিরে 'গৃহপ্রবেশ' করলেন ঠাকুর। আর, ২রা বৈশাখ শক্তিদা এসে তাঁর কাছে গৃহত্যাগের অনুমতি চাইলেন। তাঁর ডাক্তারী পড়া তখনও শেষ হয়নি। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল স্বরূপানন্দজীর প্রয়াণে সারস্বত মঠাশ্রমের নিজস্ব ডাক্তারের শূন্য পদটি এই তরুণ ব্রহ্মচারী পূরণ করবে। একথা শুনেও শক্তিদা নিরস্ত হতে পারলেন না। তার কারণ অভিভাবকরা এবার তাঁকে পাকাপাকি রকম সংসারী করতে বদ্ধপরিকর। ওদিকে জন্মান্তরীণ সৎ সংস্কারে শক্তিদার মনেও তখন ত্যাগ-বৈরাগ্যের তীব্রতা, চিত্তে পরিপূর্ণ দিব্যভাবের দ্যোতনা। গুরু-শিষ্যের এ-সময়ের আলাপও

উপদেশামৃতে ধরা আছে। অনুসন্ধিৎসু পড়ে রস পাবেন নিশ্চয়ই। '৩১ সালের বৈশাখেই ঠাকুরের অনুমতি আদায় করে সুচির-কাঙ্ক্ষিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম অবলম্বন করলেন শক্তিদা। সারস্বত সঙ্ঘে কর্মবীর শক্তি-চৈতন্য ব্রহ্মচারীর আবির্ভাব ঘটল। ঠাকুরের শেষ জীবনে যাঁরা তাঁর মঠাশ্রমের বহু দায় মাথায় তুলে নিয়ে বিশ্রামলিপ্সু সদ্‌গুরু নিগমানন্দকে স্ব-ভাবে অবস্থানের সহায়তা করেছেন—শক্তিদা তাঁদের অন্যতম।

ঠাকুরের নির্দেশে তিনি প্রথম বগুড়া আশ্রমেরই অন্তেবাসী হন। অভিভাবকরা সন্ধানে-সন্ধানে ঠিক সেখানে হাজির হবেন অনুমান করে কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রজ্ঞানন্দজীকে দিয়ে বগুড়ার গৃহী গুরুভাইদের কারও কাছে জানালেন 'শক্তির এখন বৈরাগ্যের ভাব খুবই প্রবল। সুতরাং অভিভাবকরা কেউ এলে সে যেন নিজে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। পরে হয় তো ত্যাগ-বৈরাগ্যের এ-তীব্রতা থাকবে না। তখন আর পারবে না।' তাই-ই হল—এবার পিতৃদেবকে শক্তিদা নির্দ্বিধায় ফিরিয়ে দিলেন।

শক্তিদা বলেন 'শাস্ত্রের অনুশাসন, শিষ্য নির্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করবে। আমি ঠাকুরের সব আদেশ সব সময় পালন করতে পারিনি। কিন্তু ভাগ্যবশে আমার ঠাকুর কোন সময়ে আমার কথা ফেরাতেন না।'

'৩১ সালে বিদায় নেবার দিন তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন 'গতবার মঠে আপনি আমায় বললেন "যাও একবার ঘুরে এস।" কিন্তু পরে ওঁরা আমায় ছাড়লেন না। এবার যদি সন্ধান নিতে আসেন আত্মীয়রা, আমি কোথায় আছি আপনি ওঁদের জানাবেন না।' পরে তাঁরা অবশ্য ঠিক খুঁজে বার করলেন শক্তিদা কোন্ আশ্রমে আছেন—কিন্তু ঠাকুর তাঁর কথা রেখেছিলেন। ঠাকুরের কাছে খোঁজ নিতে যেতে তিনি বলেছিলেন, "হাঁ সে আমার আশ্রমেই আছে। কিন্তু কোথায় কোন্ আশ্রমে তা আমি বলব না।"

'৩৮ সালে যথারীতি সম্মিলনীর দিন ধার্য হয় ১১, ১২, ১৩ পৌষ এবং আশ্বিনের আর্যদর্পণে বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়। শক্তিদা ঠাকুরকে লিখলেন, "ঠাকুর, ১০, ১১, ১২ দিন স্থির হলে উইক এণ্ড রিটার্নের সুবিধা মিলত।" অমনি শক্তিদার আবেদন মঞ্জুর হয়ে তারিখ বদল হল।

'৪০ সালে জোড়পাকড়ীতে ভক্ত-সম্মিলনী। প্রজ্ঞানন্দজী লিখলেন 'সব ব্যবস্থা করার জন্য আমি দু'মাস আগেই যাচ্ছি।' তাঁর অগ্নিশর্মা মেজাজকে শক্তিদা বড় ভয় করতেন। জলপাইগুড়ি আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় তিনি যে-কাণ্ড বাধিয়েছিলেন তা শক্তিদার জানা। কোনও বিশেষ কারণে আশ্রমের জমি-জমা তখনও ঠাকুরের নামে হয়নি, উদ্যোক্তা গুরুচরণ দেব রায়কতের নামেই আছে। বেঁকে বসলেন প্রজ্ঞানন্দজী, না, ঠাকুরের নামে আগে জমির মালিকানা হ'ক তবে আশ্রম-প্রতিষ্ঠা। ঠাকুর বললেন 'দেখ আশ্রম হওয়াই বড় কথা। থাকৃনা জমি ওর নামে। ওর প্রজা হয়ে থাকতেও আমার আপত্তি নাই।' প্রজ্ঞানন্দজী ঘোষণা করলেন, 'শ্রীনিগমানন্দ সরস্বতী গুরুচরণের প্রজা হয়ে থাকতে পারেন কিন্তু প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী তা পারবে না।' এই মানুষ দু'মাস আগে এলেই হয়েছে আর কি! প্রতি পদে খিটিমিটি বাধবে না? তাড়াতাড়ি মনের কথা ঠাকুরকে খোলাখুলি জানিয়ে শক্তিদা লেখেন 'ঠাকুর, তুমি প্রজ্ঞানন্দজীকে আটকাও।' অবিলম্বে উত্তর এল 'আটকালাম।'

আবার '৪১ সালের ঘটনা। মঠাধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দজীর সঙ্গে শক্তিদার সম্পর্কটি তখনও অম্ল-মধুর। এক বনে যেমন দুই সিংহ থাকতে পারে না, তেমনি কর্মদক্ষ শক্তিদা ও অক্লান্ত কর্মী এবং মর্যাদা-সচেতন প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের সহাবস্থান প্রায় দুরূহ হয়ে উঠেছিল। এমন সময় কোনও প্রয়োজনে মঠাধ্যক্ষই বগুড়া হতে শক্তিদাকে মঠে আসতে

লিখলেন। শক্তিদা ঠাকুরকে জানালেন 'আমি মঠে যাচ্ছি। কিন্তু দেখ, প্রজ্ঞানন্দজী যেন আমাকে মঠে না আটকান।'

সেবার মঠে যাওয়ার পর কিন্তু অধ্যক্ষ মহারাজ শক্তিদাকে যথোচিত সমাদরেই গ্রহণ করলেন। দু'জনের মনান্তরও মিটে গেল। চিরদিনই অন্তেবাসীদের পারস্পরিক মতদ্বৈধ ঠাকুর মহারাজের বড় কষ্টের কারণ ছিল। তিনি চাইতেন 'ভাই ভাই এক ঠাঁই। ভেদ নাই ভেদ নাই॥' এক্ষেত্রে উভয়ের সম্প্রীতি তাঁর খুব প্রীতিকর হবে জেনে একই খামে শক্তিদা ও প্রজ্ঞানন্দজী দু'জনেই ঠাকুরকে লিখলেন 'আর তাঁদের মনান্তর নাই, সৌহার্দ জন্মেছে।' পুরী হতে চিঠি এল—'হরি-হরের মিলন সংবাদে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।' সেইসঙ্গে মঠাধ্যক্ষকে লিখলেন—'কিন্তু শক্তিকে বেশীদিন মঠে আটকাইও না, বগুড়ায় উহার অনেক কাজ।' সানন্দ বিস্ময়ে শক্তিদা দেখলেন এবারও তাঁর কথা ঠাকুর ঠেলেননি।

বক্তব্যের উপসংহারে শক্তিদা মন্তব্য করলেন, 'আমি ঠাকুরকে কোনও দিন ভয় করিনি। কিন্তু ভয় করি তাঁর চেলাদের। তখনও করতাম, আজও করি। আমার ঠাকুর আমার কাছে চিরদিনই দক্ষিণা-মূর্তি।'

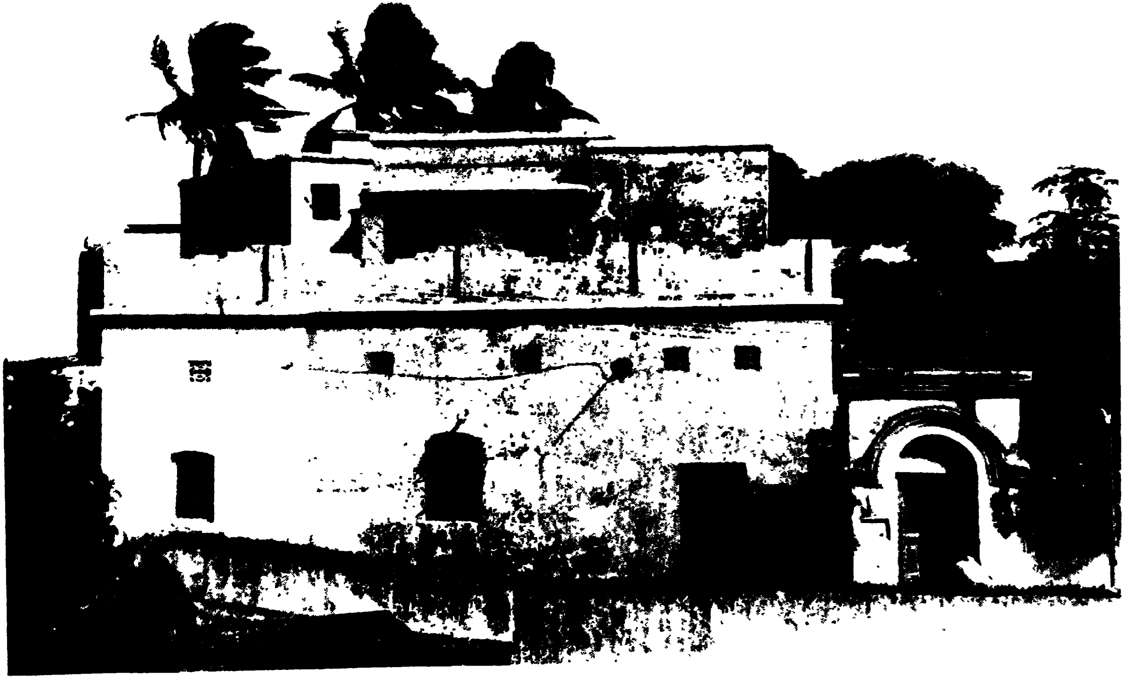
হ্যাঁ, ঠাকুরের এ-ও একটা পরিচয় বটে।

৩রা বৈশাখ নীলাচল কুটির থেকে লেখা একখানা চিঠিতে পাচ্ছি "বাড়িটা বেশ মনোমত হইয়াছে। তবে এখনও প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া অভাবাদি দূর করিয়া লইতে হইবে। বেশ আনন্দেই আছি।" (চিঠি নং ২।৭০)

সাধারণ বিচারে, বাড়ি হিসাবে নীলাচল কুটির এমন কিছু আহা-মরি গোছের নয়। একে তো গঠনসৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায় বাড়িখানায় তার কোনও বালাই নাই। বাইরে থেকে দেখলে ও-বাড়ির সৌন্দর্য বলে কিছু

চোখে পড়ে না। ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে একমাত্র পূর্বদিকের ঘরখানা ছাড়া অন্য ঘরগুলি দিনের বেলাতেও অন্ধকার। ঘর তোলার ছিরি-ছাঁদ নাই, অনর্থক জায়গা নষ্ট হয়েছে এখানে-ওখানে। অতখানি জায়গা কেবল দুপাশে উঠান আর লম্বা বারান্দা রেখে নষ্ট করা হয়েছে—বাসযোগ্য ঘর মাত্র তিনখানি। উত্তর দক্ষিণে খোলা বারান্দা থাকায় বর্ষার ছাট এসে ঘর ভিজিয়ে দেয়; রান্নাঘর এমন জায়গায় যে দক্ষিণা হাওয়ায় সব ধোঁয়া এসে ঘরে ঢোকে। ভালর মধ্যে এইটুকু—বাড়িটার দক্ষিণ খোলা। ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম ও-বাড়ি যাঁরা দেখতে এসেছিলেন কেউ-ই পছন্দ করেননি বাড়িখানা। কিন্তু ঠাকুরের মনে ধরে গেল নীলাচল কুটির। তার প্রধান কারণ উপরের ওই ঘরখানা। দোতলায় বেশি ঘর থাকাটা তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। খোলা ছাদের উপর ওই যে শুধু একখানি ঘর ওইটাই তাঁর পছন্দসই হল। নীচে সেবকরা থাকবে, আর তিনি বেশ একা থাকতে পারবেন উপরে—কারও সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না, নীচের কোন কাজ কি কথা চোখে পড়বে না, কানে ঢুকবে না। ঘরখানার অবস্থিতিও চমৎকার। দক্ষিণ একেবারে খোলা, পূবের জানালা দিয়ে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র চোখে পড়ে, পশ্চিমের জানালায় তাকালে জগন্নাথ-দেউল। ছাদে গেলে তো কথাই নাই।

কিন্তু নীলাচল কুটিরের পেছনে যে-টাকা তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছে সেই টাকায় তখনকার দিনে ছোটখাট একখানা একতলা বাড়ি তৈয়ারী করে দোতলায় ওই রকম একটি ঘর করে নিলেই পারতেন! দুই হাজার কেন, যতদূর জানি বাড়ির পিছনে বার বৎসরে ঠাকুর প্রায় ৬।৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছেন, তবে নীলাচল কুটির বাসযোগ্য হয়ে ভদ্র আকার নিয়েছে।



নীলাচল কুটীর (দোতলা ও সম্মুখের কিছু অংশ)

তাই ভাবি কেবল বাড়িখানা নয়, ওই জায়গাটি ওই রাস্তা ওখানকার পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে এমন কোন আকর্ষণ ছিল নীলাচল কুটিরের যেজন্য শেষ বারটি বৎসর তিনি ওইখানেই আসন নিয়েছিলেন।

"এ-পথ গিয়েছে গোবর্ধনের পুণ্যায়তন পাশে।
এ-পথে কি গোরা যেতেন নিয়ত মিলিবারে হরিদাসে?
টোটা গোপীনাথে থাকিতেন প্রভু বিরহ ব্যাকুল হিয়া—
ভক্ত মিলিত দেবতার সাথে এ-পথ বাহিয়া গিয়া?
রূপ-সনাতন প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমেরা আর,
'রায়ে'র সঙ্গে যেত কি এ-পথে নয়নে অশ্রুধার?
কত জোছনায় এ-পথের ধূলা কীর্তনে নামগানে,
শিহরি' উঠেছে ঝাউ মর্মরে কে বলিবে কে বা জানে!"

'নীলাচলের ঠাকুর'

ঠাকুর যখন কিনলেন তখন নীলাচল কুটির কেমন ছিল? বাগানের দিকের ওই উঁচু পাঁচিল ছিল না, কুয়াও নয়। এখন যেখানে বাগান ওটা ছিল জঞ্জাল ছাই আর বালির স্তূপ—হাতখানেক উঁচু একটা দেয়াল দিয়ে বাড়ির সীমাটা শুধু নির্দেশ করা ছিল। সে-দেয়াল ডিঙিয়ে ছাগল গরু কুকুর অহোরাত্র ঘরের ভিতর চলে আসত। ভিতরের পায়খানা (ঠাকুর যেটি ব্যবহার করতেন) ছিল বে-আব্রু, ও রকম দেয়ালঘেরা ছিল না। সুতরাং মেয়েরা কোথায় স্নান করবে শৌচে যাবে তার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। ঘরের মেজেগুলি খোয়া ওঠা, সিমেণ্ট করা নয়। ছাদটি কাঁচা—টালির উপরে কেবল গোবর আর মাটির লেপ দেওয়া। উত্তর ও দক্ষিণে যে চওড়া উঠান তা-ও ছিল এমনি খোয়াঢালা, সিমেণ্ট করা নয়। আর, এখন যেখানে ভোগের ঘর ওইখান দিয়ে ছাতে উঠবার খোলা সিঁড়ি। রোদ বৃষ্টিতে ভিজে পুড়ে ছাতে যেতে হত—রাত-বিরাতে বাইরে বেরিয়ে ওই সিঁড়ি দিয়ে উপরে যাওয়ার বিপদ তো আছেই।

এমার মঠের বাড়ি, নীলাচল কুটির, আনন্দভবন আর কাশিম বাজারের মহারাজার দুটি কাছারি বাড়ি (বড় ও ছোট জ্যোতিনিবাস—বর্তমানে হাসপাতাল) এ রাস্তায় ওই পাঁচখানা বাড়ি ছিল প্রায় এক লাইনে। জ্যোতিনিবাসের পর থেকে গোবর্ধন মঠ পর্যন্ত কেবল ঝাউবন আর ফণীমনসার ঝোপঝাড়—অন্য কোন বাড়িই ছিল না। এখন যেখানে নিগম-স্মৃতিমন্দির—ফণীমনসায় আংশিক দুর্ভেদ্য একটা বড় রকম ঝাউবন ছিল ওটা। নীলাচল কুটিরের গা ঘেঁষেও সারি সারি ঝাউ গাছ ছিল—তার সর্বশেষটি হাসপাতালকর্তৃপক্ষের হাতে কাটা পড়ল এই সেদিন। দিনে রাত্রে শন্ শন্ শন্ শন্—অস্ফুট দীর্ঘশ্বাসের মত মর্মরিত ঝাউবীথির নিস্বন একটা ঐশ্বর্য ছিল এ পথটির। সবকিছুর মত সে-বৈভবও চিরদিনের মত বিদায় নিয়েছে।

এ-পথের শেষ প্রান্ত গিয়ে মিলেছে গৌরবাটসাহির সঙ্গে। সেদিকে যমেশ্বর টোটার পর থেকে জঙ্গল ক্রমে ঘন হয়ে সত্যিকারের বন-বাদাড়ে গিয়ে মিলেছে—যা কিনা দণ্ডকারণ্যের একটা শাখা বললেও চলে। ওই বন থেকে মাঝে মাঝে নেকড়ে বাঘ বেরিয়ে লোকালয়ে এসে ঢুকত। মায়ের চোখে দেখা একটা ঘটনা শুনেছি। সূর্য অস্ত যায়-যায় সেদিন। তখনও আলো আছে কিছুটা। মা ছিলেন ছাদে, এমন সময় অদূরবর্তী ঘাসওয়ালীপাড়া থেকে চিৎকার উঠল 'গধিয়া-রে গধিয়া'। তার পরেই কানেস্তারা পিটানোর শব্দ—কারা যেন কি দেখে সমবেতভাবে তাড়া করেছে আর চেঁচাচ্ছে সমানে। মা কৌতূহলী হয়ে চেয়ে আছেন, গোলমালটা ক্রমে নীলাচল কুটিরের দিকে এগিয়ে আসছে। কানে আসছে গোলমালের সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা তড়্বড়্ করে ছুটে আসছে। দেখতে-না-দেখতে বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল বৃহদাকার একটা জানোয়ার। কটা রং, দেখতে যেন শিয়াল আর কুকুরের সংমিশ্রণে

কোন জীব কিন্তু শিয়াল-কুকুরের চেয়ে বেশ বড়। উপর দিকে একবার চাইল সেটা—পিঙ্গল চোখে অস্ত সূর্যের একটা ছটা এসে লাগতেই টর্চের মত ঝলসে উঠল সে চোখ। এতক্ষণ ছিল কৌতূহল, এবার ওর কুকুরের মত মুখে সূচ্যগ্র তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি আর হিংস্র বন্য চাহনি দেখে শিউরে উঠলেন মা। ওই তো নীচু দেয়াল, খোলা সিঁড়ি—একটা লাফ দিলেই সিঁড়ি বেয়ে জন্তুটা ছাদে উঠে আসতে পারে। কিন্তু না, উপর দিকে চেয়ে মানুষ দেখেই হ'ক বা যেজন্যই হ'ক—যেদিক থেকে এসেছিল আবার সেই দিকেই দৌড় দিল ও, স্থানীয় লোকে তাড়িয়ে টোটার ওইদিকে নিয়ে গেল তাকে। 'প্রায়ই অতর্কিতে ছাগল হাঁস মুরগী ধরে নিয়ে যায় গধিয়া'—ছোটবেলায় আমিও মাঝে মাঝে শুনতাম।

আর একদিন আবার একটা পাগল গিয়ে ঢুকেছিল উপরের ঘরে। এই সব দেখে-শুনে ঠাকুর অবিলম্বে ছাদের সিঁড়ি বাড়ির ভিতরে নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। চারিদিকের এই আরণ্য পরিমণ্ডল, তার উপর ঠাকুরও সব সময় থাকবেন না বাড়িতে—মেয়েদের নিরাপত্তার জন্য ওটা নিতান্ত দরকার ছিল। ডানদিকের ছাদে একটি চওড়া সিমেণ্টের চাতাল, ওইটি ছিল তখনকার সিঁড়ির শেষ ধাপ। উপরের বড় ছাদে আলিসা ছিল না সে সময়। বাঁদিকের ছাদ ছিল গড়ানে ঢালু ছাদ। ডানদিকের ছাদ ছিল আরও ছোট কারণ রান্নাঘরের চাল তখন টালিতে ছাওয়া। পরে রান্নাঘরের ছাদ পাকা করে দক্ষিণের ছাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়।

আরও আছে। ঠাকুরঘরের গায়ে উপরে আর যে-দুটি ছোট ছোট ঘর তার মধ্যে পশ্চিমেরটি সাবেক কালের। সামনের ছোট ঘরটা ছিল না। ও দিকটা বাঁদিকের ঢালু ছাদেরই অংশ ছিল। এখন ঠাকুরঘর থেকে ও-ঘরে যাবার যে দরজা, সেখানে ছিল ঠাকুরঘরের আর একটি

জানালা—দক্ষিণের জানালার ঋজু-ঋজু। পরে এই জানালাটিকেই সরিয়ে ওই ছোট ঘরের উত্তরের জানালা করা হয়েছে।

প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ হরিদাসদা ও হরেনদা, তিনজনের হাতেই নীলাচল কুটিরের ভাঙা-গড়া অবিরাম চলেছে। বাড়িতে কুয়া করা, ছাদের কড়ি বদলানো, একটি পায়খানা ঘিরে দেওয়া ইত্যাদি প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি প্রজ্ঞানন্দজীই সিদ্ধ করেন।*

নীচের বারান্দা ছুটিই ছিল খোলা। প্রথমদিকে মায়েদের মধ্যে স্থরমা-কিছুদিন একাই ছিলেন। কিন্তু সুখের কথা সেকালের পুরুষোত্তমধামে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বলে কিছু ছিল না। মায়ের কাছে শুনেছি কতদিন বাইরের দরজাও খোলা রেখে সেবকরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, হরিদাসদা হয়তো সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেখানেই রাত কাটিয়ে ভোর বেলা বাড়ি ফিরেছেন, তবু কোনদিন চুরি বলে কিছু হয়নি। তবে কিনা মানুষের উপদ্রব না থাকলেও অমানুষের অত্যাচার কম ছিল না। তারা শ্রীক্ষেত্রের কপিসেনা, ছুর্বার ও ছুর্দম।

সে বেশ মজার ব্যাপার। ভোগের ঘর না থাকায় প্রথমদিকে ও-বাড়িতে রান্নাঘরের পাশের ঘরখানায় ভোগও হত, ভোগের জিনিসপত্রও থাকত। আশ্চর্যভাবে জিনিস চুরি যেতে লাগল মাঝে-মাঝে। হয়তো মিশ্রীর ঠোঙাটা নাই কি ডালের কোটা খোলা পড়ে রয়েছে ডাল নাই। আলু বেগুন পটল কমে যায় যেন। তখন সেবক বলতে হরিদাসদা আর মা এই ছু'জন। ছু'জনেই হতবাক্ ব্যাপার দেখে—কে কাকে চোর ধরবেন? অথচ জিনিস খোয়া যাচ্ছে ঠিকই। ঠাকুর শুনে বলেন,

* নীলাচল সারস্বত সঙ্ঘের হাতে কুটিরের আকৃতি আরও পরিবর্তিত হয়েছে। এসব বর্ণনা আর মিলবে না।



নীলাচল কুটীরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ (জীর্ণসংস্কারের পর)

'তোমাদেরই কিছু ভুল হয়েছে—যা পাচ্ছ না তা হয় আনা হয়নি, নয় তো ফুরিয়ে গেছে। তোমাদের মনে নাই।' বাজার করা ভাণ্ডারের ভার হরিদাসদার হাতে—তিনি মানতে চান না তাঁর ভুল বলে। মা-ও ঠাকুরের কথায় সায় দিলে রেগে ওঠেন বরং। ঠাকুরের জিনিসে তাঁর ভুল? আর প্রায়ই এত ভুল? এই নিয়ে মাঝে-মাঝে কথা কাটাকাটি চলে।

এর মধ্যে একদিন বিকালে ঠাকুর ছাদে বসে আছেন, মা সেখানে বসে বালিশের ওয়াড় সেলাই বা অমনি কোন কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল পাশের একতলা বাড়ির ছাদে একজন কিষ্কিন্ধ্যাবাসী একছড়া সুপক্ক কদলীর সদ্ব্যবহারে রত। 'আহা, কতবড় কি সুন্দর মর্তমান কলা গো! ও ঠাকুর, দেখুন কার সর্বনাশ করেছে না জানি।' অন্যমনা ঠাকুর তঁরে আক্ষেপোক্তিতে সচেতন হয়ে চেয়ে দেখে বলেন, 'তোমাদেরই নয় তো?' 'না না, আমাদের হবে কেন? হরিদাস সবসময় রান্নাঘর-ভাঁড়ারঘর করছে। তাছাড়া কলা সে ঢেকে ঢুকে কত সাবধানে রাখে।' 'কে জানে, তাহলে অন্য কোন বাড়ি হতে এনেছে, নতুন লোক তারা অসাবধানে ছিল নিশ্চয়' বলে ঠাকুর মন্তব্য করেন 'তোমাদের যে মাঝে-মাঝে জিনিস চুরি যায় বাঁদরের কাজই হবে হয়তো।' প্রতিবাদ করেন মা 'তাহলে কোন-না-কোনদিন চোখে পড়ত ঠাকুর! হরিহাস তো সব সময় ওই দিকেই থাকে। ওরা মানুষ নয় যে নিঃশব্দে চুপিসাড়ে তার অগোচরে ঘরে ঢুকে জিনিসটি নিয়ে চোরের মত পালাবে। ও হরিদাসেরই ভুল, চুরি-টুরি নয়।'

ভুল যে কার সেদিন সন্ধ্যাতেই তা প্রমাণ হয়ে গেল। সন্ধ্যায় ভোগ সাজাতে বসেছেন মা। রান্নাঘর থেকে হরিদাসদা ডেকে বলেন 'মা কলাগুলো দেখে শুনে দিও, বেশি পাকলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।' 'কলা কোথায় হরিদাস?' 'কেন ঘরের কোনায় ঢাকেই আছে। তোমায়

দেখিয়ে রাখলাম না সকালে ?' চকিত সংশয়ে ঘরের এ-কোনা ও-কোনো খোঁজেন মা, কলা তো চোখে পড়ে না। 'ও হরিদাস কই তোমার কলা ? চিহ্নমাত্র নাই তার।' 'আরে! নিজের হাতে রেখেছি'—একটু বিরক্ত ভাবেই পাকশালা থেকে বেরিয়ে আসেন সদাব্যস্ত হরিদাসদা। রাত্রের ভোগায়োজনের যোগাড় করছিলেন তিনি। হাতের কাজ ফেলে উঠে এসে তাকের কাছে গিয়ে তাঁর মুখেও কথা সরে না। কোথায় গেল অতগুলি কলা ? খানিকক্ষণ বিমূঢ়ভাবে পরস্পরের দিকে চেয়ে থেকে মা-ই কথা বললেন 'ইস্ অমন চমৎকার কলাগুলো!' 'দেখেছ তো তুমি!' একটু ভরসা পান হরিদাসদা—তিনি ভাবছিলেন আবারও শুনতে হবে 'ও তোমার ভুল হরিদাস, কলা তুমি আননি'। 'দেখেছি বৈ কি' মা সখেদে হেসে বললেন "বিকালে ছাদে বসে আরাম করে খাচ্ছিল একটা বাঁদরে। আমি আরও ঠাকুরকে বললাম 'আহা কার না জানি সর্বনাশ করেছে।' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন 'তোদেরই নয় তো ?' বলেছি, 'না আমাদের সব সাবধানে আছে'।" আকাশ থেকে পড়লেন হরিদাসদা 'বাঁদর ? বাঁদরে খাচ্ছিল কলা ? তবে ওরাই সব চুরি করে চুপি-চুপি এসে! ও হরি, আমি তাই ভাবি ঘর থেকে জিনিস যায় কোথায় ? আমার কি এতই মাথা খারাপ হল যে জিনিস না এনে ভাবি এনেছিলাম। তোমরা কেবলই বল তোমার ভুল হচ্ছে।' 'আর বলব না হরিদাস'—মা সবিনয়ে ত্রুটি স্বীকার করেন,'ওগুলো যে এমন পাকা চোর কে জানত বল ? কখন আসে কখন যায় কোনদিন তো কেউ দেখিনি।' 'নাঃ—দুপুর বেলা তাকের এক কোনায় কলা সাজিয়ে রেখেছি। তুমিও দেখেছ কিনা সন্দেহ কিন্তু ও-বেটারা ঠিক সন্ধান রেখেছে। আশ্চর্য!' 'এবার থেকে ভাঁড়ারের তিনটা দরজাই বন্ধ রেখ সব সময়, আমিও সাবধান হব। ভাগ্যে দেখেছিলাম কলা খেতে, নইলে আরও যে কত

ক্ষতি করত কতদিন। তাছাড়া চোখে না দেখলে আমিও বিশ্বাস করতাম না যে এই আধা অন্ধকার ঘরের কোনা থেকে একেবারে নিঃসাড়ে কলা নিয়ে যেতে পারে বাঁদরে। তুমিও আজ আর নিজের ভুল মানতে না—কী যে বিভ্রাট বাধত কলার ছড়া নিয়ে!' দুজনেই হেসে ফেলেন সম্ভাবিত রাগারাগিটা স্মরণ করে। শ্রীরামচন্দ্রের কপিবাহিনী কি সহজ শত্রু? স্বর্ণ-লঙ্কা ছারেখারে দিয়েছিল ওরা—সেটা পুরীর বাঁদরের পাল এবং তাদের বিচিত্র শয়তানী স্মরণ করলে বিশ্বাস না করে উপায় নাই। সে লিখতে গেলে এক কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড, অতএব থাক। ঠাকুরের সংসার থেকে কত জিনিস যে ওরা সরিয়েছে, কি রকম ক্ষতি যে করেছে! তবে এটা ঠিক—ঠাকুরের নিজস্ব ব্যবহারের জিনিস কখনও নেয়নি—একটি গ্লাস ছাড়া। তাঁর চশমাটি খাপশুদ্ধ নিয়ে গিয়েছিল একবার—আবার তখনই ছাদে নামিয়ে রেখে চলে গেল সাধুর মত। অন্যান্য থালা-বাটীর মত ছাদ থেকে নীচে ফেলে দিতেও পারত—দেয়নি কিন্তু। ঠাকুর নিজেও সর্বদা সতর্ক থাকতেন। যখনই ঘর থেকে বেরোতেন নিজের হাতে জানালা দরজা বন্ধ করে সব সামলিয়ে রেখে তবে যেতেন। নীচে তা নয়—সেবকেরা কাজ নিয়ে ঘুরছেন এদিক-ওদিক, কাঁহাতক সব দরজা বন্ধ করা যায় বার-বার? কাজেই চারদিকই খোলা—ওরা ঝাউ গাছ থেকে সব লক্ষ্য করছে। ফাঁক পাওয়া মাত্র টুকটাক এটা-ওটা নিয়ে সরে পড়ছে—চাল-ডাল তরি-তরকারী ফল-মূল ঘটি-বাটি কাপড় চোপড় যা পাচ্ছে হাতের কাছে তাই-ই লোপাট। রে—রে বলে ধাওয়া করতে-না-করতে পাঁচিল থেকে একলাফে গাছে কিংবা ছাদে।

নীলাচল কুটিরের রূপ বদলায় দিনে দিনে। সিঁড়ি এল ঘরে—ভোগের ঘর হল, বাড়ি ঘেরা হল উঁচু পাচিল দিয়ে। খোলা ছাদে আলিসা হল, আরও কত কি। ওই যে আয়নার মত চকচকে মসৃণ

ঘরের মেজে—নিজে বসে থেকে মনের মত করে ঘর মাজিয়েছিলেন হরিদাসদা। মিস্ত্রীরা নিজে থেকে অত সৌখীন কাজ করে না, মজুরী বেশি দিয়ে সামনে থেকে তদারক করলে তবেই হয় অমনটি। একা অক্লান্ত কর্মী হরিদাসদা—বাড়ি মেরামতী মিস্ত্রীমজুর খাটানো টাকা পয়সার হিসাব, সেই সঙ্গে বাজার-হাট রান্না ঠাকুরসেবা। মঠে বড়-মায়ের (ভৈরবী মা) কাছে ঠাকুরসেবার পাঠ নিয়েছিলেন। নীলাচল কুটিরে এসে সে-পাঠ নেওয়া তাঁর পুরাপুরি কাজে লাগল।

শুনেছি বড়-মার ঠাকুরসেবা একটা দেখার জিনিস ছিল। আসামের ওই শীত। বছরের ন'মাস তখন বর্ষা আর কুয়াশা লেগে থাকত—তার মধ্যে কোন্ ভোরে উঠে স্নান করে নিতেন তিনি। স্নানের সময় নিত্য নিজ হাতে মার্জনা করতেন ঠাকুরের ব্যবহৃত বর্চ্চঃকুটির,* মেজে ঘষে সোনার মত ঝকঝকে করতেন তাঁর জগ করঙ্গা পিকদানী ঘটি এবং গাড়ু। স্নান সেরে কাপড় ছেড়েই গিয়ে ঢুকতেন ঠাকুরঘরে। তাঁর গা-হাত-পা টিপে তাঁকে জাগিয়ে (ঠাকুরের ঘুমভাঙানোর ঐ প্রক্রিয়াটি বড়মারই উদ্ভাবন) একদফা তামাক দিয়ে ছুটতেন গাড়ু গামছা যথাস্থানে রেখে আসতে। সেখান থেকে এসে ঠাকুরের মুখ হাত ধোয়ার জল মাজন ঘটি বসার চৌকী সব সাজিয়ে রেখে বঁটি নিয়ে বসে যেতেন সকালের ভোগ সাজাতে। তিনি ফলকাটা মিষ্টিগুছানো কি চিঁড়া-মুড়ির আয়োজন করতে করতে, তামাক খেয়ে ঠাকুর চলে গেলেন বর্চ্চঃ-কুটিরে। বড়মা ভাঁড়ারঘর থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুতহাতে তাঁর বিছানা ঝাড়া মশারি তোলা ঘরদুয়ার ঝাঁট দেওয়া টেবিল-চেয়ারের ধূলা ঝাড়া ঘর মোছা সব সেরে ফেললেন। ঠাকুর ওদিক থেকে আসতেই গরমকাল হলে তাঁকে একটু বাতাস করে তারপর মুখ ধোওয়ার তদারকি—ঘটি জল

* বৌদ্ধ পারিভাষা, অর্থ **latrine.**

এগিয়ে দেওয়া, পা ধুয়ে মুছিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। জলখাবারটি খাইয়ে আবার তামাক দিয়ে চলে যেতেন রান্নাঘরে। সেখানে কিছু যোগাড় করে আবার এসে তামাক দিয়ে ঠাকুর যদি ঘরে টেবিলের কাছে গিয়ে বসেন তো হুঁকা পিকদানী সেখানে রেখে ফের রান্নাঘরে ঢুকতেন। দুই উনুন জ্বেলে সময়মত ভোগরান্না সেরে ঠাকুরকে তেল মাখানো স্নান করানো চুল আঁচড়ানো······ভোগ দেওয়া। মোটকথা সব—সব একহাতে। কলের মত অবিশ্রাম খেটে যেতেন উদয়াস্ত, আর সে কী পরিপাটি নিপুণ সেবা! এই বড়মা হাতে ধরে সেবা শিখিয়েছিলেন প্রথম চিদানন্দ মহারাজকে আর পরে দুটি ব্রহ্মচারীকে। পরবর্তী কালে এঁরা দুজন হতেন ঠাকুরের ভ্রমণসঙ্গী। এঁদের মধ্যেই একজন আমাদের হরিদাসদা——নীলাচল কুটিরে ঠাকুরসেবায় একাধিপত্য লাভ করেছিলেন তিনি। তার আগে একটা গল্প বলে নেই এখানে। গল্পটি শোনার মত।

১৩২৪ সালের কথা। সতের-আঠার বছরের দুটি ছেলে একদিন বিবাগী হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল—উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ। বড়লোকের ছেলে বলতে যা বোঝায় একজন তা-ই। অন্যজন সাধারণ ঘরের ছেলে হলেও ধনী জমিদার গৃহের কুটুম্ব—পিতৃমাতৃহীন বলে আদর-যত্নেই মানুষ হচ্ছিল বড়লোকের ঘরে। পরস্পরের বাল্যবন্ধু তারা—পরামর্শ করে লুকিয়ে পালাল দুজন; অভিভাবকরা জানতে পারলে এক পাও বেরোতে দেবেন না ঘর থেকে। সঙ্গের সম্বল সামান্য কয়েকটা টাকা, আর কিছু না। একেবারে যাকে বলে এক-কাপড়ে গৃহত্যাগ করা।

'স্কুলে যাচ্ছি' বাড়িতে এই জানিয়ে দু'জনে দুই পথ দিয়ে এসে মিলল স্টেশনে।

প্রাক্তন সংস্কার হয়তো একেই বলে। কোথায় যাব ঠিক নাই, কি করতে হবে জানি না; কার কাছে গেলে ঈশ্বরলাভের উপায় হবে সে

চিন্তা নাই, আর দেহধারণের ব্যবস্থাটাই বা কে করবে—এসব হিসাব সম্পূর্ণ বাদ। অভাবের তাড়না ছিল না, বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছেলে নয়, সুখে লালিত-পালিত, আত্মীয়-স্বজনের আদরের দুলাল। ঘর ছেড়ে পথে বার হল যখন তখনও একজনের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী, লম্বা কোঁচা ঝুলছে; অন্যজনের হাতে সিগারেটের ভরা প্যাকেট, ওই বয়সেই মুহুর্মুহু সিগারেট খাওয়ার নেশা তার। তবু যেতে হবে—কে যেন টেনে নামাল পথে, পিছন হতে অবিরাম ঠেলছে—'ওরে থাকিস না ঘরে। এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তোদের নয়—ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অকূল সাগরে।' দুঃখ দারিদ্র্য উপবাস কৃচ্ছ্রতা—দুই বন্ধুরই কেমন মনে হয় ওই যেন অঙ্গের ভূষণ, জীবনে বরণীয় ও-ই! আর এই যে অনায়াস আরাম এ যেন মুহূর্তের স্বপ্ন—এ তো আমাদের জন্য নয়, পরের ধনে পোদ্দারি দুদিনের খেয়ালে।

পথে ছেলেদুটির যা কষ্ট গিয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ ১৩৭০ সালের চৈত্র সংখ্যা আর্যদর্পণে ধরা আছে। এক পাগলীর কথাকে দৈবাদেশ ভেবে অনভিজ্ঞতা ও অনাহারে নানা দুঃখ পেতে পেতে অবসন্ন দেহ-মনে ওরা এল ডিব্রুগড়। 'ডিব্রুগড়ে গেলে কাঁচা সোনা পাকা হয়' পাগলী নাকি এ-ই বলেছিল। কার্যত দেখা গেল সেখানে রাতে মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও ওদের নাই। তার উপর জুটল রেলপুলিশের প্রহার। যাঁকে পাওয়ার আশায় ঘর ছাড়া সেই অদেখা ভগবানের উপর অভিমানে মন ভরে ওঠে ছেলেদুটির। তারা তখন কপর্দকশূন্য। পায়ে হেঁটে ডিব্রুগড় হতে তিনসুকিয়া, তারও পরে দুই স্টেশন—এই চল্লিশ মাইল দুদিনে ওরা পাড়ি দেয়। পা ফুলে ঢোল, দেহ আর বয় না—ক্ষুধায় প্রাণ যায়-যায়। সেই অবস্থায় এক মুসলমান আসামী কুলি সাক্ষাৎ দেবদূতের মত যেচে ওদের ভিক্ষা দিল একমুঠা কলাইয়ের ডাল ও দু'তিন মুঠি মোটা চাল

চাল। তারই দেওয়া দশটি পয়সা হতে দুখানা টিকিট কেটে ওরা 'ভজু' হয়ে এল শিবসাগরে। এতদিনে কাণ্ডজ্ঞান হয়েছে কিছুটা। কাজেই অজ্ঞাতবাসের আশা ছেড়ে শিবসাগর হতে বাড়িতে চিঠি দিল, 'এই ঠিকানায় টাকা পাঠাও আর অতুলানন্দজী যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন তাঁর ঠিকানা দাও। আমাদের ঘরে ফেরানোর চেষ্টা কিন্তু কর না।' কাঁচা সোনা তাহলে পাকা হয়েছে ততদিনে, স্বীকার করতেই হবে।

অতুলানন্দজী এঁদের পিত্রালয়ে মাঝে মাঝে যেতেন। ১৩১৬ সালে মহাদেবপুরে ঠাকুরের কৃপা লাভ করেন। তিনি কিন্তু মঠের অতুল ব্রহ্মচারী নন।

যথাসময়ে টাকা এবং চিঠি এল। চিঠিতে শান্তি আশ্রমের ঠিকানা পেয়ে নিরুদ্দেশ জীবন ছেড়ে ভবঘুরে দুটি যোরহাটের দিকে রওনা দেয়। তখনও শান্তি আশ্রমের কর্তা সম্বন্ধে ওদের কোন ঔৎসুক্য নাই, পরিচয়ও জানে না।

যোরহাট থেকে এসে পথের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে ট্রেন তো গেল। কোথায় শান্তি আশ্রম? ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় দু'জন, সামনে প্রকাণ্ড বিল। বিলের ধারে ধারে ঘন জঙ্গল। ঘুরতে ঘুরতে সেই জঙ্গলে দেখে মোষের পিঠে চলেছে এক ভীষণদর্শন পুরুষ। লোকটা আসামের আদিবাসী মিরি, সে কথা ওরা পরে জেনেছিল। তখন তো দেখে সাক্ষাৎ কৃতান্ত বোধ হল। কিন্তু পথের হদিশ দিল সে-ই—'গোঁহাই-এর ওখানে যাবি?' জিজ্ঞাসা করে সে দেখিয়ে দেয় এই বিলের ওপারে সে-জায়গা, 'গেলেই দেখবি নিশান উড়ছে'। তখন বিল সাঁতরিয়ে দুই জনে এসে যেখানে উঠল সেটি সারস্বত মঠের পূর্বসীমানার পুকুরপাড়।

শান্তি আশ্রমের শান্ত নির্জন পরিস্থিতি ভারি ভাল লাগে ছেলে-দুটির। আহা! এতদিন যেন এমনি একটি শান্তরসাস্পদ তপোবনই

খুঁজে ফিরছিল মন, এরই সন্ধানে এত হয়রানি আর এত ছুটাছুটি। সাধন-ভজনের অনুকূল ক্ষেত্র বটে!

শুদ্ধানন্দ প্রেমানন্দ চিদানন্দ কুমারানন্দ—একে একে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা নানা কাজে যাচ্ছেন-আসছেন, ওরা চেয়ে চেয়ে দেখে। নাম-ধাম জানে না কারোই, বলা বাহুল্য। শেষে একজন ওদের আসার উদ্দেশ্য ও পরিচয় জেনে নিয়ে খেতে ডাকলেন। বেলা যায় যায়—হাত পা ধুয়ে অধীর প্রত্যাশায় আহার্যের অপেক্ষা করে ওরা। স্বরূপানন্দজী দুখানা থালায় যৎসামান্য অন্নব্যঞ্জন এনে 'প্রসাদ' বলে ধরে দিলেন। কার প্রসাদ কি প্রসাদ সে বিচার থাক, পরিমাণ দেখেই ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলে ওঠে। এ ক'টিতে কি-ই বা হবে? খেতে বলে ঠাট্টা নাকি? যাক, যা পাওয়া গেল তা-ই অনেক ভাগ্য—ভেবে ক্ষুণ্ণ মনে খেতে শুরু করে দু'জনে। কিন্তু আশ্চর্য, ওই ক'টিতেই যেন তৃপ্তি হয়ে গেল। হয়তো সারাদিন উপবাসে খিদে পড়ে গিয়েছিল। ওরা দু'জন অত যুক্তির ধারে-কাছে গেল না, ছেলে-বুদ্ধিতে ভাবল সাধুরা নিশ্চয় মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানে। খাবার জিনিস বেশি পাবে কোথায় এ জঙ্গলে—যা পায় তাই খেয়েই মন্ত্রসাহায্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে।

খেয়ে-দেয়ে গৌরাঙ্গঘরের বারান্দায় বসে দুই বন্ধু—একটু পরে কানে এল একটা কাসির শব্দ। কে যেন গলা ঝাড়া দিল সেই সঙ্গে লাঠি আর জুতার আওয়াজ। চকিত হয়ে চায় ওরা। আশ্রমে ঢুকে অবধি কি যেন এক অভাবনীয়কে ধরা-ছোঁওয়ার সম্ভাবনা খেলে যাচ্ছে প্রাণে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে কিছু একটা হবে এবার। এ আবার কি, কে? শব্দ আরও নিকটবর্তী হল—উন্মুখ হয়ে চাইতেই দু'জনে দেখে সামনে এসে পড়েছেন একজন। হাতে বড় একখানা লাঠি—পায়ে কাল জুতা, তাঁর চোখমুখ কি চেহারার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বললেই

বোধহয় যথেষ্ট হবে যে ছেলেদুটি ব্রাহ্মণবংশের ছেলে, সংস্কার প্রবল বলে আশ্রমে ঢুকেও এ-পর্যন্ত কাউকে ওরা প্রণাম করেনি। অথচ যতজনকে দেখেছে সকলেই গেরুয়াধারী। যদি অব্রাহ্মণ হয়? হলই বা সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী—এই ছিল ওদের বিচার। কিন্তু এবার আর সে বিচার রইল না। ইনি কোন্ আশ্রমী কি জাতি কিছু ভেবে চিন্তে দেখার আগেই মাথা নুয়ে আসে—'আলুর বস্তার মত' তাঁর পায়ে পড়ে যায় ওরা।

ঠাকুরের কোন পরিচয় না জেনেও ঈশ্বরলাভের বাসনায় ঘুরতে-ঘুরতে ভাগ্যের চক্রান্তে একদিন এমনি করে যাঁরা ঠাকুরের কাছে এসে পড়েছিলেন তাঁরাই ব্রহ্মচারী ভুবন ও হরিদাস। এঁরা ঠিক মঠের সেবক নন। ঠাকুরের সেবক, তাঁর নিজস্ব পরিচারক বললেই বোধহয় ঠিক হয়। ঠাকুর-বর্তমানে আদ্যন্ত তাঁদের ওই ভূমিকা।

নামদুটি কিন্তু দু'জনেরই ছদ্মনাম। ওই নামেই মঠাশ্রমে পরিচিত তাঁরা। বড়মা এঁদের দু'জনকেই নিজে ঠাকুরসেবার তালিম দিয়েছিলেন।

নীলাচল কুটিরের কথা বলতে গিয়ে হরিদাসদার কথা না বললে আমার কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকবে। এককালে বড়মা যেমন একা ঠাকুরের সকল সেবা নির্বাহ করতেন, হরিদাসদারও ছিল সেই ভাব। ভোররাত্রে উঠে ঠাকুরের বর্চ্চঃকুটির থেকে শুরু করে বাইরের উঠান পর্যন্ত সারা বাড়ি ঝাঁট-পাট দিয়ে ধুয়ে ফেলা, নর্দমা পরিষ্কার গাড়ুমাজা ঠাকুরের নিত্য ব্যবহার্য বাসনপত্র মাজা সব একহাতে সেরে নিতেন। ছোটবেলায় কুটিরের সেবকদের কাজের যে-ধারা আমি দেখেছি শুনেছি, তা ছিল হরিদাসদারই প্রবর্তিত রীতি। শুধু তাই নয় —হরিদাসদা প্রথমদিকে সেবক-সেবিকার দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে কাজ করতেন। বাইরের কাজ সেরে কুটনা বাটনার আয়োজন, রান্না, বাজার করা, আবার তারই ফাঁকে-ফাঁকে ঠাকুরের মুখ-হাত ধোওয়ার ব্যবস্থা,

বাতাস করা তামাক দেওয়া তেল মাখানো স্নানের জল ঠিক করা, এসবও যতদূর পারেন নিজহাতে করা চাই। চক্রতীর্থে থাকতে উনুনে অড়হর ডাল বসিয়ে (পুরীর বাজারে তখন ভাল ডাল বলতে ওইটাই মিলত) ছুটতে-ছুটতে সিংদরজায় এসে বাজার করে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে ডাল সম্বরা দেওয়া—এ-ও শুনেছি। ফর্সা মানুষ—চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে দৌড়াদৌড়িতে, দর্ দর্ করে ঘাম ঝরছে, তবু কী তৃপ্তির হাসি তাঁর মুখে! কি? না, ঠাকুর সজনে ডাঁটা ভালবাসেন, সারা শহর ঢুঁড়ে কোথায় কোন্ মার্কেটের বাজার হতে এক গোছা সজনে ডাঁটা যোগাড় করতে পেরেছেন। ঠাকুর রুটি খান রাত্রে—বাজারে ভাল আটা মেলে না। গম কিনে আতি-পাঁতি করে খুঁজে কোনখানে এক বুড়িকে আবিষ্কার করলেন হরিদাসদা, যাঁতায় গম ছোলা পেষে সে। বসে থেকে গম ভাঙানো আটা তৈরী করে তবে বাড়ি ফিরলেন হয়তো। অহোরাত্র ভূতের মত খাটছে লোকটা—তারই মধ্যে দরাজ গলায় গান—

হরে মুরারে হরে মুরারে!
পতিতপাবন জগ-জন-তারণ
অনাদি কারণ কৃপাবারে।
তুমি তেজোরূপে তপনে প্রকাশ,
তুমি জলরূপে জলধরে
জ্যোতিরূপে শশধরে
তুমি ক্ষিতি তুমি হে আকাশ।
তুমি বায়ুরূপে জীবের জীবন
তুমি আছ সকলেতে
সকলি আছে তোমাতে
সৃজন-পালন-কারণ।

তুমি আদি তুমি শেষ তুমি হে অনন্ত
তুমি সাকার কি নিরাকার
বুঝিতে শকতি কার,
পরমাণুরূপে চরাচরে ॥

এটি তাঁর একটি প্রিয় গান ছিল। গানটা পড়ে মনে হয় সেবাসহায়ে চিত্তশুদ্ধির পথ ধরায় ভক্তিপথে জ্ঞান লাভ হয়েছিল হরিদাসদার। অদ্বৈত বেদান্তের সার মর্ম হৃদ্‌গত হয়েছিল ব্রহ্মবিদ্‌গুরুর সেবা করে। সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন—চিঠি লিখতে-লিখতে উৎকর্ণ হয়ে তাঁর গান শুনতেন ঠাকুর। তবে সেরকম হত কদাচিৎ—আপনমনে নিরালায় গান গাইতেন তিনি। ঠাকুরকে শোনাবার আকিঞ্চন ছিল না কোনদিন, ওতে বরং কুণ্ঠাই ছিল। বিদ্যানুরাগ ছিল, অত খাটুনীর পরও রীতিমত লেখাপড়া করতেন। তাঁর পুঁথির দপ্তর—ভাল একটা ইংরেজী অভিধান খানকয়েক হিন্দী ইংরেজী সংস্কৃত বই আমার হাতে পড়েছে উত্তরাধিকার-সূত্রে। কত বলব হরিদাসদার গুণের কথা? যেখানে যে ভাল খাবারটি দেখতেন শিখে এসে ঠাকুরকে করে খাওয়ানো চাই। রান্নার হাত ছিল চমৎকার—নিত্য নতুন পদ রেঁধে ভোগ দিতেন। হঠাৎ খেয়াল হল সব খাবারই করেছি বাড়িতে, রসগোল্লা তো করা হয়নি। ময়রার দোকানে বসে থেকে রসগোল্লার প্রস্তুতপ্রণালী দেখে এলেন আদ্যন্ত। ঘড়ি ধরে সময় দেখলেন, কতক্ষণ ফুটবে ছানার গোল্লাগুলি—ওইটাই আসল। বাড়ি এসে ঠিক তৈরি করলেন রসগোল্লা, প্রথম চেষ্টাতেই উত্‌রে গেলেন। তাতেও হল না—এবার রাজভোগ। ইয়া বড় বড় রাজভোগ করে দেব ঠাকুরভোগে।

সেবকে আর মালিকে কিন্তু এই নিয়ে মাঝে মাঝে মনোমালিন্য হত। হরিদাসদার ইচ্ছা, ঠাকুরের সেবা হবে ঠাকুরেরই মত। জগন্নাথদেউলের

বিরাট সেবাড়ম্বর দেখে এ ঝোঁকটা আরও বেড়েছিল বোধহয়। কিন্তু হরিদাসের সেবানৈপুণ্যে পরিতৃপ্ত হলেও ওই সেবাবাহুল্যটা ঠাকুর সবসময় বরদাস্ত করতে পারতেন না। মঠের ঠাকুরকে আমি জানি না—নীলাচলের ঠাকুর কিন্তু কাঙালের ঠাকুর। অশনে-বসনে শয়নে-ভোজনে অনাড়ম্বর সাদা-মাঠা আয়োজনই তাঁর পছন্দ ছিল। হরিদাসদাকে এজন্য মাঝে-মাঝে বকুনি খেতে হত। তাতে সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হলেও আবার সুযোগ পেলেই রাজকীয় আয়োজন করে তুলতেন তিনি। বাড়ি মেরামতির ব্যাপারেও এই মতদ্বৈধ—নীলাচল কুটিরে তার সাক্ষ্য আজও আছে। সমুদ্রের ধারে তখন ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ মহাশয়ের 'পুলিন-পুরী' (এখন Baron's Hotel) তৈরি হচ্ছে—সাহেবী ধাঁচের জমকাল বাড়ি। হরিদাসদার মনে গোপন অভিপ্রায়—ভেঙে-চুরে ক্রমে নীলাচল কুটিরকেও অমনি প্রাসাদ করে তুলবেন। তার প্রথম সূচনা ও-বাড়ির প্রধান প্রবেশপথটির পরিকল্পনা—দস্তুরমত একখানি সুউচ্চ তোরণ। হরিদাসদার ইচ্ছা ছিল ওর সঙ্গে মানানসই করে সুন্দর নক্সা করা উঁচু দেওয়াল দেওয়া। তোরণটি হওয়ার সময় ঠাকুর বাইরে ছিলেন। এসে ওই গেট দেখেই এক ধমক 'একি করেছিস? একি ঐশ্বর্যের বিকার? পাঁচিলই বা অত উঁচু করার কি দরকার ছিল শুনি? যা গাঁথা হয়েছে ওই থাক—আর উঁচু করিস না।' তাঁর রুষ্ট বিরক্তি দেখে অগত্যা হরিদাসদাকে নিরস্ত হতে হয়। মাঝখান থেকে দেওয়াল আর গেটে সামঞ্জস্য রইল না। খুঁটিয়ে দেখতে জানে যারা, তারা এখনও নিশ্চয় ভাবে—এ বাড়ির গেটটা এমন বেখাপ্পা রকম উঁচু কেন? মাঝারি মাপের দেওয়ালের সঙ্গে অতবড় এক সিংহদুয়ার?

'৩১ সালে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ঠাকুর নীলাচল কুটিরেই ছিলেন। সম্ভবত সেইবার ভাদ্রের শেষ বা আশ্বিনের প্রথমে তন্ত্রসাধক মহাপণ্ডিত

জন উড্রফের সঙ্গে ঠাকুরের দেখা হয়* (কারণ মদনগোপালদা তাঁর লীলা-লহরীতে এই সাক্ষাৎকারের তারিখ দিয়েছেন ১৯২৪, ২৭ সেপ্টেম্বর)। নীলাচল-বাণীতে দেখছি ঠাকুর নৃপালদাদের বলছেন—

"সাহেবরা না বুঝে হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রের নিন্দা করে। কিন্তু বুঝিয়ে দিলে তারা সহজেই বোঝে। উড্রফ সাহেব প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক। তন্ত্রভূষণ উপাধি নেবার জন্য পুরী এসে সে চৈতন্যলাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিল, 'তন্ত্রের সাধনা অতি স্থূল, আমার মনে হয় এর চেয়েও সূক্ষ্ম শক্তি আছে। কিন্তু হিন্দুরা হয়তো এর চেয়ে উচ্চস্তরের সন্ধান জানেন না।' বিজয়া নামে পত্রিকায় এর অনুবাদ বার হয়। আর্যদর্পণের সঙ্গে বিজয়ার বিনিময় হত। আমি 'বিজয়া'তে এটা পড়ে আমার এক শিষ্যকে এর প্রতিবাদ করতে বললাম। আমার কথামত সে সাহেবকে বুঝিয়ে লেখে যে ভগবানের অনন্ত শক্তি। তার মধ্যে তন্ত্রে কেবল মায়াশক্তির আলোচনা আছে। কিন্তু সম্বিৎ সন্ধিনী ও হ্লাদিনী নামধেয়া চিৎশক্তিই ভগবানের স্বরূপ-শক্তি। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এর বিশেষ বিবরণ আছে। তার উত্তরে সাহেব বৈষ্ণবদর্শনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম জানতে চাওয়ায় তাকে নারদ পঞ্চরাত্র ষট্‌সন্দর্ভ ইত্যাদি পাঠ করতে বলা হয়। পরে উড্রফ সাহেব পুরী এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বহু জটিল তত্ত্বের মীমাংসা ক'রে নেয়।"

সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ছিলেন স্যার জন উড্রফের তন্ত্রধারক। ঠাকুরের নাম ও গুণগ্রাম নাকি তিনি বিদ্যার্ণব মশাইয়ের

* এই দেখাই প্রথম দেখা নয়। ১৩২৯ সালের ভাওয়াল সম্মিলনীর বিবরণ দিতে দিতে স্বরূপানন্দজী লিখেছেন—'১০ই পৌষ নানা কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বললেন হাইকোর্টের জজ উড্রফ সাহেব এবার পুরীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।' সুতরাং '২৯ সালের কোনও সময় উড্রফ দেখা করেছিলেন পুরীতে। এটি প্রথম সাক্ষাৎ।

কাছেই শুনেছিলেন। পুরীতে তাঁর যাতায়াত ছিল আগে হতেই। আমাদের বনমালীদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল পুরী আসার সঙ্গে-সঙ্গে। নৃপালদা জানিয়েছেন উড্‌রফ সাহেব তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্যে নির্জন বাস করবার জন্য বনমালীদার শ্বশুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপাত্রের বাড়িতে (লিয়াখিয়া গ্রাম—কোনার্কের অদূরে) কখনও কখনও অতিথি হতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পুরীবাসকালে আরও ২।১ বার জিজ্ঞাসু হয়ে তিনি তাঁর কাছে এসেছেন। গোবর্ধন মঠের মোহন্ত মধুসূদন তীর্থ স্বামীর কাছেও গেছেন। বনমালীদা কিন্তু তখন ঠাকুর মহারাজের কাছে আসেননি। যোগাযোগের সূত্রটি কেবল তৈরি হচ্ছিল তখন হতে।

৮ই আশ্বিন পুরী হতে রওনা হয়ে বগুড়া ঘুরে* ঠাকুর ১৫ই আশ্বিন মঠে যান ও ৮ই অগ্রাণ পর্য্যন্ত সেবার আসাম মঠেই থাকেন। পরে ৯ই রওনা হয়ে জগৎসী, মৌলবী বাজার হয়ে সন্দীপ ও চট্টগ্রাম যান। সেখান হতে ঢাকা আশ্রম ঘুরে ময়মনসিংহ হয়ে ভক্তসম্মিলনী উপলক্ষে কুমিল্লা ময়নামতী আশ্রমে যান। সম্মিলনী অন্তে বরিশাল হয়ে খুলনা যাওয়ার কথা ছিল। গিয়েছিলেন কি-না সন্দেহ। কারণ '৩১ সালের আর্যদর্পণ পৌষ সংখ্যায় দেখছি ১৪ই পৌষ তিনি ময়নামতী হতে পুরীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছেন।

* এই সময়ই বগুড়ায় শক্তিদা (সিদ্ধানন্দজী) এবং সতীশদা (ব্রহ্মানন্দজী)-র ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা হয়।

১৩৩১ সালের পৌষ মাস থেকে ১৩৩২ সালের আষাঢ় পর্যন্ত—এবার প্রায় সাতমাস ঠাকুর পুরীতেই ছিলেন। বিমলা-মার এখন বেশির ভাগ সময় শ্বশুরবাড়িতে থাকাই সঙ্গত। কিন্তু সুর-মা তাহলে একেবারে একা থাকবেন কি করে? এজন্য ১৩৩১ সালের ফাল্গুনে সন্দীপ হতে সরযূ-মাকে* তাঁর সঙ্গিনী হিসাবে ঠাকুর পুরীতে এসে থাকার অনুমতি দিলেন।

আর এরপরই '৩২ সালের আষাঢ় মাসে দৈবচক্রে একটি অনাথা শিশুর ভার নিতে হল ঠাকুরকে। মেয়েটির মা জন্মক্ষণেই মারা যান; মেয়ের বাপ বরাবরই বৈরাগ্যপরায়ণ। তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করে সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক জেনে ঠাকুর তাঁকে ভারমুক্ত করলেন। কুটিরের মায়েরা তিনমাসের মেয়েকে মানুষ করতে হিমসিম খান। নীলাচল কুটির আশ্রম নয়—গৃহস্থ বাড়ি, উত্তর কালে ওই মেয়েটির জন্যই ঠাকুরকে সবার কাছে এ-কথা বলতে হত। "চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।" আমিও ঠাকুর মহারাজের সর্বশেষ দায়—বুঝি শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতনের শেষ পোষ্য।

ঠাকুরের সব কাজ একা করবার ঝোঁক ছিল হরিদাসদার।

যেহেতু আমিও নিতান্তই ঠাকুরের—হরিদাসদা আমাকেও সম্পূর্ণ দখল করতে চান। হাজারো কাজের মধ্যে একটা চোখ-কান তাঁর পড়ে থাকত ক্ষুদ্র ওই মানবকটির দিকে। তাকে খাওয়ানো নাওয়ানো সাজানো······ঠাকুরসেবার ফাঁকে ফাঁকে অবসর পেলেই মায়েদের হাত থেকে খুকীকে তিনি কেড়ে নিতেন। বাজারে চলেছেন খুকু আছে ট্যাকে। জীবনে কখনও ছোটছেলে নাড়াচাড়া করেননি হরিদাসদা; কি

* ইনি সন্দীপের গুরুভ্রাতা সুরেন্দ্রচন্দ্র লোধের সহোদরা।

খায় তারা, কি ভাবে থাকে, কেন হাসে কাঁদে জানেন না। খুকীর লালন-পালন নিয়ে মায়েদের সঙ্গে মহা খিটিমিটি লেগে যেত তাঁর। 'আচ্ছা, ও দুধ খেতে চায় না দেখছ—কেন তোমরা কেবলই ধরে-ধরে দুধের বোতল ওর মুখে দাও বল তো ?!' 'তবে কি খাবে ও ?' 'কেন, বিস্কুট রসগোল্লা ছানা……!' 'সর্বনাশ !' চোখ কপালে ওঠে মায়েদের 'এ বলে কি ? পেটে সইবে কেন ওইটুকু মেয়ের ?' 'না সইবে না' গজগজ করেন হরিদাসদা। সুবিধা পেলেই নিষিদ্ধ পথ্য খাইয়েও দিয়েছেন মাঝে-মাঝে। খুকীর পেট ফেঁপে একৃশা—হরিদাসদা সমানে তর্ক করেন ওটা অনিচ্ছায় দুধ খাওয়ারই কুফল, কিসমিস রাজভোগ বা বিস্কুট সেবনের ফল নয়। দিনরাত খুকীকে কোলে-পিঠে নিয়ে ঘুরতেন আর তার অর্থহীন প্রলাপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আলাপ করতেন সমানে। নিঃসীম বাৎসল্যে আপন বলে গ্রহণ করেছিলেন ওই খুকীকে—নিজের ছোট্ট বোনটাকে ওর চেয়ে বেশি ভালবাসে না লোকে। তার মুখে বোল ফুট্তেই হরিদাসদা তাকে 'তা তা' বুলি ধরালেন। তাতা অর্থে দাদা। তিনি ডাকেন তাতা, খুকীও তাঁকে ডাকে তাতা।

'৩২ সালের শ্রাবণ মাসে সম্ভবত জন্মোৎসবের আগে পুরী থেকে ভ্রমণে বেরিয়ে আবার কার্তিকের* শেষে বিমলা-মাকে নিয়ে ঠাকুর পুরী চলে আসেন। এর পর একাদিক্রমে পাঁচমাস যে ওখানেই ছিলেন চিঠিপত্রে তার প্রমাণ পাই। এই বছর ফাল্গুন মাসে ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাশগুপ্ত মশাই সপরিবারে কিছুদিনের জন্য পুরীতে আসেন। তিনি তখন অসুস্থ। ঠাকুর নিজে তাঁকে নীলাচল কুটিরে এসে থাকার কথা লিখেছিলেন। নীলাচল কুটিরে তোলা ঠাকুরের যে

* ১৬ই কার্তিক নীলাচল কুটিরে লিখেছেন—বিমলা এলেই তাকে নিয়ে ২০শে কার্তিক শুক্রবার সন্ধ্যায় পুরী রওনা হব।

একখানি মাত্র ফটো—সেখানি এই সময়ের। ফটোতে সপরিবার অশ্বিনীবাবু ও কুটিরের মায়েদের মাঝখানে ঠাকুর বসে আছেন দেখা যায়। কোনও কারণে সেদিন অপ্রসন্ন ছিলেন ঠাকুর—ফটোতে তাঁর সেই ভ্রূকুটি-করাল মুখচ্ছবিই ধরা পড়েছে। তবু এ ফটোটার একটা বিশেষ মূল্য আছে, কারণ বললাম তো কুটিরে তাঁর ছবি তোলা ওই প্রথম আর ওই শেষ।

'৩৩ সালে বৈশাখের শেষে আবার ভ্রমণে বার হলেন ঠাকুর। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় দুমাস মঠে কাটিয়ে ৩০শে আষাঢ় শিলং যান নারানদার আমন্ত্রণে। ওখানে ১০।১২ দিন থেকে কলকাতা, দেওঘর ও কৃষ্ণনগর হয়ে ঠাকুর পুরী চলে আসেন। ভাদ্র আশ্বিন দুমাস থেকে সম্ভবত কার্তিক মাসের প্রথমেই বা আশ্বিনের শেষে ঠাকুর আবার বাংলায় যান। সঙ্গে সেবার হরিদাসদা সেবক হয়ে গিয়েছিলেন। এই কার্তিকমাসেই কুতবপুরে গুরুধাম প্রতিষ্ঠা হয়। ভ্রমণকালে হরিদাসদা দুখানা চিঠি লেখেন—তাঁর হস্তাক্ষরসহ ওই চিঠিদুটিই তাঁর স্মৃতি-অবশেষ আমাদের কাছে।

প্রথম চিঠিখানা ১৮ই কার্তিক বেলা তিনটায় ভাওয়াল আশ্রম হতে লেখা—

"ও তাতা! কি কোচ্ছ? মুড়ি খাচ্ছ না মা'দের মারছ? কেমন আছ? শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বসে বসে তামাক খাচ্ছেন আর ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন, বুঝলে? তাঁর একটু সর্দি হইয়াছে, বোধ হয় ২।১ দিনে সারিয়া যাইবে। এখানে অনেক ভক্ত-শিষ্য আসিয়াছে। মালা ও পিরান ঠিক সময়ে পাইয়াছি। পরশু আবার ঢাকা যাইব। তার

পরদিন চট্টগ্রাম রওনা হইবেন। ময়নামতির ঠিকানায় উত্তর দিও। মায়ের শরীর ভাল করিয়া সারিয়াছে ত? হরেনদা কেমন আছে? এই ২।৪ দিনের মধ্যে কতটা উন্নতি হইয়াছে? দৌড়াদোড়ি ছুটাছুটি করিতে পার ত? আমরা ভাল আছি। যদি কোন কাজ-কর্ম না থাকে তবে সকলকে বেশি বেশি করিয়া মার্‌বা আর মুড়ি খাবা, বুঝলে? ইতি—

তোমার তাতা"

দ্বিতীয় চিঠিখানা ৮ই অগ্রাণ মঠ থেকে লেখা। এখানাও 'আমার তাতাচন্দ্র' এই সম্বোধনে এক অজ্ঞাতবোধ শিশুকে উদ্দেশ্য করে লেখা। পড়ে জানতে পারি ৫ই অগ্রাণ ঠাকুর মঠে পৌঁছেছেন। পথে অল্পের জন্য এক দারুণ দুর্ঘটনা হতে সকলে রক্ষা পান। লামডিং-এর ৩।৪ স্টেশন আগে আসাম মেল আটকে যায়। জানা গেল কিছু দূরে এক খানা মালগাড়ী লাইন হতে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে-চুরে রয়েছে। লাইনটাই খারাপ ছিল। মালগাড়িখানা না এলে আসাম মেলই যেতে পারত এবং ভয়াবহ ট্রেনদুর্ঘটনা ঘটত। যাই হ'ক, বেলা ৪টা থেকে রাত্রি বারটা পর্যন্ত সদলবলে ঠাকুরকে সেখানে থাকতে হয়েছিল। হরিদাসদা লিখছেন বাবা আবার সেইদিন উপোস করেছিলেন, "সারাদিন জলটুকু পর্যন্ত খাননি।" কাজেই সে-যাত্রা দুর্ভোগের আর অন্ত ছিল না।

ভ্রমণান্তে পুরী ফিরে এসে কিছুদিন পুরী থাকার পরই হরিদ্বারকুম্ভে যোগদানের উদ্যোগ-আয়োজন হতে লাগল। প্রধান প্রধান শিষ্য-ভক্তদের উৎসাহে কুম্ভ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কুম্ভে যোগদানের তারিখ বিজ্ঞাপিত করে ঠাকুর মহারাজকে কুম্ভে আবাহন করলেন। এই আবাহন-পত্রখানা শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতিতে প্রকাশিত

হয়েছে। মূল আবাহন-লিপির একটি মুদ্রিত কপি আমাদের কাছে এখনও আছে। ১৩৩৩ সালের ১৫ই চৈত্র ঠাকুর মহারাজ হাওড়া হতে হরিদ্বার রওনা হলেন। অন্যান্য শিষ্যভক্তদের সঙ্গে হরিদাসদাও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। আর তিনি নীলাচল কুটিরে ফিরে আসেননি। পুরীতে তখন তিনি ছাড়াও হরেনদা আর সরযূ-মা দুটি সেবক-সেবিকা রয়েছেন। তাঁর কার্তিকমাসের চিঠিখানায় হরেনদার উল্লেখ ছিল দেখা যাচ্ছে। '৩৩ সালের প্রথমেই সম্ভবত হরেনদা পুরী আসেন। হরিদাসদার পুরীত্যাগের মূল কারণ নাকি ওই-ই—তাঁর সেবাব্রতের ভাগীদার জোটায় তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। একা যদি ঠাকুরসেবার অধিকার না পেলাম তবে ভিড় বাড়িয়ে লাভ কি? কেবল প্রসাদসেবা? তাতে হরিদাসদার কোনদিনই তত লোভ ছিল না। অভিমানে ঠাকুরকেই ছেড়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত—'তোমার সেবায় না লাগব তো সাধন-ভজন করি। মঠে থাকা তো ছেড়ে দিয়েছ। আমি সেখানে আর কার মুখ চেয়ে ভূতের মত খাটব?' —এই ছিল তাঁর মনের কথা। কুম্ভ-স্নানান্তে নানা তীর্থ পর্যটন করে ফিরতে লাগলেন তিনি। ছত্রিশ সালে কাশীধামে দারুণ বসন্ত রোগে হরিদাসদার দেহ গেল। ঠাকুরসেবা ছেড়ে বেশিদিন তিনি সংসারে থাকেননি।

হরিদাসদা চলে গেছেন পঁয়তাল্লিশ বছর কিন্তু নীলাচল কুটিরের ইতিহাসে তিনি অমর। আজও তাঁর কথা ভাবতে গেলেই কল্পনায় শুনতে পাই তাঁর আত্মভোলা উদাত্ত কণ্ঠ—

"হরি আমার প্রেমমধুর ভকত-হৃদয়-রঞ্জন,
পতিত তারিতে ভূভার হরিতে যুগে যুগে অবতরণ
—নরশরীর ধারণ,
তোমারই কৃপায় চলে ত্রিভুবনে সৃজন-পালন-নাশন।"

আসলে প্রেমভক্তির অধিকারী ছিলেন হরিদাসদা। ঠাকুর তাঁর পূর্বজন্ম সম্বন্ধে বলেছিলেন "হরিদাস বর্ধমান জেলায় কালীকিশোর আচার্য নামে ভক্ত গৃহস্থ ছিল। প্রেমভক্তি লাভের জন্যই জন্ম নিয়েছে।"

"সিংহলে লীলা ভাসাইলে শিলা অযাচিতে হরি প্রেম দিলে,
ভূচরে খেচরে দিলে বানরে অমর-বাঞ্ছিত চরণ,
নব দূর্বাদল শ্যামল সুন্দর পবন-নন্দন-বন্দন,
রাম-শরীর ধারণ।
অধরে অমৃত করিয়া পূরিত বাজালে মোহন বাঁশরী,
গোপীজন-মন করিলে হরণ কমল নয়নে নেহারি'
ও রূপ হেরিলে যোগী যোগ ভোলে কুলমান ত্যজে কুলনারী
ব্রজ-বিপিনবিহারী।
সুরধুনীতীরে পতিতের তরে কে তুমি কাঁদিছ কাতরে
পাপে পূর্ণ ধরা হেরিয়া এবার ব্যথা পেলে বুঝি অন্তরে
এসেছ আবার শ্রীহরি আমার দেখা দিতে দীন কিঙ্করে
গৌরহরি রূপ ধরে।"

আমার জ্ঞানোদয় হয়ে অবধি নীলাচল কুটিরে আমি হরেনদাকেই দেখেছি প্রধান সেবকের ভূমিকায়। শুনেছি তাঁর আগে শুকলাল নামে আর একজন ব্রহ্মচারী কিছুদিন হরিদাসদার সহকারী হয়ে কাজ করেছিলেন। হরিদাসদার দ্বিতীয় সহকারী হরেনদা। হরিদাসদা আর ফিরে না আসায় স্বভাবতই হরেনদা তাঁর স্থান অধিকার করলেন।

হরেনদাও পূর্ববঙ্গের ছেলে। ছাত্রাবস্থায় একদিন রাত্রে বাড়ি থেকে পালিয়ে কুমিল্লা আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত। তান্ত্রিকগুরু, ব্রহ্মচর্যসাধন পড়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি—মনের ব্যাকুলতায় জ্যোৎস্না রাত্রে একা চলে

গেলেন ১০।১২ মাইল পথ। পথে একটা নামকরা ভূতুড়ে গাছ ছিল। লোকমুখে শুনেছিলেন কিন্তু ঠিক যে কোন্ গাছটা জানতেন না। মনের আগ্রহে ভূতের ভয়ও ছিল না। তবে একটা গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় পিছনে মনে হল ঝড়্ ঝড়্ করে কে যেন এক ঝুড়ি ঢিল পাট্‌কেল ঢেলে দিল। পিছন ফিরে কিছুই দেখতে পেলেন না যখন, তখন মনে পড়ল ভয়ের কথাটা। থমকে না গিয়ে সাহসে ভর করে পা চালালেন আবার। আর কোন উৎপাত হল না। আত্মানন্দ মহারাজ তখন কুমিল্লা আশ্রমের অধ্যক্ষ—রেঁধে-বেড়ে খাইয়ে-দাইয়ে ছেলেটিকে আশ্বাস দিয়ে সেবারকার মত তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। ঠাকুরকে লিখবেন ওর কথা, আশ্রমে এলে দেখা করিয়ে দেবেন বলে দিলেন। রীতিমত খোঁজ খবর রাখেন হরেনদা, মনে শংকা—তাগাদা না দিলে ভুলে যাবেন মহারাজ। তারপর একদিন সুযোগ এল—মহারাজের কাছে খবর পেলেন ঠাকুর সে-বার আশ্রমে আসবেন না বটে কিন্তু রেলস্টেশনে দেখা করার সুযোগ হবে। হয়তো আখাউড়া স্টেশনই হবে ঠিক বলতে পারি না—আত্মানন্দজীর সঙ্গ ধরে হরেনদাও গিয়ে হাজির। বাড়িতে কিন্তু গোপন—এত কাণ্ড অভিভাবকরা কিছুই জানেন না। সমবয়সী ছেলে-পুলে জুটিয়ে ছেলেটি তাদের নানারকম মাতব্বরি করে বেড়ায়—জনসেবা সাধুসঙ্গ সৎপ্রসঙ্গ ভাল কাজই করে; তেমনি কোন ধান্দায় কোথায় গেছে এই-ই ভেবেছেন। ছেলে কিন্তু মনে মনে ঘর ছাড়ার উমেদারী করছে, আশ্রমজীবন যাপন করবার স্বপ্ন দেখছে সঙ্গোপনে।

স্টেশনে গিয়ে হরেনদা দেখেন বহু লোক অপেক্ষা করছে ঠাকুরের জন্য, শুধু তাঁরা দু'জনই নন। বেশির ভাগ মানুষের হাতেই কিছু-না-কিছু ভোগের জিনিস—ফলমূলই বেশি। হরেনদার হাত খালি, তিনি কিছুই আনেননি ঠাকুরের জন্য। তাঁর কুণ্ঠিত মুখভাব দেখে আত্মানন্দ মহারাজ

বোধহয় মনের কথাটা বুঝলেন, একটু পরে কার কাছ থেকে এনে একটা আনারস হাতে ধরিয়ে দিলেন। ট্রেন থামতেই হুড়াহুড়ি করে উঠছে সকলে—বিশিষ্ট ব্যক্তি সব প্রবীণ ভদ্রলোক, সে-ভিড় ঠেলে জোর করে কামরায় উঠতে হরেনদার সাহসে কুলায় না। কতই বা বয়স আর, ছেলেমানুষ বলতে গেলে। বুক দুর্ দুর্ করছে, বুঝি আর চোখে পড়লাম না ঠাকুরের। প্রণাম করাই হল না তাঁর, আর অন্য কিছু কি হবে! ঠাকুরকে প্রথম দেখে কেমন লাগল কি মনে হল? কেমন আবার লাগবে—ঠাকুরকে ঠাকুরই মনে হল! ঠাকুর যেন এই রকমই, মনে যে ছবি ছিল অবিকল মিলে গেছে তাঁর সঙ্গে। এখন শুধু ভাবনা উনি আমায় নেবেন কবে? এমন সময় ঠাকুর আত্মানন্দজীকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'তুমি যে ছেলেটির কথা লিখেছিলে সে আসেনি?' 'হাঁ হাঁ এসেছে' বলে আত্মানন্দজী ঠেলে দিলেন হরেনদাকে। নানা দরকারী কথায় তিনি কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন হরেনদার উপস্থিতি। হরেনদা তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে আনারসটি পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। তাঁর তখন ভারি আনন্দ হচ্ছে—অত লোকের মাঝে কি করে ঠাকুরের মনে রইল একটা ছেলে দেখা করতে চেয়েছে?

কিছুদিন আশ্রমবাস করার পরই নীলাচল কুটিরে ডাক পড়ল হরেনদার। তিরোভাবের পূর্ব পর্যন্ত পুরীতে প্রধান সেবক হিসাবে ঠাকুর তাঁকেই স্বীকার করে গেছেন। ব্রহ্মচর্য দীক্ষা দিয়ে নিজে নাম দিয়েছিলেন ঠাকুরদাস।

সাধে বলি ভক্ত-ভগবানে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক? এক-একজন শিষ্য-ভক্তের কাছে এক-একটা ঘটনায় তাঁর স্ব-ভাবের বিভিন্ন দিক প্রকাশ পেয়েছে। ওই সব টুকরো কথা জুড়ে-জুড়েই মহাকাব্য গড়ে ওঠে—ব্যাস রূপকের ভাষায় যাকে বলেছেন গণেশের কলমে লেখা আমার মহাভারত।

হরেনদার কাছে তাঁর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা শুনেছি। ঠাকুরকে চেনা যে কত কঠিন—প্রথম দিকেই একদিন সেটা তাঁর জানা হয়ে গেল।

নীলাচল কুটিরে এক ভদ্রলোক এসে একদিন দেখা করতে চাইলেন ঠাকুরের সঙ্গে। আগেই বলেছি পুরীতে ঠাকুরের অজ্ঞাতবাস, সহজে কারও সঙ্গে ওখানে দেখা করতে চাইতেন না। হরেনদাকেও নিষেধ করা ছিল যেন নিতান্ত নাছোড়বান্দা হয়ে না ধরলে কাউকে বলে না বসে যে ঠাকুরের দেখা পাবে। নেহাৎ ধর-পাকড় করলে তখন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে—তারপর দেখা করার অনুমতি। নিজেকে ক্রমেই গুটিয়ে আনছিলেন ঠাকুর—"আমি কাহাকেও পত্রাদি লিখি না। ভাল লাগে না। অবসরের চেষ্টায় আছি। এবার ভক্তসম্মিলনীতে মঠ ও আশ্রমগুলি দানপত্র রেজেষ্ট্রি করিয়া দিয়া এ-জীবনের মত বিশ্রাম লইব।" পুরী থেকে লেখা এ চিঠিখানার তারিখ ২২শে ভাদ্র, ১৩৩৪।

ভদ্রলোককে আদৌ আমল দিলেন না হরেনদা। প্রথমটা একেবারেই হাঁকিয়ে দিলেন—না, দেখা হবে না। তিনি মানতে চান না, পর পর ক'দিন আসছেন খুব কাকুতি-মিনতি লাগিয়েছেন। হরেনদা যত বলেন তিনি দেখা করেন না কারও সঙ্গে, ভদ্রলোক ততই আগ্রহ দেখান। সবে নতুন এসেছেন হরেনদা, মনটা কাঁচা—বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাইতো লোকটা এত ধরাধরি করছে। তিন-চার দিন পরে সন্ধ্যায় গা টিপতে এসে বললেন ঠাকুরকে, একজন ক'দিন ধরে ঘোরাঘুরি করছে দেখা পাওয়ার জন্য। ঠাকুর এক কথাতেই বললেন 'না, ও সব হবে-টবে না।' হরেনদা তবু একটু বলেন। অনুনয়ের স্বরে জানান, 'বড্ড পীড়াপীড়ি করছেন ভদ্রলোক কি সব জিজ্ঞাস্য আছে। আমি না করেছি তাও রোজ আসছেন।' খানিকটা চুপ করে থেকে ঠাকুর বললেন 'দেখা যাক'।

পরদিন সকালে ভদ্রলোক আবার এসেছেন। তাঁকে বসতে বলে হরেনদা ভিতরে গিয়ে খবর দিলেন 'উনি আজও এসেছেন ঠাকুর'। দক্ষিণের বারান্দায় বসে মুখ ধুচ্ছিলেন ঠাকুর—বাঁ হাতে মাজন, ডান হাতখানা কোলে পড়ে আছে হয়তো, দৃষ্টি আকাশলগ্ন। কতদিন আমরাও দেখেছি এভাবে বসে থাকতে। বাইরের কোন আয়োজন নাই তবু দেখলেই মনে হত ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। হরেনদার কথায় চট্‌কা ভেঙ্গে ফিরে চাইলেন 'বিকালে আসতে বলে দে'। খুশীমুখে ফিরে গিয়ে তাই বলে দিলেন হরেনদা, ভদ্রলোকও বেশ উৎফুল্লভাবে বিদায় নিলেন।

বিকালে চারটা বাজতে-না-বাজতেই ঠিক এসেছেন তিনি। মুখ ধুয়ে ঠাকুর তামাক খাচ্ছেন, বেড়াতে যাবেন খানিক পরে—হরেনদা এসে খবর দেন সকালের সেই ভদ্রলোক সাক্ষাৎপ্রার্থী। গম্ভীর মুখে হুকুম হল 'বলে দে দেখা হবে না।' হরেনদা স্তম্ভিত। সমাজ-সংসার ছেড়ে এসেছেন সদ্য, ভদ্রতা সৌজন্য শিষ্টাচার এগুলো পুরোপুরি শিকড় গেড়ে রয়েছে মনে, কি করে গিয়ে বলবেন চলে যাও, নিজে যাকে বলেছেন বিকালে আসতে? তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত অপ্রসন্ন মুখভাব ঠাকুরের চোখ এড়াল না নিশ্চয়ই। আরও একটু জোর দিয়ে বললেন 'দাঁড়িয়ে রইলি যে! বল্ গিয়ে চলে যেতে।' যাঁরা দেখেছেন ঠাকুরকে তাঁরা জানেন ঠাকুরের ওই সামান্য একটু ধমকের ভাবে কথা কওয়াটা কেমন বিভীষিকা ছিল। আতঙ্কে কাঠ হয়ে যেত ভিতরটা, তাড়াতাড়ি সামনে থেকে সরে পড়তে পারলে যেন বাঁচা যায়। হরেনদারও সেই অবস্থা—অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছন ফেরা ছাড়া উপায় কি? মন্থর পায়ে বাইরের ঘরের দিকে চলেছেন—যত রাগ হচ্ছে ঠাকুরের উপর তত বিরক্তি, আচ্ছা খামখেয়ালী মানুষ তো! সকালে নিজে বলল বিকালে আসতে বল, এখন বলছে না দেখা করব না। ছিঃ কি করে

মুখ দেখাবেন ভদ্রলোককে ? কোন গতি নাই বলতেই হবে লজ্জার মাথা খেয়ে। ফিরে গিয়ে আবার বলবেন "না ঠাকুর, দেখা করতেই হবে আপনাকে" ? ও বাবা, অত সাহস নাই।

অপ্রস্তুত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন হরেনদা— 'দেখুন, উনি দেখা করতে চাইছেন না এখন। আমি তো'…কথা শেষ হতে পায় না, তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন ভদ্রলোক। খুব চেঁচামেচি করে উঠতেই হরেনদার লজ্জিত ভাবটা কেটে যায়। শক্ত হয়ে বলেন আপনি এত রাগ করছেন কেন ? মহাপুরুষের দেখা পাওয়া কি এত অল্পেই হয় ? বই-এ দেখেননি ? আমি তো আগেই বলেছিলাম দেখা পাবেন না।' কে শোনে কার কথা। রাগারাগি ছেড়ে গালাগালি ধরল আগন্তুক। যা তা বলতে লাগল একেবারে, অশ্রাব্য সব ইঙ্গিত ও কুৎসা। চোখ খুলে যায় হরেনদার—ও, এই দরের মানুষ তুমি! তাঁর ধারণা হয়েছিল লোকটি প্রকৃত জিজ্ঞাসু, সাধু-মহাপুরুষের দেখা না পেয়ে কত না জানি মনঃক্ষুণ্ণ হবে, আশায় নিরাশ হয়ে দুঃখে ভেঙ্গে পড়বে। সেই ভয়েই বিচলিত হয়েছিলেন ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী। ক'দিন ধরে এত হাঁটাহাঁটি করছে বেচারী। দেখা হবে আশ্বাস দিয়ে আবার হতাশ করব কোন্ লজ্জায় এই ছিল তাঁর দুশ্চিন্তা। নিজের মন দিয়ে আগন্তুকের মনটি বিচার করেছিলেন। সেই যেদিন মাইলের পর মাইল হেঁটে স্টেশনে ছুটে গিয়েছিলেন একটিবার ঠাকুরের দেখা পাব আশায়, সেদিন যদি ফিরে না তাকাতেন ঠাকুর কতখানি লাগত প্রাণে সেই নিরিখেই হিসাব করেছিলেন। এখন জিজ্ঞাসুর রুদ্রমূর্তি আর কটুকাটব্য শুনে ভুল ভেঙে গেল। কিসের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও ? সত্যপিপাসু না ছাই, আসলে পরচ্ছিদ্রান্বেষী ধূর্ত একটা। সাধু যাচাই করতে এসেছিল ও, এসেছিল ঠাকুরকে খোঁচাতে আর টিটকারী মারতে। রাগে চোখ-মুখ লাল করে দুয়ার

দেখিয়ে দেন হরেনদা 'বেরোও এখান থেকে—এখনই বেরোও।' খেপে উঠে লোকটা আরও মুখ খারাপ করতেই এক ধাক্কায় তাকে বাইরে বার করে দিয়ে তিনি দরজায় শিকল টেনে দিলেন। আবারও রাগে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়েছেন হরেনদা। তবে এবার রাগটা নিজের উপর—ঠাকুরের সমালোচনা করেছিলেন না একটু আগে? মনটা বেঁকে উঠেছিল না? হায়! হায়! ঠাকুর নিশ্চয় বুঝে ছিলেন লোকটা আসলে কি শয়তান! কোন্ বুদ্ধিতে তিনি ভাবলেন, কি অন্যায় ঠাকুরের? লজ্জার কথা—মুখ দেখাবেন কি করে তাঁকে? যদি ঠাকুর বলেন 'কি রে, এই লোককে তুই আন্‌ছিলি আমার সামনে? এর জন্য এত সাধাসাধি তোর?' ভাগ্যে তখন ঠাকুরের মুখের উপর প্রতিবাদ করেননি তাঁর আদেশের কিংবা জিদ্ করে বলেননি যে "কথা দিয়েছেন রাখতেই হবে কথা, দেখা করতেই হবে"।

এই প্রথম শিক্ষাতেই হরেনদা সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের কোন কাজ কি কথার বিরুদ্ধ সমালোচনা মনে উঠলেও সহজে তাকে আমল দিতে ভরসা হত না। ঠাকুর যার সঙ্গে দেখা করতে না চাইতেন, তার হয়ে অনুরোধ করার দুর্বুদ্ধি মনে আসত না। লোক চিনতেও শিখেছিলেন—রীতিমত বাজিয়ে নিতেন রূঢ় ব্যবহার করে। ভক্তসমাজে এজন্য ঠাকুরদাসের দুর্নাম ছিল ওড়িশায়। ব্রহ্মচারী ঠাকুরদাসের ঘাঁটি পার হয়ে ঠাকুরের সন্নিহিত হওয়া এ বাড়িতে বড় কঠিন! কিন্তু পরবর্তীকালে হরেনদার ছাড়পত্র পেয়ে যাঁরা নীলাচল কুটিরে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বাজে লোক একটিও ছিলেন না। সকলেই অনুসন্ধিৎসু এবং জিজ্ঞাসু বটে।

১৩৩৪ সালের শুরুতেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা গৃহীশিষ্যদের অন্যতম অশ্বিনীবাবুর লোকান্তর।

২২শে বৈশাখ বেলা তিনটায় অশ্বিনীবাবু কলকাতায় মারা যান। সেদিন বেশ গরম পড়েছিল পুরীতে। রাত্রে নীলাচল কুটিরের ছাদে সকলের শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ছাদের ঠিক মাঝখানে ঠাকুরের বিছানা—অন্তরা এদিক সেদিক যে যেখানে পারে মাদুর-বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়েছে, এক ঠাকুরের জন্য মশারির ব্যবস্থা। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর, কে যেন কাশছে না? চাপা অস্পষ্ট একটা কাশির আওয়াজ, যেন কোন বিনিদ্র রোগী ক্লিষ্ট কণ্ঠে কাশছে। চোখ মেলে চাইতেই ঠাকুরের মনে হয় মশারির গা ঘেঁষে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে ছায়ার মত। অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছায়াটা—অশ্বিনীবাবু! রোগশীর্ণ কঙ্কালসার মুখে চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে—মশারি ভেদ করে ব্যগ্র হয়ে কাকে যেন খুঁজছে সে-চোখ। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার—ঠাকুরের দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলতেই শান্ত হয়ে এল মুখভাব, স্নিগ্ধ হল বুভুক্ষিত দৃষ্টি। একটু চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে আবার অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল মুখখানা। অশ্বিনী কি তবে নাই?

বাকী রাতটা আর ঠাকুরের ঘুম হল না। শেষ রাত্রে তাঁকে নড়াচড়া করতে দেখে বাতাস করেন হরেনদা। গরমে বুঝি ঘুমাননি ঠাকুর? সকলেই জেগে যান—একে একে নীচে গিয়ে কাজ শুরু করে দেন প্রত্যেকে। ভোর না হতেই তামাক দেন মা, বিষণ্নমুখে নলটা তুলে নিয়ে ঠাকুর অন্যমনে বলেন 'মনটা খারাপ হয়ে আছে। কাল রাত্রে অশ্বিনীকে দেখলাম···।' তিন চার দিন আগেই চিঠিতে জানা গেছে খুব অসুস্থ তিনি। মা বলেন, 'রোগের কষ্টে হয়তো আপনার কথা মনে করছেন কেবলই'। ভাল-মন্দ কোন জবাব দিলেন না ঠাকুর, তামাক খেতে

লাগলেন। স্বপ্ন যে দেখেননি, প্রত্যক্ষ দেখেছেন মানুষটাকে—বললে হয়তো ভয় পাবে। সকাল ছ'টাতেই টেলিগ্রাম এল অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে। 'রাত্রে কি দেখেছিলেন ঠাকুর?' বিষাদম্লান ঠাকুরকে অন্যমনস্ক করার জন্য মা প্রশ্ন করেন—তখন বললেন যা দেখেছিলেন। গুরুগতপ্রাণ নৈষ্ঠিক ভক্ত অশ্বিনীবাবু—'অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্'—অবশ্যই দেহ হতে প্রাণ-বিচ্ছেদকালে তাঁর এক ঠাকুরকেই মনে পড়েছিল। আতিবাহিক দেহ পাওয়ামাত্র আগে খুঁজেছেন—কই ঠাকুর কোথায় আমার? সে কী ব্যাকুল অন্বেষণের ভঙ্গি চোখ দুটিতে! মহানিদ্রাঘোরে ভেঙে আসছে দুটি চোখ, সারা জীবনের কর্মক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছে পরম বিশ্রান্তিতে। তবু প্রাণ মানে না! যেন, সন্ধ্যায় নীড়ে ফিরতে গিয়েও পাখী শেষবারের মত তৃষিত নেত্রে দেখে নিতে চায় তার ফেলে যাওয়া অমৃত ফলটি! অশ্বিনীর কথা বলতে গিয়ে চোখ ভিজে ওঠে ঠাকুরের—কুটিরের সকলেই বিষণ্ন হয়ে পড়েন। বাস্তবিক গৃহীদের মধ্যে অশ্বিনীবাবুর মত গুরুভক্তি বড় সুলভ নয়।

প্রাচীন জমিদারবংশের ছেলে—একমাত্র ছেলে এবং কৃতবিদ্য শুধু নন অসামান্য কৃতী, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছাত্র—ডবল এম. এ.। অল্পদিন পরেই মুন্‌সেফ হলেন, তারপর সাবজজ্ অতএব বিত্তবান প্রতাপশালী পুরুষ, দেশের দশের একজন সেকালে। স্বভাবচরিত্র নিষ্কলঙ্ক—পারিবারিক ও চাকরীজীবন উভয়ত্রই আদর্শপরায়ণ; রক্ষণশীল হিন্দু কিন্তু গোঁড়া নন। তাঁর অভিভাবকত্বে লেখা-পড়া গান-বাজনার অবাধ চর্চা চলত তাঁর পরিবারে, তাবলে শীল-সদাচারের মর্যাদা লঙ্ঘিত হতে পেত না। এই বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থ-প্রতিপত্তিশালী মানুষটি কিন্তু ঠাকুরের কাছে একেবারে তাঁর অনুগত সেবক। ঠাকুর আসবেন তাঁর

বাড়িতে—রমনায় নিজের মস্তবড় বাড়ি ছিল অশ্বিনীবাবুর—তখন আর উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নন তিনি। বংশগৌরব পদমর্যাদা ভুলে ঠাকুরের জন্য নিজেদের পায়খানা ধুচ্ছেন নিজের হাতে ঝাঁটা ধরে। চাকর চাপরাসীরা তটস্থ, স্বয়ং বড় ছেলে সঙ্কুচিত হয়ে বলছেন 'আপনি কেন বাবা, আমাকে দিন আমি করছি।' 'এসব নিজে না করলে আমার মন খুঁত্ খুঁত্ করবে'—গম্ভীর মুখে এই বলে সকলকে নিরস্ত করতেন তিনি। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়িশুদ্ধ সকলেই তখন হাসিমুখে ঠাকুরের সব কাজ নিজেরা করতে চেষ্টা পেতেন, সবাই যেন ঠাকুরের বিনামূল্যে কেনা দাস-দাসী। যে-কয়দিন ঠাকুর থাকতেন তাঁর বাড়িতে—অশ্বিনীবাবুর ভাব দেখে মনে হত তিনি যেন বাড়ির সরকার গোমস্তা আর বাড়ির মালিক ঠাকুরই! সকলকে ঠাকুরসেবায় ব্যাপৃত রেখে, নিজের চোখে ঠাকুরের কি সুবিধা অসুবিধা তদারক করে—কোর্টের বেলা হলে একধারে বসে কোনমতে চারটি খেয়ে নিজে পোষাক পরে তিনি কোর্টে চলে যেতেন। পাছে ঠাকুরসেবার এতটুকু ত্রুটি হয় ভয়ে তাঁর সহধর্মিণীও ভাল করে দেখতে পারতেন না লোকটা কি খাচ্ছে কি পরছে। তাঁর কড়া হুকুম ছিল ঠাকুর যে-কয়দিন থাকবেন কেউ যেন ঠাকুর ছাড়া অন্য কারু ভাবনা না ভাবে। বদলীর অর্ডার এসেছে—সকলকে ঠাকুরের কাছে রেখে একটা চাকর ও পাচক নিয়ে বিদেশে চলে গেলেন অশ্বিনীবাবু এ-ও হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন বাড়িতে—তাঁর যতদিন ইচ্ছা থাকবেন কোন অসুবিধা যেন না হয়, এই একমাত্র ভাবনা। এছাড়া, মঠাশ্রমের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার কথা তো সর্বজনবিদিত। তাঁর দেহান্তে ১৩৩৪ সালের জ্যৈষ্ঠে আর্যদর্পণ পত্রিকাস্তম্ভে সারস্বত সংঘ সে-ঋণ স্বীকার করেছিল।

সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বরূপানন্দজী আর গৃহীদের মধ্যে অশ্বিনীবাবুর লোকান্তর যেন সারস্বত সংঘের দুটি চূড়া খসে পড়া – ইন্দ্রপাত। গুরুর পায়ে নিঃশেষে আত্মদান করেছিলেন অশ্বিনীবাবু—শুধু নিজে নয়, নিজের বলতে যা-কিছু সব নিয়ে! এজন্য তাঁর পরিবারটির সঙ্গে ঠাকুরের অনাবিল সখ্য স্থাপিত হয়েছিল। সম্পর্কটা কেবল গুরু-শিষ্যের মত নয়— ঘনিষ্ঠ বন্ধু-স্বজনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাড়ির ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পুকুরে সাঁতার কাটছেন ঠাকুর, একসঙ্গে বসে খাচ্ছেন, চড়াইভাতি করছেন বাগানে গিয়ে—ঠাকুরকে মাঝখানে রেখে চারপাশে বসে গান-বাজনা করছে সকলে। অশ্বিনীবাবু সামনে আসতেন না—বাবাকে দেখলে সঙ্কুচিত হবে ছেলে-মেয়েরা, তাদের সরল উচ্ছ্বাসে মন্দা পড়বে, তাতে ঠাকুরের আনন্দের ব্যাঘাত ঘটবে। তিনি আড়াল থেকে সে আনন্দসভা দেখে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে যেতেন। কি যে ভাব তাঁর। ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেরই গানের গলা ছিল, বাজনার হাত ছিল সুন্দর! সযত্নে তাদের ওই নন্দনবিদ্যানুশীলনে সহায়তা করতেন অশ্বিনীবাবু—নিজের কানে গান-বাজনা শুনে বলে দিতেন ঠাকুর এলে এই গানগুলো গাইবি কি ওই সুরটা বাজাবি। এস্রাজ, পিয়ানো, হারমোনিয়াম তো বটেই—ওস্তাদ রেখে ছেলে-মেয়েদের তালিম দেওয়াতেন। স্ত্রী ছিলেন পাকনিপুণা—অতএব ঠাকুর এলে আর কোন গৃহকর্মে মন দেওয়া চলত না তাঁর, শুধু বিবিধ প্রবন্ধে ঠাকুরভোগের আয়োজন।

প্রথম আলাপের কিছুদিন পরই একখানা চিঠিতে ঠাকুর অশ্বিনী-বাবুকে লিখেছিলেন 'কলিকাতা অবস্থানকালে সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনও আপনার ছেলে-মেয়েগুলি সরস করিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহারা আমায় ত্যাগ করে নাই। বিশেষতঃ "ছানা"র * মধুর মূর্তি নিয়তই

* 'ছানা' অশ্বিনীবাবুর ছোট মেয়ে।

সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে।' (চিঠি ৩।৭২)। বস্তুত অশ্বিনীবাবুর পরিবারটির সঙ্গে ঠাকুর মহারাজের সম্পর্কটি ছিল পরম পবিত্র ও হৃদ্য এক আশ্চর্য সম্পর্ক। আর, এ-সম্পর্ক ঘটানোর মূলে ওই গৃহকর্তারই দিব্য প্রভাব। শিষ্য হিসাবে দাস্যভক্তির মূর্ত প্রতীক হলেও ঠাকুরকে বাড়িতে এনে যে-ভাবে অশ্বিনীবাবু তাঁর সেবাবিধান করতেন তার মধ্যে প্রকাশ পেত বাৎসল্যরতির মহিমা। ছেলেমেয়েগুলির মত ঠাকুরও যেন তাঁর বড় আদরের ধন এমনি মমতা-মিশ্রিত গভীর প্রীতি নিয়ে ঠাকুরকে নিজ পরিবারে আসন দিয়েছিলেন তিনি; গুরুকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করার মধ্যে ফাঁকি ছিল না এতটুকুও। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন' ঠাকুরও তাই তাঁর নিজজনদের অকুণ্ঠ চিত্তে আপন করে নিয়েছিলেন। ভাব গাঢ় হলে তার শাবল্য স্বাভাবিক। বৈষ্ণবমহাজন বলেন বলদেবের দাস্য সখ্য বাৎসল্য তিনটি ভাবই ছিল শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে—অথচ মূল ভাবটি তাঁর বাৎসল্য। বলতে পারি, অশ্বিনীবাবু ঠাকুরকে স্বগৃহে এনে এমনি একটি গম্ভীর ভাব-ভূমিকায় আরূঢ় হতেন। ছেলে-মেয়েগুলিকে ঠাকুরের কাছে ঠেলে দেওয়াটা সেই শুদ্ধ সখ্যেরই মাধুরী। কাজেই তারাও ঠিক সমবয়সী বন্ধুর মত পেয়ে বসত ঠাকুর মহারাজকে।

এই বন্ধুদের ঠাকুর কি ধরনের চিঠি লিখতেন এখানে তার একটা নমুনা দেওয়া গেল—

সারস্বত মঠ
১৩।১।২৮

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের প্রেমলিপি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমাদের আগেই কি পত্র লেখা উচিৎ ছিল না? এবার বন্ধুত্ব পাকা হইয়া গিয়াছে—তবুও আগে চিঠি লিখিলে না কেন? আমি তো খুব রাগ

করিবার যোগাড় করিতেছিলাম। এমন সময় তোমাদের পত্র পাইয়া রাগে অনুরাগের সঞ্চার হইয়া পড়িল। যাক, বন্ধুটিকে ভুলিও না। তোমাদের মত আমারও দুধে দাঁত পড়িয়া যাইতেছে। আমরা এক-বয়সী বটে। কাজেই বন্ধুত্ব খুব ঘনীভূত হওয়া দরকার। আমার বলাই ভক্তটির কথা লেখ নাই কেন? তোমাদের দিদির (মেজো) পত্রও পাইয়াছি। এই পত্রেই কুশল জানাইলাম। সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবা। ইতি—

তোমাদের বন্ধু
ঠাকুর*

আবার গৃহকর্তার প্রৌঢ় ভাব স্বভাবতই সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর সহধর্মিণীর চিত্তে। রেঁধে-বেড়ে খাওয়ানো কেবল নয়—পরিপাটি সেবা সেই সঙ্গে শাসন ও পরিহাস সবই করতেন তিনি, তাঁর ভাবটি মূলত বাৎসল্যধর্মী। নিজের বিভিন্ন ভাব পরিবারবর্গের হৃদয়ে আহিত করে অশ্বিনীবাবু স্বয়ং থাকতেন দাসভাবে—কিন্তু নিপুণ দর্শক নিশ্চয়ই অনুভব করতেন মূল ভাবের উৎস তিনিই। তাঁর শুদ্ধাভক্তিই সখ্য দাস্য বাৎসল্যরতির ত্রিধা-লহরীতে তরঙ্গায়িত হচ্ছে ওই পরিবারে।

একদিনের একটা ঘটনা শুনেছি। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে রমনার বাড়িতে (সারস্বত কুঞ্জে) পুকুরে সাঁতারে নেমেছেন ঠাকুর। বেলা বারোটা বাজে, ওঠার নাম নাই কারও। ছেলে-মেয়েদের তো ঠাকুর যেন খেলার সাথী আর তিনিও তাই হয়ে গেছেন ওদের পাল্লায়

* একদিন স্বরূপানন্দজীর কাছে ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন 'আমি বালকের কাছে বালক, সাধুর কাছে সাধু, চোরের কাছে চোর, স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রীলোক। তাই সকলেই আমাকে তাদের একজন মনে করে।' তাঁর এই কথার প্রমাণস্বরূপ স্বরূপানন্দজী তাঁর দিনলিপিতে এই চিঠিখানার নকল রেখেছিলেন।

পড়ে। ওরা ছাড়বে না তাঁকে—তাঁরও গরজ নাই যে ওদের ছেড়ে জল থেকে উঠে আসবেন। সাঁতারের পাল্লা চলেছে—কে আগে পার হবে পুকুরটা, কে কতরকম সাঁতরাতে পারে। সাঁতারে মহা ওস্তাদ ঠাকুর—ওরাও কম যায় না কেউ। যতরকম দুষ্টামি চলেছে পুকুরের জল তোলপাড় করে। ওদিকে বার-বার ছেলে-মেয়েদের নাম ধরে ডেকে হয়রান অশ্বিনীবাবুর স্ত্রী ; তারা 'এই যাচ্ছি মা' 'এই এখনই উঠছি' বলে আর হেসে কুটিপাটি হয়—কারণ ও-বুলিটা ঠাকুরই শিখিয়ে দিয়েছেন। 'ভোগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব—আয় তোরা'। ঠাকুর বলে দেন 'বল্ উঠে পড়ছি আমরা'। তারপরও আধঘণ্টা যায় —কারও সাড়াশব্দ নাই দেখে গৃহিণী রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। 'কই রে তোরা ?' বলে হাঁক-ডাক করতেই কানে আসে সমবেত হাস্যরোল। ব্যাপার দেখে তাঁর চক্ষুস্থির, এখনও সব পুকুরে হুটো-পাটি চালিয়েছে, অ্যাঁ ? পুকুরপাড়ে এসে ছেলে-মেয়েদের উপরে চোখ গরম করেন মা—'ওঠ সব, আজ দেখাব মজা'। 'ও মা, ঠাকুর আমাদের উঠতে দেয়নি মা' তারা দোষটা চাপিয়ে দেয় ঠাকুরের ঘাড়ে। কথাটা নেহাত মিথ্যাও নয়, ঠাকুর নির্বিবাদে মেনে নেন সে দোষা-রোপ। 'পিটিয়ে ভূত ছাড়াব তোদের, ঠাকুর উঠতে দেননি! ঠাকুরকেই ছাড়ব নাকি ভেবেছিস্ ? আয় বলছি উঠে আয় এখনি'—বাগান থেকে একখানা বাখারি কুড়িয়ে নিয়ে রুদ্রমূর্তিতে তর্জন করেন তাদের জননী। তাঁর রুষ্ট ভাবাভিব্যক্তিতে মুখ শুকিয়ে যায় ছেলে-মেয়েদের—বয়স তের-চোদ্দর মধ্যেই, কাঁচা বুদ্ধি। মা বড্ড রেগেছে, সত্যি বুঝি পিঠে পড়বে দু'চার ঘা, ঠাকুরকেও লাগাবে নাকি ? সব-চেয়ে ছোট দু'জন চুপি চুপি বলে, 'ও ঠাকুর! ভীষণ চটে গেছে মা, কি হবে ?' ঠাকুর আড় চোখে মায়ের ভাবভঙ্গি দেখে নিয়ে হাসি

চেপে নিচু গলায় বলেন 'মাকে বল্ "তুমি লাঠি ফেল আগে, নইলে জল থেকে উঠছি না কেউ। বল মারবে না, তবে উঠব"।' সমস্বরে তাই ঘোষণা করে সকলে—মা লাঠি ঠুকে বলেন 'যত নষ্টের গোড়া ঠাকুর তুমি,—তা আর জানি না? আবার শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে দুষ্টবুদ্ধি। ওঠ এখনই, নইলে আজ রক্ষা রাখব না আমি।' ঠাকুরের পরামর্শমত তার সঙ্গীরা চেঁচিয়ে বলে 'ভয় করছে ঠাকুরের। যে বাঁশখান হাতে নিয়েছ যদি বসিয়ে দাও এক ঘা?' 'দেবই তো—কথা না শুনলে অমনি ছাড়ব না কি? কি ঠাকুর, উঠবেন আপনার চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে, না এবার জলে নেমে হিঁড় হিড় করে টেনে তুলব?' 'আরে না, না, এই তো উঠে পড়েছি—কি চেঁচামেচি করছ শুধু শুধু?' বলে ভালমানুষের মত ঘাটে উঠে পড়েন ঠাকুর, তার পিছনে আর সকলে। 'বাখারিটা রাখ বাপু—ওরা ভয়ে এগোতে পারছে না।' হেসে ফেলে বাখারিটা বাগানে ছুঁড়ে দিয়ে মা যান ঠাকুরের কাপড়-চোপড় আনতে। ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে নাচে ঠাকুরকে বেড়ে ধরে। 'কি মজা! কেমন খেপানো গেল মাকে অথচ মারতে পারল না এক ঘাও।'

এমনি নির্ম্মল সখ্য আরও অনেকের সঙ্গেই হয়তো ঠাকুরের ছিল—কিন্তু অশ্বিনীবাবুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতাটা আমি চাক্ষুষ করেছি বলেই বিস্তারিত লিখতে পারি। ঠাকুরের গৃহীভক্তদের মধ্যে মাত্র দুটি পরিবারের সঙ্গে আমাদের নিবিড় পরিচয়—এক অশ্বিনীবাবু, দ্বিতীয় হাওড়ার ফণীবাবু। পরিচয় ঠাকুরই ঘটিয়েছিলেন, নইলে ঘনিষ্ঠতা সম্ভব ছিল না। ওঁরা দুজনেই আমার দাদু—ওঁদের স্ত্রীরা আমার দুটি দিদিমা। এ সম্বন্ধও ঠাকুরই ঠিক করে দিয়েছিলেন। অশ্বিনীবাবুর গুরুভক্তি যে বাৎসল্যরতিতে উন্নীত হয়েছিল, আমাকে

তাঁর নাতনী পদবী দেওয়াতে সেইটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যত দিন ঠাকুর নীলাচল কুটিরে ছিলেন এই ভক্তপরিবারদুটির সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তা আমি দেখেছি। ফণীবাবুর কথা যথাকালে বলব—আগে অশ্বিনীবাবুর কথা বলে নিই।

'৩২ সালের ফাল্গুনে অশ্বিনীবাবু দুটি ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী ও একটি নাতনীকে নিয়ে কিছুদিনের জন্য পুরীতে আসেন আগেই বলেছি। তখন তিনি অসুস্থ। ঠাকুরের আমন্ত্রণেই সে-বার এসেছিলেন। মেয়েরা এসে মায়েদের সঙ্গে ভিতরবাড়িতে ঠাকুরসেবার কাজে লেগে পড়েছেন। অশ্বিনীবাবু বাইরের ঘরেই আছেন। হরিদাসদা নিত্য কর্মে ব্যস্ত—অশ্বিনীবাবুকে সম্ভাষণ করেছেন, বসতে দিয়েছেন। আর কিছু যে করতে হবে সে খেয়াল কারও হয়নি। স্বয়ং কর্তার কিন্তু ঠিক খেয়াল আছে। ভোগের সময় উপর থেকে নীচে নেমেই জিজ্ঞাসা করলেন 'অশ্বিনী কই?' বাইরের ঘরে শুনেই ভ্রূকুটি দেখা দিল মুখে 'অসুস্থ মানুষটা এতক্ষণ ওই বাইরের ছোট ঘরে গরমে বসে আছে? তোমরা তাকে ভিতরে এনে একটু শোয়া-বসার জায়গা দিতে পারনি?' ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায় সেবক-সেবিকাদের। এটা বলতে সাহস হয় না যে অন্য কারও বেলায় তো এতখানি ভাবনা দেখিনি, কি করে জানব এঁর বেলায় আলাদা ব্যবস্থা? না বললেও ঠাকুর বোধহয় বুঝলেন—মুখখানা কাল হয়ে উঠেছে রাগে-ক্ষোভে, চাপা গলাতেই বললেন 'অশ্বিনীর বাড়িতে গেলে সে আমায় রাজার হালে রাখে। কি করে আমায় একটু আরামে রাখবে কিসে আমার সুবিধা হবে—কেবল এই ভাবনা, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখে না। আর আমার বাড়িতে এসে এই ৩।৪ ঘণ্টা সে বাইরে বসে আছে? তোমাদের এটুকু আক্কেল নাই? সবই কি আমি বলে দেব তবে হবে? নিজেরা

মানুষ হবে কবে? সকলে আর অশ্বিনী কি এক? আর পাঁচজনের সঙ্গে তার তুলনা চলে না'—বলে কথা নাই বার্তা নাই নিজে টানাটানি লাগিয়ে দিলেন চেয়ার টেবিল চৌকি নিয়ে। পূবের ঘরখানা অর্থাৎ নীলাচল কুটিরের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরটি অশ্বিনীকে ছেড়ে দেবেন তিনি। তাড়াতাড়ি সকলে মিলে হাত লাগালেন। ঠাকুরকে ব্যস্ত হতে দেখে অশ্বিনীবাবুর স্ত্রী প্রবোধ দেন 'আপনি যান ঠাকুর ও-সব আমরাই করে নেব। উনি শুনলে কি ভাববেন?' না, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর ঠিক করে দিয়ে অশ্বিনীকে ডেকে এনে তবে ঠাকুর নিশ্চিন্ত। সে ভদ্রলোক সঙ্কোচে এতটুকু ঠাকুরের ভদ্রতা দেখে।

নীলাচল কুটিরের ইতিহাসে এ ঘটনাটা অভিনব—মায়েরা এজন্য কোনদিন এটা ভোলেননি। স্থায়িভাবে থাকা দূরে থাক—খুব কম গৃহস্থই কুটিরে দু'চার দিনের বেশী থাকতে পেয়েছেন। এখানে নিরালায় ঠাকুর আপন মনে শান্তিতে থাকতে চাইতেন। পুরীবাসের ইচ্ছা ভক্তদের অনেকেরই ছিল। কিন্তু নীলাচল কুটিরে থেকে পুরীবাস কারো ভাগ্যেই বড় ঘটেনি। যাঁরা দু'চার দিন থেকেছেন মুখে কিছু না বললেও তাঁদের অবিনয়ে মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন ঠাকুর, সেবক-সেবিকারা এইটাই জানতেন। এমন কি বস্তারের রাজাসাহেবও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু অশ্বিনীবাবুর কথা স্বতন্ত্র এবং ফণীবাবুর বেলাতেও তাই।

এত আদরের অশ্বিনী তাঁর—সে চলে গেল। বিয়োগ-ব্যথাটা যে কতখানি বেজেছে সেটা বোঝা গেল পরদিন যখন স্বামীশোক ভুলতে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে সদ্যবিধবা ছুটে এলেন ঠাকুরের কাছে, শুকনো মুখ সকলের, রুক্ষ বিনিদ্র মূর্তি। ঠাকুর মুখ ধুতে

বসেছিলেন—ম্লান গম্ভীর মুখ তাঁরও। 'ঠাকুর' বলে দিদিমা এসে দাঁড়াতেই তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে ফিরে বসলেন। বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে—হাতের কাজ থামিয়ে সকলেই আড়ষ্ট হয়ে আছেন। এখনি প্রিয়-বিচ্ছেদ-কাতর আত্মীয়দের বিলাপে কেঁপে উঠবে নীলা-চল কুটীর। কিন্তু এ কি? জলভরা চোখে পিতৃহীন ছেলে দুটিকে নিয়ে তাদের মা প্রণাম করতে যেতেই, তারা কাঁদবার আগে হা-হা করে কেঁদে উঠলেন ঠাকুর। দুই হাত বাড়িয়ে ছেলেদের বুকে চেপে ধরেছেন—থর থর করে কাঁপছে বিরাট দেহ—সে কী আকুল কান্না! সন্তান হারিয়ে মা বুঝি অমনি উচ্ছ্বসিত রোদনে ভেঙ্গে পড়ে। নিজের শোক ভুলে দিদিমা আস্তে আস্তে গায়ে পায়ে হাত বুলান ঠাকুরের, চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁরও কিন্তু মুখে বলছেন 'একি ঠাকুর? কোথায় তুমি আমাদের সান্ত্বনা দেবে তা না নিজেই কেঁদে সারা হলে? কার মুখ চেয়ে ধৈর্য ধরব তাহলে?' বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই চোখে জল আসে ঠাকুরের শোক দেখে। 'ভক্ত-শিষ্য হইতে আমার প্রিয় কে?'—এই কথাটাকে নিতান্তই তাঁর মুখের কথা ভাবা চলে না এরপর।

বন্যা হয়ে পুরীর রেল লাইন ভেঙ্গে যাওয়ায় ঠাকুর '৩৪ সালের ভাদ্র মাস অবধি পুরীতেই ছিলেন। এই বছর শ্রাবণ মাসেই বস্তারের ভূতপূর্ব রাজাসাহেব (প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও) নীলাচল কুটিরে এসে দীক্ষা নেন। আশ্বিন মাসে ঠাকুর ভ্রমণে বার হয়ে কলকাতা কৃষ্ণনগর দীঘলকান্দি ভাওয়াল আলিসাকান্দা স্থল বগুড়া ইত্যাদি ঘুরে আসাম মঠে উপস্থিত হন। সে-বার ভক্ত-সম্মিলনী ওইখানেই হয়েছিল। ঠাকুর ১৫ই পৌষ নীলাচল কুটিরে লিখছেন 'সম্মিলনী যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্ত্রী-

পুরুষে প্রায় দুইশত লোক আসিয়াছিল। আসামীরাও উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিল। শেষ দিন আসামী সভাপতি হইয়াছিল। জিনিষপত্র অসম্ভব রকম সংগ্রহ হইয়াছিল। কোন অভাব হয় নাই। কোনদিন কল্পনাতেও ভাবি নাই আসামে এরূপ ভাবে সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। সবই রাণীর* ইচ্ছা। আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছিল। পুরী গিয়া বিস্তারিত বলিব। আমি দ্বিতীয় দিন ট্রাষ্ট নিযুক্ত করিয়া মঠ ও আশ্রমগুলি তাহাদের দিয়া ফেলিয়াছি। অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধেও আলোচনা ও স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।'

ময়নামতী ও চট্টগ্রাম ঘুরে ফাল্গুন মাসে ঠাকুর পুরী ফিরেছিলেন সে-বার।

---

* আমাদের ঠাকুরাণী, জগদীশ্বরীকে ঠাকুর মহারাজ তাঁর পরিকরদের কাছে রাণী বলেই উল্লেখ করতেন।



বস্তারে শ্রীশ্রীঠাকুর

রাজা প্রফুল্লচন্দ্র

রাণী প্রফুল্লকুমারী

১৩৩৫ সালের বৈশাখে অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য ঠাকুর হালিসহরে আসেন। তারপর আবার পুরীতে গিয়ে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত থেকে ভাদ্রে গুরুধামের মহোৎসবে (ঝুলনপূর্ণিমা) যোগ দিতে আসেন। ২২শে ভাদ্র হাওড়া (ফণীবাবুর বাসা) হতে লিখছেন 'আজ যাওয়া হল না। এখানকার ভক্তরা কিছুতেই যাইতে দিল না। তাহাদের ইচ্ছা একমাস এখানে থাকিয়া বস্তার হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পুরী যাই। গাড়িভাড়ারও ব্যবস্থা হইতেছে। আমি অবশ্য মত দিই নাই। তাহাতে সকলেরই অসুবিধা। অথচ ভক্তদের অনেক টাকা খরচ হইয়া যাইবে। তবে যদি অগত্যা থাকিতে হয় পরে জানাইব। নতুবা সোমবার একাদশীর দিন রওনা হইয়া মঙ্গলবার প্রাতে পুরী পৌছিব।'

২৬শে ভাদ্রই পুরী চলে এসেছিলেন ঠাকুর। ২৯শে আশ্বিন তিনি বস্তার রওনা হন রাজা ও রাণীর একান্ত আগ্রহে। তাঁর সঙ্গে হরেনদা, প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ ও ফণীবাবু সঙ্গী ছিলেন। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-স্মৃতি ও শ্রুতি-স্মৃতিতে এই বস্তারযাত্রার বিবরণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা সবই লিপিবদ্ধ আছে। বড় হয়ে আমি দাদামশাইয়ের (ফণীবাবু) নিজের মুখে বস্তার-যাত্রার বর্ণনা শুনেছি—কি সুন্দর করেই যে বলতেন তিনি! আজও যেন কানে বাজে। ঠাকুর মহারাজকে বস্তারে নিয়ে গিয়ে রাজাসাহেব অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ফটো তুলেছিলেন। তার মধ্যে একখানি মাত্র বারিপদা সম্মিলনী উপলক্ষে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এসব ফটো বাইরে প্রকাশ না পায় যেন—ঠাকুরের এই আদেশ থাকাতেই রাজা-সাহেব শেষ পর্য্যন্ত ওগুলি অপ্রকাশিতই রেখেছিলেন। কয়েকখানা ফটো ঠাকুর আমাদের দেখিয়ে আবার রাজাসাহেবকে ফেরৎ দেন মনে আছে। ঠাকুর-মহারাজকে বস্তারে নিয়ে যাওয়ার পর রাণী প্রফুল্লকুমারী তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। দেহান্ত হওয়ার কিছু আগে ১৩৬৩ সালের আর্যদর্পণে -

রাজাসাহেব তাঁদের দীক্ষালাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরের অনেক কিছুই লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন।

বস্তার থেকে কলকাতা হয়ে কার্তিকের শেষে পুরী ফিরে ঠাকুর মহারাজ সম্ভবত মাসখানেক পুরীতে ছিলেন। উড়িষ্যার সুকৃতিশালী ভক্তদের অন্যতম ঈশ্বর সাহু, বালাজী রাজু ও দীনবন্ধু দেও এই তিনজন সেই সময় নীলাচল কুটিরে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা পান। অগ্রাণের শেষে ঠাকুর পুরী থেকে বেরিয়ে মধ্যবাংলা সারস্বত আশ্রমে সম্মিলনীতে যোগ দেন ও আসাম মঠে যান। মঠ থেকে আবার বাংলায় নানা জায়গায় ভ্রমণে যেতে হয়। ১৭ই ফাল্গুন ময়নামতী আশ্রম থেকে নীলাচল কুটিরে লেখা একখানি চিঠি উল্লেখযোগ্য—

"মঠে রাণী যে ভাবের নেশা লাগাইয়া দিয়াছিল তাহার ঘোরে বেশ আনন্দেই ছিলাম। রাস্তায়ও একদিন পর্যন্ত সে আনন্দ ছিল। কিন্তু ভক্তের বাড়ি আসার পর আবার সহজ অবস্থা ফিরে এসেছে। বাহিরটা নৈরাশ্যপূর্ণ ও বিরক্তিকর লাগিতেছে। কিছুই ভালো লাগে না। যাক্ আমি যে কয়দিন বাঁচিব এইরূপেই কাটিবে। আমার সবই আছে—অথচ সর্বসুখে বঞ্চিত হইয়া কেবল পরের বোঝা মাথায় করিয়া দিন কাটাইতেছি। * * * কোথায় গেলে কিভাবে থাকিলে যে শান্তি পাইব কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

চিঠিখানায় ঠাকুরের অন্ত্যলীলার ভাবটি পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। অনেক প্রবোধ দিয়ে অনেক ভুলিয়ে গারোহিলে মা যে দেওয়ানাকে সংসারে পাঠিয়েছিলেন, আবার সে বিবাগী হয়ে গেছে। হাতছানি দিয়ে মা-ই যেন ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন—ধূলাখেলা তাই ভাল লাগছে না আর। ছটফট করছে মন—বিরস, আলুনি বোধ হচ্ছে সব-কিছু। এর পরও সাত বছর ছিলেন ঠাকুর কিন্তু ওটা 'চক্রভ্রমি'

মাত্র—প্রারব্ধক্ষয়। তিরোভাবের ভূমিকা শুরু হয়েছিল ত্রিশ সালেই—যেদিন মঠ ছেড়ে চলে এসেছিলেন পুরীতে বিশ্রাম লাভের সংকল্প নিয়ে।

১০ই চৈত্র ঠাকুর ভ্রমণান্তে পুরী ফিরে এলেন। বার-চোদ্দ বছর আগেই ঠাকুরের মাঝে মাঝে বুকে একটা ব্যথা ধরতে আরম্ভ করেছিল। এ সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস্য কথা শুনেছি। কোনও প্রিয় শিষ্যের হৃৎপিণ্ডে এই রকম ব্যথা বা স্নায়ুশূলের প্রচণ্ড প্রকোপ ছিল। লোকান্তরিত হওয়ার পর সূক্ষ্মদেহেও সে-যন্ত্রণায় শিষ্যটি মুহ্যমান হয়ে আছে জেনে গুরুশক্তিতে আবিষ্ট ঠাকুর মহারাজ নিজ দেহে ওই ঘোর প্রারব্ধভোগের সংকল্প করেন। এ-ব্যথা সেই ব্যথাই—কোন ডাক্তারী ওষুধে তার উপশম হয় নাই। প্রথম প্রথম ব্যথাটা বছরে দু'একবার আক্রমণ করত, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ততই তার পীড়ন উগ্র হয়ে উঠতে লাগল। '৩৫ সালে ঠাকুর বারবার এই দারুণ হৃৎপিণ্ডের ব্যথায় আক্রান্ত হতে থাকেন। শেষে এমন হল যে বুকের একদিকে সব সময় একটা বেদনা লেগেই আছে।

ঠাকুরের চিঠির তৃতীয় খণ্ডের ৯৫ নং ও দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৮ নম্বরের চিঠিতে এই বুকের বেদনা ও অসুস্থতার উল্লেখ রয়েছে। চিঠি দুটির তারিখ যথাক্রমে ১৩৩৫ সালের ১৩ই ও ২৩শে চৈত্র। ওই চিঠিতেই জানতে পারি চৈত্রের শেষে ঠাকুর দার্জিলিঙ্ রওনা হবেন। রাজা ও রাণীসাহেবা বস্তার হতে কলকাতায় এসে ঠাকুরকে নিয়ে যাবেন ঠিক হয়েছিল। দার্জিলিঙে তাঁরা বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার ভার নিয়েছেন। ঠাকুরের শরীর অসুস্থ—গ্রীষ্মকালে দার্জিলিঙের মনোরম আবহাওয়ায় তাঁর দেহ হয়তো কিছুটা সুস্থ হবে এই হল রাজাসাহেবের যুক্তি। তিনি ও রাণী প্রফুল্লকুমারী এই সময় ঠাকুরের নিয়ত সাহচর্য কামনা করছিলেন। বস্তার যাওয়া ঠাকুরের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর—সেটা

ওই একবার যাওয়াতেই বোঝা গেছে। কলকাতায় গরম বেশি—কাজেই ঠাকুরকে নিয়ে রাজদম্পতীর দার্জিলিঙ্‌ যাত্রাই সবচেয়ে সঙ্গত মনে হল। ঠাকুরকে দু'তিন মাস ওখানে আটক রাখতে চান তাঁরা। কেন? তার কারণ, রাণী আসন্নপ্রসবা, তাঁর গর্ভে এসেছে বস্তার রাজবংশের বংশধর—হয়তো বা রাজ-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। রাণীর প্রথম সন্তান একটি মেয়ে, এবার স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কামনা কুলপ্রদীপ একটি পুত্রসন্তান। যদি সে কামনা সত্য হয়—রাজপুত্র যেন জন্মমুহূর্ত্তে গুরুর আশীর্বাদ পায়—তাই ঠাকুরকে সঙ্গের সাথী করা। রাণীর প্রসবকাল পর্যন্ত ঠাকুরমহারাজকে তাঁদের কাছে থাকতে হবে।

বস্তারের রাজদম্পতীকে ঠাকুর অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি সানন্দে অনুমোদন করলেন তাঁদের প্রস্তাব। রাজাসাহেব সেই সঙ্গে প্রস্তাব করলেন ঠাকুরের নিজস্ব সেবক-সেবিকারাও নীলাচল কুটির হতে দার্জিলিঙ্‌ যাবেন এবং এই কয় মাস ওখানে থাকবেন। ওঁরা সঙ্গে না থাকলে ঠাকুরের অসুবিধা হবে হয়তো—রাজবাড়ির দাসদাসীরা ঠাকুরসেবার কি জানে? বিধিবিড়ম্বনায় তাঁরা স্বামী-স্ত্রীও পদমর্যাদার বাধায় সব সময় নিজ হাতে ঠাকুরসেবার সৌভাগ্য পাবেন না। অতএব ব্রহ্মচারীদের একজন ও মায়েরাও চলুন দার্জিলিঙে। সব দিক বিবেচনা করে এ প্রস্তাবেও ঠাকুর সায় দিলেন।

নীলাচল কুটিরে তখন হরেনদার সহকারী আর একজন সেবক ছিলেন। কুটিরের ভার হরেনদাকে দিয়ে এই সেবকটিকে ও মায়েদের হাওড়ায় ফণীবাবুর বাসায় পাঠিয়ে দিতে বলে ঠাকুর আগে কলকাতা চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে হরেনদা এঁদের তুলে দিলেন পুরী এক্সপ্রেসে।

আমার বিচারে বলতে গেলে এইখানেই নীলাচল কুটিরের একটা পর্ব শেষ হল। এটি আমার শ্রুতিপর্ব—এতক্ষণ যা লিখলাম তা আমার কানে শোনা আর আর নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করা। কিন্তু বাংলা ১৩৩৬ সালের গোড়া থেকেই শুরু হল আমার স্মৃতি-চয়ন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

পিছন ফিরে চেয়ে মনে হয় মনটা যেন তার আগে একটা পর্দায় ঢাকা ছিল। বিচ্ছিন্ন দু'একটা বিশেষ ঘটনার দমকা হাওয়ায় চকিতে এক-আধবার পর্দাটা সরে গেছে, দুটো একটা ছবির রেখা আঁকা হয়েছে মনের পটে। কিন্তু এবার আর তা নয়। কোন্ নেপথ্য হতে সংকেত এল জানি না—কাল পর্দাটা একটানে কে সরিয়ে নিল যেন। অপার বিস্ময়ে আমি দু'চোখ মেলে চাইলাম জগতের দিকে। ছবির পর ছবির মিছিল চলল মনের আঙ্গিনায়। সবার পুরোভাগে এক বিরাট বর্ণাঢ্য আলেখ্য—রঙে রঙিন অপরূপ এক নিসর্গ চিত্র। সে-আলেখ্য দেবতাত্মা হিমালয়ের, সে-চিত্র রূপরম্যা শৈলসুতা দার্জিলিঙ্ নগরীর।

পুরীর বাড়িতে মনটা বুঝি গতানুগতিকতার চাকায় পাক খাচ্ছিল। খেলছি বেড়াচ্ছি খাচ্ছি ঘুমাচ্ছি—জ্ঞান হয়ে অবধি যে পরিমণ্ডল দেখছি তাতেই বড় হয়ে উঠছি ধীরে ধীরে। মনটাকে জাগাবার মত চমক লাগেনি কোন কিছুতে, তাই বুঝি স্মৃতি সেখানে আচ্ছন্ন, তন্দ্রালস। কিন্তু সেই যে জীবনে প্রথম ট্রেনে ওঠা—কি ভিড়, কত অচেনা মানুষ—চলন্ত ট্রেনের জানলা হতে ছুটে চলা দুনিয়ার দৃশ্য—স্টেশনের পর স্টেশন—আলোর মালা, আসছে আর মিলাচ্ছে—আধ-ঘুমে আধ-জাগরণে আমার শিশুমন নাড়া খেয়ে চমকে ওঠে বার বার। ভোরের আলোয় প্রকাণ্ড হাওড়া স্টেশন, আমরা ঘোড়ার গাড়িতে চলেছি···একটা নীচু হতে ক্রমেই

উঁচু জায়গায় চলেছে গাড়িগুলো……গাড়িও সব নূতন ধাঁচের। ওটা যে ব্যাক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজ আর ওসব যে ট্রাম বাস মোটর সেটা পরে জেনেছিলাম, কিন্তু চেনা হয়ে গিয়েছিল সেইবারই। যা দেখছি তার কোনটাই পূর্বপরিচিত নয়, আনকোরা নতুন বলেই মন ধরে রাখল তার স্মৃতি, সক্রিয় হয়ে উঠল স্মরণশক্তি। হাওড়ায় গিয়ে যাঁদের বাসায় উঠলাম তাঁদের চেহারাও আর ভুলিনি, যদিও এঁরাই যে ফণীবাবু সন্তোষ-মা ও তাঁদের ছেলেমেয়ে সেটা তখন ভাল করে বোধগম্য হয়নি। ওখান থেকে আবার মস্তবড় একটা গাড়ি—শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে দার্জিলিং মেল ধরা। রাত্রের কথা মনে নাই কিন্তু সকাল বেলা পাহাড়ের গা বেয়ে ছোট ট্রেনের সেই পাক খেয়ে খেয়ে ওঠা, ক্রমেই উঁচুতে উঠে যাচ্ছি আমরা—মা বললেন এইটাই হিমালয় পাহাড়—কুয়াশামাখা ঘন সবুজ বনানী—বড় বড় গাছ সোজা উঠে গেছে আকাশমুখী, পাইন দেবদারু সরল না ওক,…নাম জানিনা কিন্তু দেখে দেখে চোখ ফেরে না আর। আজও অক্ষয় হয়ে আছে সে-সব স্মৃতি।

ঠাকুরকে এর আগে কবে দেখেছি কবে চিনেছি আমার মনে পড়ে না। শুনেছি ছোটবেলায় প্রথম প্রথম ঠাকুরকে দেখলেই ভয়ে চিৎকার করে হামা টেনে পালাতাম। মায়েরা কোলে করে কাছে নিতে গেলে দুহাতে তাঁদের আঁকড়ে ধরে গায়ে মুখ গুঁজে চোখ বুজে তারস্বরে চেঁচাতাম। ঠাকুর দুঃখ পেয়ে বলতেন, 'আর সব ছোট বাচ্চা আমায় ছাড়তে চায় না, কোলে আসে খেলা করতে চায়—ও এমন করে কেন ?' কেন তা জানি না, বলতে পারি আমার দুর্ভাগ্য। মায়েদের অনুমান—দাড়ি-চুলে ঢাকা ঠাকুরের মূর্তি দেখে ভয় পেতাম, বেজায় ভীতু ছিলাম আমি। আমার সঙ্গে ভাব জমানোর জন্য রীতিমত ঘুষ দিতে হয়েছে ঠাকুরকে। এক-একবার ভ্রমণান্তে রাশি রাশি খেলনা পুতুল এনে সামনে

সাজিয়ে বসে আমায় ডাকতেন, তখন নাকি এক পা দু'পা করে কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম। সে-সব আমার মনেও পড়ে না, তাই স্পষ্ট বুঝতে পারি ঠাকুরকে এ-চেনাটা নেহাৎ স্বার্থের চেনা, খেলনা আদায়ের ফন্দীতে ভাব করা কেবল। অন্তরে দাগ কাটেনি এক বিন্দু।

আমার স্মৃতিতে ঠাকুর ধরা দিয়েছেন হিমালয়ের পটভূমিকায়। দার্জিলিঙ্ গিয়ে যেন তাঁকে ভাল করে দেখলাম, চিনলাম, বুঝি বা আত্মীয় বলে ভাল বাসতেও শুরু করলাম। তাঁর চলাফেরা কথাবার্তা আহার-বিহারের বৈশিষ্ট্য সেই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তারপর থেকে সব মনে আছে—ভুলিনি। অথচ এর আগে পর্যন্ত মনটা ফাঁকা—কারও স্থান নাই সেখানে কোন ছাপই পড়েনি। স্মৃতির এই প্রবোধনীকৃত্য সম্পন্ন করেছে নিশ্চয়ই দার্জিলিঙ্—সেখানকার পরিস্থিতির অভিনবত্ব। তাই '৩৬ সালের দার্জিলিঙ্ পর্ব আমার জীবনের মাহেন্দ্রলগ্ন, অমৃতযোগ। আমার বয়স তখন চার।

১৩৩৬ সাল—

দার্জিলিঙ্ যাবার পথে একদিন যেন প্রথম দেখলাম ঠাকুরকে। ছবিটা এইরকম। সামনা-সামনি তিনখানা ঘর, প্রতিটি ঘরের দরজা ঋজু ঋজু থাকায় এ ঘর থেকে ও ঘর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। প্যাণ্ট পরা গায়ে একটা ফ্রক এক খুকী গম্ভীর মুখে কতগুলো মশলা একাকার করছে বসে বসে। সে ঘরে অনেক জিনিস ছড়ান, খাবার জিনিসই বেশি। খুকী একটা থালায় সুপারি খয়ের ধনে মৌরী লবঙ্গ বড় এলাচ ছোট এলাচ সব মিশিয়ে গিন্নীপনা করছিল বসে বসে। হঠাৎ মনে হল কেউ দেখছে না তো? ফিরে চাইতেই দেখে যে-দরজার সামনে বসে অপকর্ম করছে

সে, তার পরের ঘরখানা খালি বটে কিন্তু তৃতীয় ঘরখানার দরজার সামনেই এ ঘরের দিকে মুখ করে ঘরের মধ্যে চেয়ার ও চৌকি পাতা—একজন বসে আছেন সেখানে। নীচের জলচৌকিতে তাঁর পা দুখানি রাখা, রাশি রাশি কাল কোঁকড়া চুলে দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ আরও যেন ঢাকা পড়েছে। মুখের দুপাশ ঢেকে কাঁধ বেয়ে বুকে এসে পড়েছে চুলের রাশ। সত্ত স্নান করে উঠেছেন দেখলেই বোঝা যায়। মা চুল মুছিয়ে দিচ্ছেন। তিনি অন্যমনা, গম্ভীর মুখে চেয়ে আছেন সামনের দিকে। দৃষ্টি যে অন্তরাবৃত্ত, চেয়ে থাকলেও কিছু দেখছেন না সেটা বোঝার বয়স তখনও হয়নি। কিন্তু কী যে দুরধিগম্য মহিমা একটি! উপরার্ধটি ঠিক নৃসিংহদেবের মত লাগছিল, আজ উপমাটা খুঁজে পেয়েছি!··· অবিকল সিংহগ্রীব, কেশর ঝাড়া দিলে কেশরীরাজকে ওই রকম লাগে। গাম্ভীর্যে ও ভয়ালতাতেও নৃসিংহতুল্য সে মূর্তি। দেখে প্রাণ চমকে উঠল খুকীর অর্থাৎ আমার। পিছন ফিরে খুঁজে দেখেছি সেই আমার প্রথম দেখা ঠাকুরকে। তার আগে কবে কোথায় কি ভাবে দেখেছি তাঁকে, স্পষ্ট কিছু মনে নাই। একটি দিনের একটা ভগ্নাংশ মাত্র মনে আছে, পরে বলব সে সব কথা। কিন্তু পুরাপুরি মনে ছায়া পড়া ওই প্রথম। মানুষটিকে অবশ্য এর আগেই চেনা হয়ে গেছে। জানি ওঁকেই মায়েরা বলেন ঠাকুর, আমি ডাকি বাবা। কিন্তু মনে আর কোনদিন দাগ পড়েনি তাঁকে দেখে। দার্জিলিঙের পথে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম তাঁকে, তার আগেই যদি তিনি চলে যেতেন পৃথিবী ছেড়ে, তাঁকে মনে থাকত না আমার। সেদিন যে দেখলাম, সেই মূর্তি প্রথম মুদ্রিত হল মনে। প্রথম তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণ করল আমার চিত্ত।

ভাবি, কেন? ভয়ে? অকাজ করতে করতে পিছন ফিরে হঠাৎ তাঁকে দেখে আঁতকে উঠেছিলাম। 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই

সন্ধ্যা হয়' এমনি অস্ফুট আতঙ্কে ত্রস্ত হয়েছিল চিত্ত। তাই কি সেদিনের সে-দেখা আর সে ভোলেনি? হতে পারে, বিচিত্র নয়। কারণ এটা ঠিক তাঁর সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আমার মনে যে অনুভূতি জেগেছিল তা অবিমিশ্র প্রীতি-ভক্তির নয়, অবিমিশ্র ভয়ের অনুভূতি। কি ক্ষতি তাতে? চিত্ত যতদিন শুদ্ধ না হয় ততদিন পরমদেবতাকে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' ভেবে সন্ত্রস্ত থাকলে অনেক অনর্থ হতেই বাঁচা যায় কিন্তু। জীবনের প্রতি কর্মে যদি রুদ্রের বামমূর্তি স্মরণ হয়, পাপের প্রবৃত্তিতে আপনিই মন্দা পড়ে।

দুয়ারের সামনা-সামনি বাবাকে দেখে বড় অস্বস্তি লাগল। সেরেছে রে! আবার মা-ও রয়েছে? দেবে এখনি দুই ধমক—এমন খেলাটা মাটি হয়ে যাবে গো! একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছি দরজার সামনে থেকে। বসে বসেই সরছি আর আলতো হাতে মশলার থালাটা টানছি —উদ্দেশ্য ঘরের একধারে আড়ালে চলে যাব। এমন সময় ঘরে এলেন আমার ছোটমা (অশ্বিনীবাবুর মেজ মেয়ে শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাশগুপ্তা— তাঁকে ছোটমা ডাকতে শিখিয়েছিলেন মায়েরা। ঠাকুরের সমর্থন ছিল তাতে)। 'এই ছোটমা দরজার পর্দাটা টেনে দাও না!' 'কেন, কি দরকার আপনার?' প্রথমটা আমার কুকীর্তি তিনি লক্ষ্য করেননি। ভেবেছেন মশলা নাড়াচাড়া করছি শুধু। সব যে মিশিয়ে সাড়ে বত্রিশ ভাজা করা হয়েছে দেখেননি, সুতরাং দরজা দেবার প্রয়োজনটা কি হল ধরতে পারলেন না। আমি ভ্রূভঙ্গে অনুজ্ঞা করি 'আঃ দাওনা টেনে। আমি যে মশলা সব নষ্ট করছি বসে বসে! বাবা মা দেখে ফেলবে না?' চার বছরের মেয়ের বজ্জাতি বুদ্ধি দেখে চক্ষু স্থির ছোটমার—'তবে রে দুষ্টু! আমি দেখছি যে, ওরা নাই দেখুক?' 'তুমি দেখলে কিছু হবে না।' এর পর তিনি পর্দা টেনে দিয়ে আমার সৎকার্যের সহায়তা

করেছিলেন না অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন হাতে-নাতে তা আর মনে নাই। কিন্তু কথাটা বাবার কানে উঠেছিল জানি। শুনে তাঁর কি মনে হয়েছিল বেশ বুঝতে পারি। নিশ্চয় ভেবেছিলেন ভয়টাও যদি পাকা হত চিন্তা ছিল না। পর্দার আড়ালে গেলেই যাদের ভয় ঘুচে যায় তাদের নিয়ে করব কি?

মায়েদের কাছে শুনেছি মঠে থাকতে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে কঠিন তিরস্কার সইতে হত তাঁর কাছে। তাঁরা ক্ষুণ্ণমনে ভাবতেন একটু-খানিতেই ঠাকুর এত ক্ষেপে উঠেন কেন? শাস্তির মাত্রা বেশি হওয়ায় রাগও হত মাত্রাছাড়া—তখন একেক সময় ঠাকুরকে রাক্ষস দানব হৃদয়হীন অমানুষও ভাবতেন অন্তেবাসীরা। এ-অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছে। অতি তুচ্ছ কারণে এত ক্ষুব্ধ হতেও পারতেন! কখনও ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখ কখনও বা বিষণ্ণ-গম্ভীর—দেখে আক্ষেপের সীমা থাকত না আমার শিশুমনে। কেবল ভাবতাম, কি এমন করেছি বাপু যে ওরকম হাঁড়িমুখ করে আছেন? এরকম যেন কেউ আর করে না কখনও! রাগটা পড়ে নিজের মন শান্ত হলে সময় সময় বড় দুঃখও হত। দৈন্যভরে ভাবতাম, ছিঃ আমি কী খারাপ! বাবার এই এত শিষ্যভক্তের ছোট ছোট বাচ্চারা সব আসে, সবাই কেমন ভাল! কাউকে তো বকেন না বাবা। আমি সকলের চেয়ে মন্দ বুঝি—নইলে এত রেগে যান কেন আমার উপর? কথায় কথায় এত উপদেশ?

ঠাকুরের রাগ-বিরক্তির অর্থ আজ প্রাঞ্জল হয়েছে। ধূম দেখলেই যেমন বহ্নি অনুমিত হয় তেমনি যৎসামান্য একেকটা অসঙ্গতিতে তাঁর পদাশ্রিতদের মনের ভিতরটা তিনি পরিষ্কার দেখতে পেতেন। আর ইচ্ছা হত ঘাড় ধরে ওর দুষ্কৃতিপরায়ণ মনটাকে টেনে আনি আমার পায়ের তলায়। এরই বহিঃপ্রকাশ তাঁর রুষ্ট তিরস্কার ঘোর বিরক্তি

বিষাদ ক্ষোভ ও মনঃপীড়া। বাইরে থেকে অপরাধটা দেখতে ছোট হলে কি হবে, তার ব্যঞ্জনাটা ছোট ঠেক্‌ত না তাঁর চোখে। স্থতরাং তাঁর বিচারে লঘুপাপে গুরুদণ্ড নয়—গুরুপাপের লঘুদণ্ডই করতেন তিনি। একখানা চিঠিতে দেখছি—'তোমাদের এই জন্ম-জন্মান্তরসঞ্চিত কর্মরাশির ভিতর হইতে কি প্রকারে ত্যাগের পবিত্র পথে উন্নীত করিব ভাবিয়া আকুল হই। তদুপরি তোমাদের অত্যাচার!' (৮৩নং চিঠি, প্রথম খণ্ড)

মানুষ হিসাবে বিচার করলে ঠাকুরের অনেক দোষ অনেক অশোভন আচরণ অবশ্যই চোখে পড়ত—ভক্তিবশত মুখে স্বীকার না করলেও বহুজনেরই পড়েছে নিঃসংশয়ে জানি। কিন্তু তিনি তো সব সময় সাধারণ মানুষ থাকতেন না! স্বরূপে তিনি গুরু—যখনই সেই ভাবে আবিষ্ট হ'ত চিত্ত, তিনি মানববুদ্ধির এলাকা ছাড়িয়ে যেতেন। আমাদের শাসন ও উপদেশ দেবার বেলায় এমনি অমানব ভূমিতে আরূঢ় হয়েই দিতেন। সেসময় তাঁর যেসব আচরণ, তা অজ্ঞদের কথা দূরে থাক, বিজ্ঞদের কাছেও দুর্বোধ্য। বাইরের বিচারে ঠাকুরকে তাঁদের তখন অপদার্থ ভাবা হয়তো বিচিত্র নয়। দু'একজন বিশিষ্ট শিষ্য-ভক্ত এ নিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রতিবাদও জানিয়েছেন। তাঁর কিন্তু কিছুই আসে-যায়নি তাতে। কে তাঁকে কি ভাবল না ভাবল সেদিকে একটুও খেয়াল না রেখে যাতে যার মঙ্গল হবে বলে বুঝতেন, তার সম্বন্ধে তেমনি আচরণই তিনি করতেন। পরমহংসদেব ব্যঙ্গ করে বলতেন 'শালারা সব ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ দেখে!' দেখলেই বা ঈশ্বরের কি? তাঁর জগৎচক্র কারও মুখ চেয়ে ঘোরে না, ঘোরে ঋতের বিধানে। পরমহংস নিগমানন্দের সমগ্র জীবনও ওই ঋতচ্ছন্দে শাসিত বলেই বিশ্বাস করি। তোমার-আমার সুখে দুঃখে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে গুরুভাবে সবার মঙ্গলবিধান

করতে চেয়েছিলেন তিনি—এর মধ্যে ফাঁকি ছিল না এতটুকু। সে-কাজটি করতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁকে তথাকথিত ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘনও হয়তো করতে হয়েছে। আমাদের তাতে বড় আপত্তি। মনে মনে বলেছি এটা কি ঠাকুরের যোগ্য কাজ হল? কখনও ভেবেছি এ বাড়াবাড়ি, কখনও বা অমানুষের আচরণ। কিন্তু আজ একটা কথা দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে—তিনি যাই-ই কেননা করে থাকুন, তার একটিই উদ্দেশ্য ছিল আশ্রিতদের হিতসাধন, তাদের অধ্যাত্ম উন্নতি। তাঁর সকল কর্মের এ তাৎপর্য যে না বুঝেছে সে তাঁকে বুঝবে কেমন করে?

সত্যের সংজ্ঞার্থ যদি হয় 'ভূতহিতে প্রোক্তম্' তাহলে কখনও কখনও মিথ্যাও সত্যের মর্যাদা পেতে পারে। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের সেই আখ্যান—মুনির একটি মিথ্যা কথা যেক্ষেত্রে তাঁর শরণাপন্ন কয়েকটি প্রাণকে বাঁচাতে পারত তাঁর জীবনব্যাপী তপস্যার বিনিময়ে, ভগবান বলছেন সেক্ষেত্রে মুনির মিথ্যাই পেত সত্যের মর্যাদা। বিশ্ববিধাতা জগদ্ব্যাপারে তাঁর এই বিজ্ঞানদৃষ্টিই প্রয়োগ করেন—কর্ম নয় তিনি দেখেন তার উদ্দেশ্য।

আমি যেসব ঘটনা বলে যাব তার ভূমিকাস্বরূপ এ কথাগুলো মনে রাখা দরকার। তা নইলে ঠাকুরকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা। খুব কাছে থেকে দেখেছি তাঁকে। তাঁর ছোট ছোট আনন্দ বেদনা রাগ দুঃখের বিবরণ দিতে বসেছি কিন্তু ভয়, সেসব পড়ে কেউ না আবার শিব গড়তে অন্য কিছু গড়ে বসে মনে-মনে। অতএব সাধু সাবধান!

পথের যে-ঘটনাটা বললাম ওটা ঘুম স্টেশনে—বড় হয়ে শুনেছি। রাজাসাহেব বাবাকে আগেই নিয়ে এসেছিলেন। কার্সিয়াং না কালিম্পং ঘুরিয়ে মোটরে করে তাঁকে দার্জিলিঙে নিয়ে আসা হয়। আমরা

হাওড়া হতে দার্জিলিং মেলে চড়েছিলাম। পথে ঘুম স্টেশনে উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ হল। সেখান থেকে আমরাও মোটরেই এলাম দার্জিলিঙে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্ত্যলীলায় এই দার্জিলিঙ্ পর্বের বিশেষ গুরুত্ব আছে। একে বলতে পারি তাঁর জীবন-নাট্যের একটি বিষ্কম্ভক (Interlude)।

Moss Bank—Darjeeling.

দার্জিলিঙে ঠাকুরকে প্রায় মাসতিনেক ধরে রাখতে চেয়েছিলেন রাজাসাহেব। মস্ত বড় একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন এজন্য। তার নাম ছিল ওই। বাংলায় কি হবে? শৈবাল নিলয় না-কি? আমার মনে মস্ ব্যাঙ্কের ফটো ধরা আছে। এখনও যদি সে-বাড়ি থেকে থাকে দেখলে বুঝি চিনতে পারব।

রাস্তা থেকে বেশ উঁচু একটা টিলার উপর বাড়িখানা। ওখানকার অনেক বাড়িই তাই। উঁচু-নীচু একেক টিলায় একেক খানা বাড়ি। সদর গেট থেকে পাহাড়ের চড়াইয়ের মত ভয়াবহ এক রাস্তা উঠে গেছে মস্ ব্যাঙ্কের সামনে। সুরকি ফেলা সে রাস্তা রাজাসাহেবের গুর্খা সান্ত্রীরা ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করত না। মস্ ব্যাঙ্কের সামনে খোলা চত্বরের মত খানিকটা জায়গা। রাস্তার দিকটা রেলিং দিয়ে ঘেরা। ডানদিকে নেমে গেছে ওই উৎরাই। গিয়ে মিশেছে নীচের পিচ ঢালা সড়কের সঙ্গে। প্রথম দিনই সে-উৎরাইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, বসে একবার গা ছেড়ে দিলে বেশ গড়গড়িয়ে নীচে যাওয়া যায় হাঁটতে হয় না। কিন্তু যে খোয়া ছড়ানো! উঃ গা ছড়ে ঘা হয়ে যাবে। তাছাড়া উঠবই বা কি করে। নীচ থেকে যেরকম খাড়া হয়ে উঠেছে। একবার চটিপরা পা বাড়িয়ে দিলাম সন্তর্পণে। সড়াৎ করে পা পিছলাবার উপক্রম, অমনি মাগো!

মস্ ব্যাঙ্কের বর্ণনা দিই এবার। সেটা কোন সাহেবের বাড়িই ছিল হয়তো। ঢুকতেই হলঘর একটা, চারদিকে তার কাচের জানালা। সব ঘরেই French window, গরাদে-বিহীন বড় বড় কাচের জানালা। ঘরগুলিতে কাঠের মেঝে কাঠের দেয়াল; প্রতি ঘরে অগ্নিকুণ্ড (Fire place)। বাড়িটা আগাগোড়া বিলাতী কায়দায় সাজানো। হলঘরের দু' পাশে দুখানা ঘর—সবচেয়ে বেশি আলো ওই ঘর দুটিতে কারণ ঘরগুলির সামনেটা ফাঁকা। তাছাড়া জানালা কাচের তো বটেই, দরজাও কাচের। বাড়িতে ঢুকতে এরই বাঁ পাশের ঘরখানা ঠাকুরের আর ডান পাশেরটা হ'ল রাজাসাহেবের সেক্রেটারী নীলকান্ত যোশীর। নিজের ঘরে ঢুকেই মুগ্ধ চোখে দেবতাত্মাকে দর্শন করতে লাগলেন ঠাকুর—মায়েদের ডেকে দেখালেন। আমিও দেখছি হাঁ করে। ওই ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে হিমবান শৈলশ্রেণী। পূবের আকাশ জুড়ে মেঘমালার মত দিগ্বলয় আচ্ছন্ন করে মাথা তুলেছে অগণিত তুষারশিখর। দেখার জিনিস সত্যই। প্রশ্ন করার আগেই পরিচয় পেয়ে গেছি ওই হিমালয়। আঙুল তুলে ঠাকুর দেখালেন ওর নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা আর বহু দূরে কুয়াশায় আচ্ছন্ন প্রায় সুউচ্চ একটি চূড়ার আভাস—ওরই নাম গৌরীশংকর, পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ। মেঘে ঢাকা চারিদিক, কন্‌কনে হাওয়া বইছে হু হু করে। তারই মধ্যে প্রায় আধঘণ্টা জানালা খুলে মগ্ন হয়ে ঠাকুর সেই দিকে চেয়ে রইলেন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে সরে গেছেন আর সবাই, তাঁর দৃক্‌পাত নাই। গায়ে একটা চাদর জড়ানো সোয়েটারের উপর, জানালার চৌকাঠে দুদিকে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন তো আছেনই। 'ও ঠাকুর! সরে আসুন এবার। ঠাণ্ডা লেগে যাবে বুকে। না হয় অলস্টারটা গায়ে দিয়েই দাঁড়ান'——মায়েরা সতর্ক করতে তবে সম্বিৎ ফেরে। 'ও তাই তো' বলে

জানলা বন্ধ করে বিছানায় এসেই কম্বল মুড়ি দিলেন—দেহবোধ ফিরতেই শীতে কাঁপুনি ধরেছে ভদ্রলোকের। এমনি করে অসুখ বাধাতেন মাঝে-মাঝে। এত ভাবুক আর দেহজ্ঞানশূন্য মানুষ খুব কম দেখেছি জীবনে। অনুমানে বুঝি মহামানবদের প্রকৃতি ওটি। বিছানায় বসে শীতে কাঁপতে কাঁপতেও—কম্পাসের কাঁটা যেমন উত্তরমুখী থাকে তাঁর দৃষ্টি তেমনি লগ্ন রইল হিমাচলে। পুরীতে যেমন যতক্ষণ থাকতেন দোতলায়, দৃষ্টি লগ্ন থাকত রত্নাকর নীলাম্বুধিতে!

দার্জিলিঙের বাড়িটায় জঘন্য হ'ল রান্নাবাড়ি আর শৌচাগারের দিকটা —কাদা জল নোংরা আবর্জনার স্তূপ একেবারে। ওটা বাড়ির পিছন দিক সুতরাং চোখে পড়ে না, সৌন্দর্যের হানি ঘটে না বাড়ির। কিন্তু বিপদ এই যে ওই পিছনটাই ছিল চলাফেরার পথ। সামনে দিয়ে সেই সুরকিফেলা চড়াই-উৎরাইয়ের রাস্তায় ওঠা-নামা করা সমতলবাসীদের পক্ষে অসাধ্য। রাজবাড়ির সবাইকে আমাদের এমন কি ঠাকুরকে শুদ্ধ বাইরে যেতে হলে ওই জল কাদা নোংরা মাড়িয়েই যেতে হত। সেই কুদৃশ্যটা আজও চোখে ভাসে। বুঝতে পারি নোংরামিটা ভারতবাসীর ধাতস্থ হয়ে গেছে। বাড়ির ওদিকটা চাকরবাকরদের থাকার জায়গা out-house—বাড়ির বিদেশী মালিক সেজন্য কোন যত্ন নেননি ওদিকটার। যারা থাকত ওদিকে, তারাও তেমনি শূয়োর-গরুর মত কাদা-জল-ময়লায় থাকতে অভ্যস্ত। কাজেই দিনে দিনে ওদিকটা নরক হয়ে উঠেছে।

পুরী থেকে মা সরযু-মা প্রিয়ব্রত ব্রহ্মচারী ও আমি এসেছিলাম দার্জিলিঙের যাত্রী হয়ে। পথে হাওড়া থেকে সঙ্গী করা হ'ল ছোট-মাকে। মস্ ব্যাঙ্কে হলঘরের দুপাশে দুখানা ঘর আগেই বলেছি। হলের পরেই একটা করিডর—বাড়ির মধ্যে যাওয়ার টানা পথ। তার

দুপাশে ঘর,—প্রথমেই সামনা-সামনি যে দুখানা ঘর তারই বাঁ পাশের ঘরে অর্থাৎ ঠাকুর মহারাজের ঘরের গায়েই যেখানা, তাতে আমরা স্থান পেয়েছি। আমাদের ঘরের বিপরীত দিকের ঘরখানায় রয়েছেন প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও সাহেবের পিতৃদেব। এরপর করিডরের দুই প্রান্তের পর পর ঘরগুলিতে রাজাসাহেব রাণীসাহেবা রাজাসাহেবের মা এবং তাঁদের অনুচরবর্গ।

ঠাকুরভোগ ও আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা প্রথমটায় রাজবাড়িতে হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন পরেই অন্য ব্যবস্থা করতে হ'ল বাধ্য হয়ে। রাজ-সূপকারদের রন্ধন এমনই রাজকীয় যে আমাদের কারও পেটে তা সইবার কথা নয়। দুদিনেই প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে লাগল। রাজাসাহেবের এ আশংকা ছিলই। পুরী থেকে মায়েদের ও একজন সেবককে আনার কথা তিনিই বলেছিলেন এজন্য। তা নইলে ঠাকুরের কষ্ট হবে তিনি অনুমান করেছিলেন। এবার তাড়াতাড়ি আলাদা পাকের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু ব্যবস্থা হল কোথায়? ভিতরবাড়িতে বাড়তি রান্নাঘর নাই। পিছন দিকের সেই নোংরা যাচ্ছেতাই জায়গাটাতেই out house-এর দুটো ঘর পরিষ্কার করে ভোগ-রান্নার আয়োজন করলেন মায়েরা। রাজাসাহেব খুব কিন্তু কিন্তু করতে লাগলেন; অথচ মায়েরা যাওয়া আসা করবেন, জলের সুবিধা থাকবে, দরকার মত বাজারে চলে যাওয়া যাবে, সব মিলিয়ে এরকম কোন জায়গা ভিতর-বাড়িতে দেওয়ার উপায় ছিল না। ওই বাহির-বাড়ির আস্তাকুড়েই বরং এসব ছিল। জায়গাটা চোখে দেখেও ঠাকুর কিন্তু কিছুই বললেন না। কি বলবেন? রাজাসাহেব ইচ্ছা করে তো আর ওখানে ব্যবস্থা করে দেননি, দিচ্ছেন নিরুপায় হয়ে। তার উপরে কিছু বলার মত অভদ্রতা ঠাকুর করবেন কেন? ঠাকুর হওয়ার সুখটা সকলেই জানে।

কিন্তু সুকুমারদেহ চির-সুখোচিত রুচিমান একটি মানুষকে শিষ্যভক্তদের খাতিরে কত দুঃখ যে নীরবে সইতে হত তার সাক্ষী এই আমরা দু'চারজন। তাঁর দুর্দশা দেখে আমার তো ঠাকুর হওয়া সম্বন্ধে আতংক জন্মে গেছে। কি সুখে ঠাকুর হয় মানুষ কে জানে? আমার ঠাকুর যেন আর কোনদিন অমন ঠাকুরালী করতে না আসে!

দিন যায়। রাজপরিবারের সকলকেই সেবার দেখেছিলাম— রাজাসাহেবের মা-বাবা রাণী প্রফুল্লকুমারী। রাজাসাহেবকে পরে অনেকেই দেখেছেন তাঁর কথা বলব না। কিন্তু বস্তার রাজ্যের ভূতপূর্বা রাণী (মহারাজ প্রবীরচন্দ্র ও বিজয়চন্দ্রের জননী)-সাহেবা প্রফুল্লকুমারীকে ঠাকুরের খুব কম ভক্ত-শিষ্যই দেখেছেন। দেখবার মতই অপরূপ রূপসী ছিলেন তিনি। এমন নিখুঁত সুন্দরী আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সত্যই রাণী সে মেয়ে—রং গঠন মুখের ডৌল সবই যে কি সুন্দর ছিল তাঁর বলে বোঝান যাবে না। তাঁকে দেখলেই ওইটুকু মেয়ে আমিও হাঁ করে চেয়ে থাকতাম—ভুলে যেতাম চোখ ফেরাতে। রাজবাড়িতে ইউরোপীয় অভ্যাগত আসত প্রায়ই। সেইসব বিদেশীরাও এই ভারতীয় মহিলার অনবদ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারত না কতদিন দেখেছি। একদিন এলোচুলে দেখলাম রাণীকে—ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কুন্তলভার যাকে বলে। সবচেয়ে মনে আছে তাঁর চোখদুটি। পদ্মপাপড়ির মত টানা টানা দুটি নীল চোখে মায়াঞ্জন মাখানো স্বপ্নালস চাহনী যেন! সে চাহনী দেখলে মনে হত বুঝি মর্ত্যের মানবী নয় ও মেয়ে, কোন সুদূরের অপ্সরী শাপভ্রষ্টা দেববালা। আর সত্যই তাই ছিলেন প্রফুল্লকুমারী। রাজাসাহেবের পরিচয় এখন অনেকেই জেনে গেছেন। শুনেছি জন্মান্তর-পরিচয়ে রাণী তাঁর মতন সে রকম কোন রাজকুলের

মেয়ে নন, তাঁর পরিচয় আরও অসামান্য। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সাধনশক্তিসম্পন্না যোগিনী, দেবী অংশে জন্মেছিলেন প্রারব্ধ ক্ষয়ের উদ্দেশ্যে।

রাণী যখন-তখন 'বাবা' বলে ডেকে ঠাকুরের কাছে আসতেন; ইস্ আমার যা হিংসা হত তখন সে আমিই জানি। কয়েকদিন পর বলে বসলাম 'রাণী কেন অত তোমার কাছে আসে বাবা? অত গল্প করে কেন?' হেসে ফেলে তিনি বললেন 'আসবে না? তুমি যেমন আমার মেয়ে, ও-ও যে তাই।' 'না তো, তুমি কি ওর বাবা?' কূট প্রশ্ন বটে। পিতাঠাকুর স্মিতমুখে বললেন 'ওর বাবা নই তো ও বাবা বলে ডাকে কেন?' 'তুমি ওদের ঠাকুর তাই ডাকে। সত্যি সত্যি বাবা তো নও। সে তো মরে গেছে বন্যারে……।' কন্যার খবর-সংগ্রহের বহর দেখে প্রায় হতবাক্ ঠাকুর বললেন 'এসব কে বলল তোকে?' 'কেন যোশী বলেছে। রাজার বাবা বলে।' আগেই বলেছি ঠাকুরের ঘরের পাশেই ছিল আমাদের ঘর। দুই ঘরের মাঝখানে মস্ত এক কাচের জানালা, সেটা খোলাই থাকত সব সময়। আমি শাখামৃগের মত সেই বাতায়ন-পথেই এ-ঘর ও-ঘর করতাম; দরজা দিয়ে ঘুরে আসার আয়াস স্বীকার করে কোন্ মূর্খ? এখন আমাদের আলাপ শুনে সেই জানালায় মায়েদের কেউ এসে দাঁড়ালেন— 'ও কি একদণ্ড ঘরে থাকে ঠাকুর? হয় বাইরের ওই গুর্খাদের সঙ্গে টহল ফিরছে নয়তো যোশী কিংবা বুড়ার ঘরে গিয়ে বক্‌বক্ করছে। রাত্রেও ডেকে ঘরে আনতে পারি না সহজে।' আমি নিরঙ্কুশ, জোর দিয়ে বলি 'না, আমি যাব গল্প করব। দিনরাত কেন ঘরে বসে থাকব ভূতের মত? তুমিও তো রাণীর সঙ্গে গল্প কর!' 'আমি গল্প করি কে বলল তোকে? উপদেশ দিই রাণীকে সৎশিক্ষা দিই—।' 'না দেবে

না। কেন দাও?' 'তুই-ই তো বললি আমি ওদের ঠাকুর, তাই দিই।' এবার দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম তাঁকে 'না, তুমি ঠাকুর হবে না বাবা।' গুরু করুণ হেসে বললেন 'আমি যে গুরুগিরি ছাড়া আর কিছু জানি না মা! তবে ঠাকুর না হয়ে কি করব?' 'কেন তুমি গুরু হলে? না, ও ভাল না।' প্যাঁচার মত মুখ করি আমি। ভারি বিরক্তি প্রকাশ পায় কথাটায়।

এতটা সাহস হওয়ার হেতু ছিল। দু'তিন দিন দেখেছি বাবা হয়তো খেয়ে উঠে বিশ্রাম করছেন অথবা শুয়েছেন একটু, এমন সময় 'বাবা' বলে ডেকে কাঁদ কাঁদ মুখে রাণীর প্রবেশ এবং ঝাড়া দু'ঘণ্টা বকবকানি। বয়সে ছেলেমানুষই ছিলেন প্রফুল্লকুমারী—বালিকার সারল্যে একটু কিছু হলেই 'বাবা' বলে ঠাকুরের কাছে আসাটায় তিনি দোষের কিছু দেখেননি। ঠাকুরও তাঁর এই দাবীকে সস্নেহে প্রশ্রয় না দিয়ে পারতেন না। আমি নিজে ভাল-মন্দ না বুঝলেও মায়েদের কথোপকথনে কিন্তু জেনেছিলাম দাম্পত্য-কলহের মীমাংসা করতে এসে রাণী ঠাকুরের বিশ্রাম-সুখটির দফা রফা করে গেলেন। সামান্য কারণেই মনোমালিন্য হত তরুণ দম্পতীর আর তাঁরা দুজনেই একের পর এক এসে সালিশী মানতেন ঠাকুরকে। সে এক কাণ্ড। দার্জিলিংয়ে কয়েকদিন ছাড়াই এমনি ঘটত। রাণী বেরিয়ে যাবার পরক্ষণেই রাজাসাহেব এসে ঢুকলেন 'ঠাকুর আপনি বলুন আমার কি দোষ?' ঠাকুরকে হাসিমুখে সান্ত্বনা দিতে হয় উভয় পক্ষকে। সেবক-সেবিকাদের ওদিকে বিরক্তির সীমা থাকে না। তাঁদের বিরক্তি আর আমার ঈর্ষা দুইয়ে মিলে ওই মনোভাবটির উৎপত্তি যে বাবা ওদের ঠাকুর না হলে তো রাণী আর অমন করে যখন-তখন এসে তাঁকে দখল করত না। তার

ঠাকুর হওয়ায় আমার এ আপত্তিটা ঠাকুরের খুব মনে লেগেছিল পরে জেনেছি সে কথা।

দার্জিলিঙ্ গিয়ে দিল খুলে গিয়েছিল আমার বারবারই বলেছি। ওখানে গিয়ে যেমন দুরন্ত তেমনি বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম। কখন যে ঠাকুরসম্পর্কে আতংকটা খসে গিয়ে অকুণ্ঠ দাবী জন্মেছে তাঁর উপরে নিজেই জানি না। যে-আমি কেবল পালিয়ে বেড়াতাম তাঁকে দেখলে এবার সেই আমার অবাধ মেলামেশায় ঠাকুরও নিশ্চয়ই খুশী হয়েছিলেন। হাসি-খুশী প্রাণোচ্ছল ছোট ছেলে-মেয়ের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগত। সহজ আনন্দে শিশুদের সঙ্গে খোলা মনে মিশতেন আনন্দময়। মঠে প্রথম দিকে যাঁরা ছিলেন তাঁরা দেখেছিলেন সেই শিশু ভোলানাথকে। সুতরাং দার্জিলিঙ্ এসে অবধি একাদশে বৃহস্পতি লেগেছে আমার। আমি যেমন তাঁর গায়েপড়া হয়েছি, তিনিও তেমনি অবাধ প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। কোনও বাঁদরামিতেই পারতপক্ষে কিছু বলেন না। দেখে-শুনে আর কি, আমি হয়ে গেছি একজন! অমনি ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আদি ও অকৃত্রিম পশুত্ব। অঘটন ঘটালাম একদিন।

সকালে একদিন ঠাকুরের জলযোগের আয়োজন হচ্ছে। দারুণ শীত পড়েছে সেদিন। রোজই ঠাণ্ডা, সেদিন আবার মাত্রাতিরিক্ত মেঘ ও বৃষ্টি। জানালা খোলার উপায় নাই। খোলা মাত্র ঘরে ধোঁয়ার মত এসে ঢুকছে মেঘের কুণ্ডলী, ঘর-দুয়ার সব ভিজে একশা। জল এত ঠাণ্ডা যে হাত দিলে হাতখানা ঝন্ঝন্ করে বেঁকে যায় যেন। মায়েরা ঠিক করেছেন ঢাকাই পরটা আর আলু-চচ্চড়ি করে আজ খাওয়াব ঠাকুরকে। দুপুরে রান্না হতে দেরী হবেই। এই মেঘ কুয়াশা না সরলে বাজার হবে কি করে? এমন

কি উনুন ধরানোও একটা সমস্যা। কাজেই সকালের জলখাবারটা ভালরকম হ'ক—দুপুরে কি জুটবে কে জানে!

পরটা হবে শোনা মাত্র কি খেয়াল হল বলে বসলাম 'আমি খাব পরটা।' কথাটায় মায়েরা গুরুত্ব দিলেন না তেমন, 'হ্যাঁ, ঠাকুরের যখন হবে তুমিও খাবে বৈকি!' 'না ঠাকুরের জন্য হবে না, শুধু আমার জন্য হবে আজ।' শুনে একটু বিরক্ত হলেও নানা দুষ্টামির মত এ-ও এক বদ্খেয়াল চেপেছে একটু পরেই ও ভুলে যাবে ভেবে মায়েরা স্তোক দিয়ে বললেন 'আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে।' মনটাকে আজ হাতড়ে দেখি কি হয়েছিল সেদিন আমার? মনে মনে ঠাকুরের গদিতে উঠে বসেছিলাম বুঝি? তাঁর যা কিছু আদর আপ্যায়ন সে-সব আমার জন্য হ'ক এই দুরাগ্রহ জেগেছিল? নিশ্চয় তাই।

জিদী একগুঁয়ের মত গিয়ে বসলাম রান্নাঘরে 'অত ময়দা কেন মাখছ? শুধু আমার জন্য হবে কিন্তু বাবার জন্য করতে পারবে না।' মহা বিপদ! মায়েরা বোঝালেন 'হ্যাঁ বাপু একা তোর জন্যই হচ্ছে ঠাকুরের জন্য নয়। যা খেলতে যা বাইরে, এসে খাবি।' কোনমতে আমায় অন্যমনা করতে পারলেই আপদ যায় তাঁদের ধারণা। বললাম 'তবে অত ময়দা নিয়েছ কেন? একা আমার জন্য হলে অত ময়দা লাগবে না।' সরযূ-মা ময়দায় ময়ান দিতে দিতে বললেন 'বেশি হলে ক্ষতি কি তোর? একবারে খেতে না পারিস বিকালে খাবি রাত্রে খাবি। এতটুকু ময়দা মাখা ডলা অসুবিধা তাই একটু বেশি নিয়েছি।' যুক্তিটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য কি-না ধরতে পারি না। মন খুঁতখুঁত করে—ওরা বোধ হয় ঠকাচ্ছে আমায়, ঠিক বাবাকেও দেবে। কেন দেবে? একদিন শুধু আমার জন্যই হ'ক না। ওদের ঠাকুর অন্য কিছু খাক আজ।

একটা দিন আমার আব্‌দার বজায় রাখলে কি ক্ষতি বাপু—মনের মধ্যে এমনি অবুঝ একটা গোঁ নিয়ে তখনকার মত আড্ডা মারতে বেরিয়ে গেলাম।

আধঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে খাওয়ার ডাক এল। ঘরে এসেই চোখে পড়ল দুখানা থালায় পরটা ভাগ করা আর ঠাকুরের আসন পাতা। আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মাথায় 'ওই যে দিয়েছ বাবাকে! কেন দিয়েছ? বলেছি না আমি একলা খাব আজ?' আমার জিদটা যে এমন বদ্ধমূল মায়েরা বুঝতে পারেননি। পারলে তাঁরা আমায় পরে খেতে দিতেন। কিন্তু তখন আর উপায় নাই—ঠাকুরকে ডাকা হয়ে গেছে, তিনি আসছেন চটির আওয়াজ উঠেছে। ধমক দিয়ে মা বললেন 'খাবি তো খা, নইলে দূর হয়ে যা লক্ষীছাড়া মেয়ে।' আমার সেই এক বুলি 'থালা তুলে নাও বাবার, কেন দিলে বাবাকে। বাবা খাবে না; আমি একা খাব।' এত কাণ্ড কিছুই জানেন না ঠাকুর, প্রসন্নমুখে এসে আসনে বসেছেন। আমার তেড়া চাউনী আর বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকানো টগ্‌বগানি দেখে সকৌতুকে বললেন 'কি হয়েছে ওর, কি বলে?' আমি একটু চুপ করে গেছি হঠাৎ। বোধ হয় ভাবছিলাম কি ভাবে তাঁর খাওয়াটা পণ্ড করলে বেশ লাগসই হবে। অথবা আচমকা ভয় জেগেছিল একটা। তাঁর হাসিমুখ দেখেই কিন্তু ভয় ভেঙ্গে গেল। 'ও কিছু না—আপনি খান'—মায়েরা এ-কথা বলতেই যেমনি থালা টেনে নেবেন ঠাকুর, আমার থালা লাথি মেরে দূর করে দিয়ে তিড়িং মিড়িং করে উঠলাম আমি 'ওই তো বাবা খাচ্ছে। কেন ওকে দিলে তোমরা? আমি বলেছিলাম একা আমি খাব,—অঁ্যা—অঁ্যা—অঁ্যা—।' স্তব্ধ হয়ে গেলেন ঠাকুর, থালায় দেওয়া হাত গুটিয়ে নিয়ে বললেন 'ও কি ওই কথা আগেই বলেছিল?' সরোষ

বিরক্তিতে মায়েরা ঝাঁজাল সুরে বললেন 'হ্যাঁ, সকাল থেকে বায়না তুলেছে আজ আমি একা খাব পরটা, বাবাকে দিও না। কে জানে বেয়াদব মেয়ে এখনও তুলবে সে বায়না! আপনি খান ঠাকুর—ওকে খেতে হবে না। আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে গোল্লায় গেছে একেবারে।' আসনে বসে তেমনি স্তব্ধ হয়ে ঠাকুর কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আমি তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছি সুর তুলে। সেটা কিন্তু নিতান্তই জিদ বজায় রাখা। ভিতরে ভিতরে রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে আমার। তাঁর সেই আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে মুখে কালো ছায়া, মৌন গম্ভীর চাহনী দেখে ভয়ে পেটে খিল ধরে আসছে। আজও সে মূর্তি মনে পড়লে শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ, সভয়ে বলি ক্ষমা কর ঠাকুর! "ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেবশম্ভো!!" কত ক্ষমাই পেলাম তোমার।

কিছুক্ষণ তেমনি আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে উঠে চলে গেলেন ঠাকুর, খাওয়া হল না তাঁর। কি করে খাবেন? ভূতের নজর লাগলে সে বস্তু কি আর দেবতার ভোগে লাগে? কান ধরে আমায় টেনে তুলে মা কটুকণ্ঠে বললেন 'যাও বেরিয়ে যাও—একদম চুপ, চেঁচাবে না একটুও! এত বাড় বেড়েছে তোমার? খেতে দেব না তোমায় আজ, দেখি কত বড় জিদ।' বাবা উঠে যেতে আপনিই কান্নায় ভাঁটা ধরেছিল আমার। কাজটা যে গর্হিত হল, বাড়াবাড়ি হয়ে গেল খুব, বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু পিছাবার উপায় কই? পশুভাব যত থাকে অহংকারও তত বেশি হয়। অতএব কানমলা খেয়ে বেরিয়ে গেলাম অনাহারে, তবু গিয়ে একবার বলতে পারলাম না 'ও বাবা আর আমি বলব না অমন কথা। তুমি খাবে এস।' পাকা পাকা বুলি ঢের জানতাম। কিন্তু এই অতি সঙ্গত কথা ক'টি সেদিন মুখ দিয়ে বার হয়নি। নিঃসংশয়ে জানি একবার

বললেই সব দুঃখ ভুলে যেতেন তিনি, আবার হাত ধরে এসে খেতে বসতেন। কিন্তু দুর্লভ লগ্ন বয়ে গেল সেদিন—ক্ষমা চাওয়া আমার হল না। চির অপরাধী রয়ে গেলাম পায়ে।

বহুক্ষণ সেদিন স্তব্ধ ছিলেন ঠাকুর—সারা বাড়িটাই যেন থমথমিয়ে রইল। ঘটনাটা নিয়ে বেশি বাগ্‌বাহুল্য করেননি। অন্যান্য বারের মত কাউকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টাও করেননি। শুনেছি মায়েরা খাওয়ার জন্য অনুনয় করায় একবার মাত্র বলেছিলেন 'ও যদি অমন জিদ ধরেছিল শুনলেই পারতে ওর কথা। একদিন না হয় আমি পরটা নাই-ই খেতাম। না, আজ এখন আর কিছু খাব না।' মায়েরা নিজেদেরই অপরাধী জ্ঞান করেছিলেন। তাঁদের মনে হল কেন তাঁরা আমার জিদটাকে গুরুত্ব দেননি, ওকথা শুনলে যে ঠাকুরের মনে কষ্ট হবে কেন তা ধরতে পারেননি কেউ? আমায় খবর না দিয়ে অনায়াসে ঠাকুরকে আগে খাইয়ে দিতে পারতেন। দোষ তাঁদেরই।

হিসাবে ভুল হয়েছিল মায়েদের সেটা ঠিক। কিন্তু আসল অপরাধী আমি এ নিশ্চয়। ঠাকুরের সেদিনকার স্তব্ধ গম্ভীর মুখভাব এখনও চোখে ভাসে। বিষণ্ন হয়ে কি ভাবছিলেন এত? সারা দিনে মুখের সে-মেঘ তাঁর কাটেনি, আমায় ডেকে কথা বলেননি পুরো একটি দিন। গভীর মনস্তাপে কি ভেবেছিলেন না বললেও বুঝতে পারি। ইহপরকালে তিনি ছাড়া যার কেউ নাই—সেও দ্বেষ করে তাঁকে? 'দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা' আর কাকে বলে! তবু সে অত্যাজ্য, ভাসিয়ে দেওয়া যায় না তাকে। 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্'—এ তো মমতার কথা নয়, এরই নাম কর্মসন্ন্যাস। 'কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন' (১৮।৮)—গীতামুখে এই বীরধর্মই নির্দ্দেশ করছেন ভগবান্। বিষবৃক্ষ হলেও আমি নিজের হাতে পুঁতেছি বিচারে

কেটে ফেলা চলে না সেটি, প্রারব্ধ ভোগ করছি জেনে সেই বিষাক্ত পরিবেশেই দিন কাটাতে হয়। ওই তো বিশ্বেশ্বরের হলাহল পান; বিষ তিনি ফেলবেন কি করে? জালায় জর্জরিত হলেও গণ্ডূষে শুষে নিতে হবে কালকূট।

একা আমায় বলে নয়, 'দুধকলা দিয়ে কালসাপ' অনেক পুষেছিলেন ঠাকুর। ফেলতে পারেননি কাউকে। মঠাশ্রম গড়ে একদিনের জন্যও সোয়াস্তি পাননি……সে কী অশান্তি! নীলকণ্ঠের মত সে-বিষ গলায় ঢেলে তাঁকে বলতে শুনেছি 'মঠাশ্রম আমার অহংকারের সৃষ্টি। নিজের হাতে ভেঙ্গে দিতে তো পারি না।' বলতে শুনেছি 'সবাই যে আমার। আমি গুরু, কাউকে কি ফেরাতে পারি?' অধ্যাত্ম বিচারে এত ক্ষমা এত করুণা আর এত ভালবাসা দেখেছি তাঁর যে, পুরাণকারের পশুপতি আশুতোষ ভূতনাথ আমার কাছে কল্পনা নয় প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। সেই মানুষ বাইরের বিচারে যখন একেক সময় হৃদয়হীন অমানুষের মত শাস্তি দিতেন কাউকে তখন কি বলব? একটা গল্প বলি তাহলে।

'এক রাজার একটি পোষা বানর ছিল। ছাড়াই থাকত সে। প্রতিদিন রাজসভা বসার পর সে এসে রাজাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে একটি ফল রেখে বসতেই রাজা তাকে দিতেন এক চড়। চড় খেয়েও অনুগত সেবকের মত বানর পায়ের কাছে বসে থাকত। সভা-শেষে চলে যেত রাজোদ্যানে। এমনি প্রত্যহ। রাজমন্ত্রী সহৃদয় সজ্জন ব্যক্তি—রাজার অবিচারে তিনি লজ্জা পান। তাঁর ভদ্র মন পীড়িত হয় রাজার অসৌজন্য দেখে। থাকতে না পেরে শেষে বলে বসলেন কথাটা। "মহারাজ, বনের পশু হয়েও ও আপনাকে একটা ফল দিয়ে প্রণাম করে। আর আপনি তার বিনিময়ে দেন চপেটাঘাত। এই

কি রাজার ব্যবহার ? এতে আপনারই আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়।” মৃদু হেসে রাজা বললেন “তুমি ঠিক বলেছ মন্ত্রি! কাল থেকে তোমার শিক্ষামতই চলব। আমার পদ্ধতিতে চলে ওর বানরত্ব ঘোচেনি আজও। দেখি যদি তোমার পদ্ধতিতে চলে ওর উন্নতি হয় কিছু।” পরদিন বানর এসে ফল দিয়ে বসল পায়ের নীচে, রাজা চড় মারলেন না। সে একটু অবাক্ হল নিশ্চয়ই। অন্তদিন একেবারে পুতুলের মত বসে থাকে, আজ দু'একবার এদিক ওদিক চাইল পা ছড়িয়ে বসল একবার একটু গা চুলকাল। পরদিনও চপেটাঘাত নাই—বানর ফলটি রেখে একটু পরেই রাজার পাদপীঠে উঠে বসল পা ছড়িয়ে। তৃতীয় দিন এসে ফলটি রেখেই কালবিলম্ব না করে কপিবর গিয়ে বসলেন সিংহাসনের হাতলে। দু'তিনবার 'উঁ' বলে সাড়া দিয়ে পাত্রমিত্রদের দাঁত খিঁচিয়েও নিলেন। রাজা নির্বিকার, কিছুই বললেন না সেদিনও। চতুর্থ দিন দেখা গেল বানর ফল আনেনি। তার বদলে এসেই রাজাকে দাঁত খিঁচিয়ে সোজা গিয়ে উঠল রাজার কাঁধে। অমনি রাজাও হাতখানা যতদূর যায় ততদূর লম্বা করে মারলেন ঠাস্ করে এক চড়। চকিতে কাঁধ থেকে নেমে বানর একেবারে পায়ের তলায় গুঁড়ি মেরে বসে জুল জুল করে চাইতে লাগল—নিতান্তই পোষা জীব যেন। রাজা ফিরে বললেন, “মন্ত্রি, এখন কি বুঝতে পারলে কেন চড় দিই বানরকে ?” মন্ত্রী সসম্ভ্রমে বললেন “আর লজ্জা দেবেন না মহারাজ !”

ঠাকুরের মুখেই শুনেছি এ গল্প। উপলক্ষ্যটা মনে নাই কিন্তু আমায় নিমিত্ত করেই এটি মায়েদের শুনিয়েছিলেন। অভিমানে আঘাত লেগেছিল সেদিন রাগ কম হয়নি। এখন কিন্তু বুঝি আমি অমনি একটি শাখামৃগই তাঁর কাছে। একবার নয় শতবার যোগ্য চপেটাঘাতের।

দার্জিলিঙের দিনগুলো এমনিতে বড় আনন্দে কাটছিল। হিমালয়ের নিসর্গশোভায় আত্মহারা ঠাকুর মহারাজ অহোরাত্র যেন ডুবে থাকতেন আপন ভাবে। প্রতিদিন বিকালে রাজাসাহেব মোটরে করে অনেক দূর ঘুরিয়ে আনতেন—একেক দিন দার্জিলিঙের একেক রাস্তায়। ঝড়-বাদল কুয়াশা যাই-ই থাক না কেন, পুরু অলষ্টার চাপিয়ে জুতা মোজা পায়ে পশমের টুপি ও কম্ফর্টার চড়িয়ে ঠাকুর বেরিয়ে পড়েন তাঁর সঙ্গে। পথে পথে ফুলের মেলা আর ঝর্ণা। পনের-কুড়ি হাত পর-পরই ঝর্ ঝর্ ঝর্ ঝর্ রবে ঝরে পড়ছে অগণিত ছোট-বড় ঝরণা। কলনাদে সে-জল রাস্তার তলা দিয়ে বয়ে গিয়ে পড়ছে ওপারের খাদে। রূপালী ধারাটি বহুদূর পর্যন্ত চিক চিক করছে নীচের জঙ্গলের মধ্যে—আরও আরও নীচে, তারপর আর চোখে পড়ে না। কোন্ অতল খাদে হারিয়ে গেল গিরিকন্যা কে জানে? কোনও পথে এক পাশে উঁচু পাহাড় অন্যদিকে গভীর কাল খাদ হাঁ করে আছে। কোথাও পাক খেয়ে নীচে নেমে গেছে রাস্তা—উপরের রাস্তা থেকে দেখা যায় নীচের দিক থেকে মানুষ কি গাড়ি উঠে আসছে, যেন দোতলা হতে এক তলার দৃশ্য। খেলার মাঠ ছিল ওই রকম অনেকটা নীচুতে—মোটরে বেড়াতে গিয়ে বেশ দেখা যেত সেই সমতল অংশটা। একদিন দুর্জয়লিঙ্গ দেখা হল—দার্জিলিঙ্ পাহাড়ের অধিদেবতা। বেশ একটু উৎরাই করে পাহাড়ের এক ধারে মস্ত এক গুহায় সিন্দুরচর্চিত একটি শিলা, গুহার নীচ থেকে খাদ নেমে গেছে অতলে। জায়গাটা মনে পড়লে এখনও গা ছম ছম করে—কি নাম সে-পাহাড়ের জলা পাহাড় না কি ঠিক স্মরণ নাই। টাইগার হিলের নামটাও মনে আছে। উঠেছিলাম কি-না সঠিক বলতে পারব না। তবে ওখান থেকে সূর্যোদয় দেখা হয়নি শেষ পর্যন্ত এ মনে আছে। কেন হয়নি তা অজানা।

আর এক সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। আমি যোশীর ঘরে বসে আড্ডা মারছি হঠাৎ রাজাসাহেবের সোল্লাস কলরবে যে যেখানে ছিলাম বেরিয়ে এলাম। 'ঠাকুর ঠাকুর দেখুন কী অপূর্ব দৃশ্য'—ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠেছেন তিনি। ঠাকুরও বেরিয়ে এসেছেন তাড়াতাড়ি। সত্যই নয়নাভিরাম সে দৃশ্য। আচমকা ঘন মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ দেখা দিয়েছে আকাশে, দার্জিলিঙে যা অতি দুর্লভ। সেই আলো ঠিকরে পড়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘার এক প্রান্তে, কুহেলীমাখা হিমগিরির শিখরে শিখরে। বর্ণনা করে বোঝান যাবে না 'কি মায়া লাগল চোখে'। কতক্ষণ? পাঁচমিনিট বড় জোর। আবার কালো মেঘে দিগ্‌দেশ আচ্ছন্ন হয়ে এল, বৃষ্টি পড়তে লাগল জোরে। কিন্তু ছবিটি সকলের মনে আঁকা রইল।

এ-আনন্দের মধ্যে হঠাৎ ছায়া পড়ল একদিন। বুকে ব্যথা ধরেছে ঠাকুরের। ১৩৩১ সালের চিঠিতে (২।৫৫) তাঁর এই ব্যথার উল্লেখ আছে। কাশীতে থাকতে বাংলা ১৩২২ সালে এই হৃৎপিণ্ডের বেদনার উৎপত্তি। ঠাকুরকে দার্জিলিঙে দেখার আগে আরেক দিন দেখার অস্পষ্ট স্মৃতি ধরা আছে মনে বলছিলাম না? সে তাঁর ওই বুকের ব্যথার সঙ্গে জড়ানো এক ভয়াবহ স্মৃতি। মা বোধহয় উপরে বা ভোগের ঘরে ছিলেন। সরযূ-মা নীলাচল কুটিরের ভাঁড়ারঘরে কাজ করছেন, আমি তাঁর পিছনে পিছনে আছি। দিদি বলে ডাকতাম তাঁকে—যত উপদ্রব তাঁর উপর। শুনেছি ছোট্ট লীলাকে কোলে নিয়ে তিনি একদিন ঠাকুরের কাছে আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'ওর তো আর ভাই-বোন নাই, কাকে মারবে ধরবে ঠাকুর?' মুখের কথা না খসাতে ঠাকুর নাকি বলে বসলেন 'কেন তোমাকে?' তা আমি তাঁর সে-কথা সত্য করেছিলাম। সমবয়সী খেলুড়ীর চোখেই দেখতাম সরযূ-মাকে। সেদিনও কোন দুষ্ট মতলবেই ঘুরছিলাম তাঁর পিছু-পিছু। কি হল বুঝলাম না, হঠাৎ হাতের

কাজ ফেলে ছুটে বেরোলেন তিনি, আমিও ছুটলাম পিছনে। গিয়ে তো আমি স্তম্ভিত! ভিতরের পায়খানার সামনে বুকে হাত দিয়ে আধবসা ভাবে এলিয়ে পড়েছেন ঠাকুর, গাড়ু খসে গেছে হাত থেকে। তাঁর নাক চোখ মুখ কিছুই চোখে পড়েনি সেদিন। শুধু মস্ত বড় দেহখানা যেন ভেঙে-চুরে লুটিয়ে রয়েছে, অসহ বেদনার অভিব্যক্তিতে কালো হয়ে গেছে মুখখানা—এইটুকু এক পলকে দেখেই দৌড়ে পালালাম সেখান থেকে। অজানা ভয়ে শরীর আমার থর থর করে কাঁপছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে মুহূর্তে। ততক্ষণে সরযূ-মার চিৎকারে হরেনদা ডাক্তার-মা মা সকলে এসে পড়েছেন। ধরাধরি করে ঠাকুরকে তাঁরা তুলে আনলেন। অস্পষ্ট গোঙানি শুনেই সরযূ-মা ছুটে গিয়েছিলেন ঠাকুরের কিছু হয়েছে অনুমান করে। ওই তাঁর বুকের ব্যথা—দুঃসহ সে-যাতনায় প্রথমেই দম আটকে যেত ঠাকুরের। চাপা গলায় দু'একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরোত হয়ত। খানিকক্ষণ অনড় থেকে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। জ্ঞান ফিরলে বলতেন মনে হয় তপ্ত লোহা দিয়ে কেউ ফুঁড়ে ফেলেছে হৃৎপিণ্ডটাকে, এমনি একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় দেহ অবশ হয়ে আসে! কয়েক সেকেণ্ডের বেশি চেতনা থাকা অসম্ভব তারপর—কারণ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায় ওই বোধ।

দার্জিলিঙে অতর্কিতে সেই ব্যথা তাঁকে আক্রমণ করল। কেন এ-ব্যথা হত কোন ডাক্তার তার নিদান খুঁজে পাননি। আমরা শুনেছিলাম নিজের দেহে কোনও প্রিয়শিষ্যের প্রারব্ধ গ্রহণ করায় এই ব্যথার উৎপত্তি। আর, কোনও কারণে মনে আঘাত পেলেই উৎকট আকারে ব্যথাটা প্রকাশ পেত। মনে আঘাত আর তাঁর দেবে কে? শিষ্য-ভক্তরাই ছিলেন নিমিত্ত। কারও আচরণে বা কথায় চিত্ত পীড়িত হলেই আর কথা নাই। মায়ের কাছে শুনেছি ১৩২৮ সালের শেষদিকে মঠে একবার ভয়াবহ আকারে তাঁর এ-ব্যথা দেখা দেয়। গুরুতর মনঃক্ষোভের

কারণ ঘটেছিল সেবার—ঘটনাটা অপ্রকাশ্য। তারপরই মঠের সংস্রব ছেড়ে বাকী জীবন বাইরে বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। ১৩৩৬ সালে দার্জিলিঙে আবার ঠিক সেই রকম প্রচণ্ড আক্রমণ হল। হেতুটা আজও আমাদের অজ্ঞাত।

যাই হ'ক, রাজাসাহেব ব্যথা ধরা মাত্র সাহেব-ডাক্তার ডেকে আনলেন। না, তিনিও ধরতে পারলেন না দেহ-যন্ত্রের কোন্ বৈকল্যে এ ভীষণ ব্যাধি। শূলরোগ—স্নায়ুশূল এই মাত্র নির্ণয় করে ওষুধ দিয়ে গেলেন ডাক্তার। কিছুতেই কিছু হল না, তিনদিন সমানে চলল সে-যন্ত্রণা। কখনও একটু কমে, চোখ চেয়ে ঠাকুর দু'একটা কথা বলেন, সামান্য কিছু খাওয়াতে চেষ্টা পান সেবিকারা, পরক্ষণেই হয়তো ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন। একবার হয়তো সংবিৎ ফিরল, অস্পষ্ট আর্তনাদে বোঝা গেল ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান এসেছে। অসাড়ে দুই চোখ দিয়ে ধারা গড়াচ্ছে যন্ত্রণায়, তার বেশি সাধ্য নাই হাত-পা নাড়বার। দিন যেন আর কাটতে চায় না। ভয়ে কাঁদছেন মায়েরা, রাজা-রাণী পাংশুমুখে মুহুর্মুহু খোঁজ নিচ্ছেন এখন ঠাকুর কেমন আছেন। আমাদের দূরে থাক রাজবাড়ির জীবন-যাত্রাও বিপর্যস্ত। তিনদিন কি চারদিনের দিন বিকালে ব্যথাটা কিছু কম পড়ল। সবার মনেই আশা হয় এবার তাহলে ঠাকুর নিরাময় হবেন। কয়দিন পর সে রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমায় সকলে।

ভোররাত্রে ঘুম ভেঙে মা তাড়াতাড়ি উঠে যান। ঠাকুর কেমন আছেন কে জানে! রাত্রে কাল আর কারও সাড়া ছিল না, অঘোরে ঘুমিয়েছেন। অন্য সকলেও উঠে বসেন একে-একে। সত্যি, রাত্রে ঠাকুরের আবার ব্যথা ধরল কি-না সে খোঁজ নেওয়া হয়নি একবারও।

ঘরে ঢুকে মুখে কথা সরে না মায়ের। খাটে বসে আছেন ঠাকুর। কোলের উপরে একটা বালিশ চেপে কনুয়ের ভর দিয়েছেন—অন্য

হাতখানা কপালে। হাতে মাথা রেখে শিথিল ভঙ্গিতে বসেছেন, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে একেবারে। পায়ে-পায়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন মা। সসঙ্কোচে জানতে চান 'বড্ড কষ্ট হচ্ছে ঠাকুর? আবারও বাড়ল ব্যথাটা?' 'না' ধরা গলায় ঠাকুর বললেন 'ব্যথা ভাল হয়ে গেছে আমার। কাল রাত্রেই গেছে।' আনন্দিত মুখে মা বলেন 'সত্যি? তবে কাঁদছেন কেন ঠাকুর? কি হল?' হু হু করে জল পড়তে লাগল ঠাকুরের দুই চোখে—ডুকরে কেঁদে উঠলেন মেয়েমানুষের মত—'আমার সর্বস্বের বিনিময়ে সে-ব্যথা ভাল করে দিয়ে গেছে রাণী। এর চেয়ে আমার বুকের ব্যথা থাকাই যে ঢের ভাল ছিল রে—!' পাশের ঘরে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকেন অন্তরা। খোলা জানলা দিয়ে ঠাকুরের কান্নাধরা গলা শুনে কারও আর সাহস হচ্ছে না মুখ বাড়িয়ে দেখেন কি হল। এই ব্যাকুল কান্না দেখে মায়েরও আতঙ্কে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। কি যে হয়েছে কিছুই ধরতে পারেন না, ভিজাচোখে ঠাকুরের পায়ে হাত বুলান শুধু। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রাণপণ চেষ্টায় একটু স্থির হয়ে মৃদু স্বরে ঠাকুর বলতে লাগলেন 'কাল রাত্রে তোমরা শোবার একটু পরেই ব্যথাটা আবার জোর ধরল। কাউকে জাগাতে ইচ্ছা করল না। আর জেগেই বা তোমরা করবে কি? ভোগ যা আছে ভুগতেই হবে। কখন অজ্ঞান হয়ে গেছি যন্ত্রণায় নিজেই জানি না। কতক্ষণ ছিলাম ও-ভাবে, হিসাব নাই। হঠাৎ বাহ্য ফিরতে মনে হল যেন বড় আরামে আছি, সব কষ্ট দূর হয়ে গেছে, সুস্থ শরীর। চোখ মেলে দেখি পাশে রাণী* বুকে হাত

* স্বয়ং মহাশক্তি জগদীশ্বরী। ঠাকুর মহারাজের তান্ত্রিক সিদ্ধির পর চিরদিনই তাঁর আরাধ্যা ইষ্টদেবী তাঁকে আমাদের মা-ঠাকুরাণীর মূর্তিতে দর্শন দিতেন। পাঠক 'মায়ের কৃপা' পড়ে দেখতে পারেন।

বুলিয়ে দিচ্ছে। আমায় কাল খুব বকেছে সে।' আবার চোখে জল ঝরতে লাগল তাঁর "সে বলল 'কার জন্য কেঁদে মর তুমি, কাদের জন্য দুঃখ পাও? জগতের কেউ তোমার নয়, তুমি কারও নও। জগৎ আমার— আমি শুধু তোমার। তবে ওদের জন্য (শিষ্য-ভক্তদের জন্য) মিথ্যা মায়ায় কেন এত আত্মবিস্মৃত তুমি?' আরও অনেক কথা বলল। তারপর আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'যাও আর ব্যথা হবে না বুকে, ভাল হয়ে গেল। কিন্তু যতদিন ওদের না ভুলতে পারছ আমার দেখা তুমি আর পাবে না'।" উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন ঠাকুর 'আমি তোদের ভালবাসি এই অপরাধে আজ সে আমায় ত্যাগ করে গেল। কি নিয়ে থাকব আমি? আমার সব সে কেড়ে নিয়ে গেল এমন করে?'

অবাক হয়ে ভাবি ঠাকুর কি মাকে বলেননি 'জগতের কাউকে তো আমি চাইনি। "নিভৃত কুটিরে হেরিয়া তোমারে আপনা যাইব ভুলি" এই না পরম কাম্য ছিল আমার! আমায় গুরুগিরি করতে লোকালয়ে পাঠাল কে? তুমিই নও কি?' হয় তো বলেছিলেন ঠাকুর। মা তার উত্তরে সম্ভবত বলেছিলেন 'গুরুগিরি করতে বলেছিলাম ঠিকই। তা বলে এমন করে জড়িয়ে পড়তে বলিনি, তুমি যে আমায় ভুলে ওদের-ই ধ্যান-জ্ঞান করেছ।' এ অভিযোগের সদুত্তর ছিল কি-না জানি না। কিন্তু অভিযোগটা সত্য। ঠাকুরের অজস্র চিঠিতে তাঁর নিজ মুখের স্বীকৃতি আছে ভগবান্‌কে ভুলে আমাদের ভালবাসায় বিভোর হয়েছেন তিনি। হায়! একবার যদি সে-ভালবাসার মূল্য বুঝতে পারতাম, জনম ধন্য হয়ে যেত যে! মা কি সাধে কেড়ে নিয়েছে আমাদের ঠাকুরকে?

এর পর আর ছয় বৎসর মরদেহে ছিলেন ঠাকুর। বুকে ব্যথা ধরেনি একদিনও কিন্তু মায়ের দেখাও আর মেলেনি। তিলে তিলে সবকিছু হতে মন উঠে গেছে তাঁর, বিরস হয়ে গেছে বিশ্বসংসার। সন্ন্যাসের সাধনায় চিত্ত একদা কঠোর নির্মম হয়ে গিয়েছিল ঠাকুরের, নিজেই বলেছেন। সেই আকাশবৎ শূন্যহৃদয়ে প্রেমের সাধনায় ভাবের ইন্দ্রধনু ফুটেছিল, রঙে রাঙা হয়ে গিয়েছিল নিখিল বিশ্ব। এ-ও তার মুখেই শোনা—জগতের প্রতি পরমাণুতে আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করে দু'হাতে সব কিছু বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপন হতেও আপনজন হয়ে সদাসন্নিহিত থাকতেন মহামায়ী—সেই আনন্দে অফুরন্ত কর্মের জালে নিজেকে জড়িয়েছিলেন মুক্তপুরুষ। শুনেছি গরম লাগলে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাতাস করতেন মা। কোন একটা ভাবনায় রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, তিনি এসে তার সমাধান বলে দিতেন। একবার এক শিষ্যের জন্য অব-ধৌতিক ওষুধের ব্যবস্থা করবেন কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না একটা উপকরণের নাম। অমনি সঙ্কটনাশিনী এলেন সঙ্কটমোচনে, বলে গেলেন জিনিসটার নাম মুসব্বির। ভগবানের ভক্তবৎসল নাম কি শুধুশুধুই দিয়েছেন ভক্ত? কত সামান্য কারণেই যে উতলা হন মাহেশ্বরী, সে অবিশ্বাস্য কথা ঠাকুরের মুখে শুনে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হত। কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রার নিত্য সহচারিণী মনঃপ্রসাদনকরী সেই আনন্দময়ী. শিষ্য-ভক্তদের তিনি ভালবাসেন এই অনুযোগে এবার অদর্শন হলেন জন্মের মত। তারপর কি আর মন থাকে সংসারের কোন কিছুতে? ঠাকুরেরও শূন্য বোধ হল ত্রিভুবন। নিরালম্ব নিরানন্দ জীবন—'কেবলং কার্য্যমিত্যেব' বিচারে দিন কাটানো, বাকী ছয় বছর এই ভাবেই কেটেছিল তাঁর। '৩৮ সালের একখানা চিঠিতে এর আভাস আছে—'বাহিরে কঠোর কর্ম্মী সাজিয়া কতকগুলা বালকের সঙ্গে কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছি। সে আনন্দ

আর বাহিরে প্রকাশ হইতেছে না, সজোরে বার্ধক্য আক্রমণ করিতেছে।' (চিঠি ২।৮৫) সদানন্দ হয়েও আনন্দ একেবারেই হারিয়েছিলেন তিনি। মা মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করতেন 'মায়ের দেখা আর পান না ঠাকুর ?' বিষণ্ণ স্বরে তিনি বলতেন 'না, আমার আনন্দ বলতে আর কিছুই রাখেনি সে। ইচ্ছা মাত্রে আর দেখা মেলে না তার।'

ওই দার্জিলিঙেরই আরেক দিনের ঘটনা। রাজাসাহেব প্রায়ই নতুন নতুন রেকর্ড এনে গ্রামোফোন বাজিয়ে ঠাকুরকে শোনাতেন। নিজেও অনেক সময় শোনাতেন, আবার গ্রামোফোন রেকর্ড সবই হয়তো মায়েদের জিম্মায় রেখে যেতেন—ঠাকুর অবসর সময়ে তাঁর পছন্দমত গান শুনবেন —এই আকিঞ্চনে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কি কখন ঠিক মনে নাই মায়েরা রেকর্ড বাজাচ্ছেন। ঠাকুর তাঁর খাটে বসে শুনছেন। অনেক নতুন রেকর্ড এসেছে সেদিন। বাছতে বাছতে একখানা কীর্তন হাতে পড়তেই মায়েরা সাগ্রহে disc-এ চড়িয়ে দিলেন সেটি—

"রাই-অনাদর হেরি রসিকবর অভিমানে করল পয়ান।"

গোবিন্দদাসের পদ। মানে খণ্ডিতা শ্রীমতী কুঞ্জ হতে বিদায় করে দিয়েছেন গোপীবল্লভকে—'হরি হরি যাহি মাধব যাহি', তুমি ফিরে যাও ফিরে যাও। বলেছেন 'আর না হেরিব ও কাল বয়ান, এখানে রহিলে কেনে—'। শ্রীমতীর প্রত্যাখ্যানে দশদিক অন্ধকার দেখছেন রসরাজ, অভিমানে কুঞ্জ ছেড়ে পথে নেমেছেন কিন্তু পা যে চলে না !

"(বলে আমি কোথায় বা যাব রে) (আমায় রাই যদি নিলে না)
নয়ানসলিলে পথ লখই না পারই পীতবাসে মুছই বয়ান ॥
(ভেসে গেল) (আহা, নয়নজলে নীলগিরি ভেসে গেল)।"

পদাবলীর কান্ত পদে সমাহিতচিত্তা মায়েরা চমকে উঠলেন, ওকি কে কাঁদছে ? ফিরে চেয়ে হতবাক্ তাঁরা। বালিশে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছেন তাঁদেরই ঠাকুর। হিমগিরির মত উত্তুঙ্গ গুরু-গৌরব কঠিন গাম্ভীর্য ও মর্যাদার শিলাখণ্ড খরস্রোতে ভাসিয়ে বয়ে চলেছে স্বরধুনী-ধারা!

"(পীতবাসে মুছই বয়ান) (কেউ দেখবে বলে, আমি নাগর হয়ে
কাঁদিলাম) (কেউ দেখবে বলে পীতবাসে মুছই বয়ান)
হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান।
(কিছুই বুঝতে নারিলাম)
(কিসের লেগে মান কিছুই বুঝতে নারিলাম)
সো হেন প্রেমময়ী গঠিলা কো নিরদয় কাহে করল মুঝে মান।
নয়নসলিলে পথ লখই না পারই পীতবাসে মুছই বয়ান ॥"

'কি আমার অপরাধ আমি জানি না। তার মত প্রেমময়ী কোন্ অভিমানে নির্দয় হল আমার উপর কেউ যদি বলে দিত! অভাগিনী চন্দ্রাকে একদিন কৃপা করেছিলাম, তার বিচারে এ কি এমনই অমার্জ্জনীয় অপরাধ?'

মায়ের মুখে বর্ণনা শুনে আজও গোবিন্দদাসের ওই পদ মনে পড়লেই দেখি পুরুষোত্তম তাঁর পুরুষ অভিমান বিসর্জন দিয়ে সর্বহারার মত কাঁদছেন—

'(আমি কোথায় বা যাব রে) (আমায় রাই যদি নিলে না)
নয়নসলিলে পথ লখই না পারই পীতবাসে মুছই বয়ান ॥'

"এ রস-সিদ্ধান্ত বেদান্তপার।"

যেজন্য ঠাকুরকে দার্জিলিঙে ধরে রাখা, অবশেষে সেই দিন এল। আষাঢ় মাস। শেষ রাত্রি থেকেই ডাক্তার নার্সের আনাগোনা চলছে মস্ ব্যাঙ্কে। রাণীর প্রসবকাল আগতপ্রায়। বোধহয় বেলা দশটা হবে তখন। এতকাল পরে ও আর সঠিক মনে নাই, তবে দিনের বেলা। দিনটাও ভাল ছিল, অন্যদিনের মত মেঘ কুয়াশা বৃষ্টির দৌরাত্ম্য নাই, আলোভরা শুকনো দিন—আকাশে মেঘ থাকলেও দার্জিলিঙের পক্ষে অমন আবহাওয়া দুর্লভ। আনন্দকলরবে জয়বাদ্যে ঘোষিত হল নবজাতকের আগমন—বস্তার-রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ভূমিষ্ঠ হয়েছে। রাজদম্পতীর আশা পূর্ণ হয়েছে, প্রফুল্লকুমারী এবার পুত্রসন্তান প্রসব করেছেন একটি। ইনিই বস্তার রাজ্যের বড় রাজকুমার প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ-দেও—পরে বস্তার রাজ্যের মহারাজা। স্বাধীন ভারতে বস্তারের ভূতপূর্ব রাজা প্রবীরের নাম সুপরিচিত। যত প্রশংসা তাঁর ততখানিই নিন্দা। সত্য-মিথ্যা নির্ণয় দুরূহ তা হতে। কিন্তু যত নিন্দাই শুনি না কেন একটা কথা ভুলিনি—প্রবীরের জন্মদিনে ঠাকুর মহারাজের উল্লাস।

রাজাসাহেব এসে খবর দিতেই ঘড়ি দেখে সোজা হয়ে বসলেন ঠাকুর, 'ছেলে হয়েছে?' 'হ্যাঁ ঠাকুর' লজ্জিত অথচ উৎফুল্ল মুখে প্রফুল্লচন্দ্র বলেন 'ওর জাতকর্ম কে সম্পন্ন করবে ঠাকুর?' তাঁর অনুক্ত ইচ্ছা বুঝে প্রসন্ন-মুখে ঠাকুর বললেন 'আমি করব প্রফুল্ল, চল।' 'আপনি করবেন ঠাকুর?' আনন্দ দেখে কে রাজাসাহেবের! তাঁর সঙ্গে নিজে সূতিকাগারে গিয়ে সোনার খড়কে দিয়ে নিজের হাতে জাতকের জিহ্বায় বাগ্‌ভব বীজ লিখে জাতকের প্রথম সংস্কার সম্পন্ন করেছিলেন ঠাকুর। ফিরে এসে উৎফুল্ল হাস্যে বলেছিলেন 'আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে কি বলব? ওরে, নাচতে ইচ্ছা করছে আজ, কে এসেছে তোরা তো জানিস্ না।' আনন্দের

প্রাবল্যে দু'চারবার হেলে-দুলেও নিলেন। তাঁর অতখানি উল্লাসচাপল্য দেখার সৌভাগ্য আমার সেই প্রথম। তাই হাসিভরা সে মুখ মনে আছে, আনন্দে ফেটে পড়বেন যেন এমনি ভাব। অদ্যাবধি তাঁর সে উচ্ছ্বাস ভুলতে পারিনি। কে জানে সেদিনের সেই অজাতবোধ সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে কোন্ মহতী সম্ভাবনা দেখেছিলেন তিনি? সে-সম্ভাবনা কি ফলবতী হবে এবারই অথবা দূর ভবিষ্যতে?

ভাবি, তিনি তো আমাদের মধ্যেও তাঁর ভগবানকে দেখতেন। ভরসার কি আছে তাতে? বটের বীজটি যে চেনে সে বলে ওটি মহামহীরুহ। যে চেনেনা সে দেখে পোস্তদানার মত কিরকিরে একটা কিছু। দু'টি দেখাই সত্য। তবে কিনা একটা আপাত সত্য অন্যটি পরমার্থত। পরমার্থকে জীবনে রূপ দেওয়াই সাধনা। প্রবীরের যদি সে সাধনা থাকে একদিন সত্য হবেই ঠাকুরের সে-দেখা। নাহলে সবই রইল মহা ভবিষ্যের গর্ভে। কাজেই থাক ও-কথা।*

প্রবীর জন্মাবার কিছুদিন পরই সদলবলে পাহাড় থেকে নেমে আসা হল কলকাতায়—৮২, ল্যান্সডাউন রোডে। এটিও রাজাসাহেবের ভাড়া-করা বাড়ি। অল্পদিন সেখানে থেকে আমরা পুরী চলে গেলাম। ঠাকুর রয়ে গেলেন ওই বাড়িতে। সেদিন কি কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতাম পুরীবাসের মেয়াদ ঠাকুরের আর মাত্র ছ'টি বছর? দার্জিলিঙ্ গিয়ে তাঁর মহাপ্রয়াণের সঙ্কেত পেয়ে এসেছেন ঠাকুর?

আদিত্যের সমূহন আর ব্যূহন। বৈন্দব সংহননে 'আমি গুরু' এই বোধ আবার 'ব্রহ্মাহমস্মীতি' বোধে ছড়িয়ে পড়া বিশ্বময়। হিমাচলকন্দরে নিয়ে গিয়ে গিরিজা সেই কথা-ই বলে গেলেন, আর কেন এখানে?

* প্রবীর আজ আর নাই। কিন্তু তাঁর শত্রু-মিত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও ছিলেন অসামান্য পুরুষ। তিনি সাধারণ কেউ নন।

"—যাই চল সেই নগরে।
যেথায় রবি শশী দিবানিশি আনন্দে বিহার করে॥"

ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নোদিয়ায় কদাচন।
দেবস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণা॥

—ছান্দোগ্য ৩।১১।২

আর্যদর্পণে দেখছি ১৩৩৬ সালে ৪ঠা ভাদ্র ঝুলনপূর্ণিমা পড়েছিল। বস্তারের রাজাসাহেব গুরুধামে জন্মোৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বস্তারের রাণী স্বয়ং দার্জিলিঙে উৎসব করেছিলেন। গুরুধামে শেষপর্যন্ত ঠাকুরের যাওয়া হয়নি সেবার। কলকাতায় এসে ৮২, ল্যান্স-ডাউন রোডে বেশ কিছুদিন রাজপরিবারের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন ঠাকুর। তবে একাদিক্রমে বাস করেননি। ৩১শে আশ্বিন লেখা একখানা চিঠিতে জানছি কুতবপুর হতে ইতোমধ্যে একবার ঘুরে এসেছেন। ৫ই কার্তিক আমাকে লেখা একখানা চিঠি আছে দেখছি। সেই প্রথম বাবা আমায় উদ্দেশ্য করে চিঠি দিয়েছেন—তার মূল বক্তব্য—'লীলু, মণির কাছে (মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী) কিংবা তোমার মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ কর। তুমি যে বড় হচ্ছ, এখন থেকে পড়াশুনা করা দরকার।'

২২শে অগ্রহায়ণ নীলাচল কুটিরে লিখছেন—'কুতবপুর স্কুলের স্থান ও বাড়ি লেখাপড়া হইয়া গিয়াছে। ৩।৪ দিন হইল স্কুলের আসবাব সরঞ্জামাদি প্রায় দুই হাজার টাকার মাল একখানি নৌকাতে রওনা করিয়া দিয়াছি। চুণ সিমেণ্ট টিন ও বোর্ডিং এর ৪০ খানা চৌকি লইয়া আর একখানি নৌকা ২।৩ দিনের মধ্যে রওনা হইবে। টিউবওয়েলের ও কৃষির

সরঞ্জাম এখনও বাকী। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে বার হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। হাতে আর টাকা নাই। যদি এদিকে সংগ্রহ করিতে না পারি তবে পুরীর টাকা হইতে এক হাজার টাকা ইনসিওর করিয়া পাঠাইতে হইবে। সময়মত আমি জানাইব। সর্বদা এই সব কার্য্যে লোকজন লইয়া ব্যস্ত আছি। ২।৩ জন এম. এ. ও বি. এ. মাষ্টার নিযুক্ত করিয়াছি। কাজে মাতিয়া মনটা অনেক ভাল আছে। শরীরও ভাল আছে।

'সরস্বতী পূজার দিন স্কুল খোলা হইবে। বগুড়া ঢাকা প্রভৃতি বেড়াইয়া আসিয়া সরস্বতী পূজা পর্যন্ত হাওড়ায় অপেক্ষা করিব। স্কুল খুলিলে তবে আমার ছুটি।'

২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ল্যান্সডাউন রোডে থেকে ঠাকুর হাওড়ায় ফণীবাবুর বাসায় চলে এলেন। সেবার ১৫শ বার্ষিক ভক্তসম্মিলনী বগুড়ায় হয়েছিল। ওখান হতে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্মিলনীতে চলে যান ৭ই পৌষ।

বাংলা ১৩৩১ সনে ঠাকুর নীলাচল কুটিরে বাস করতে আরম্ভ করার পর পুরীতে এক ব্রাহ্মণদম্পতীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ব্রাহ্মণ তখন প্রায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ। তিনি পূর্বেই কুলগুরুর কাছে সস্ত্রীক দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর শ্যালক কামাখ্যা ব্রহ্মচারী অনেক দিন হতেই ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমজীবন যাপন করছিলেন। সুতরাং ঠাকুর মহারাজ তাঁর একহিসাবে জানাশোনা-ই। নীলাচল কুটিরে এই ব্রাহ্মণ-দম্পতী ঠাকুরের কাছে অভিষিক্ত হয়ে তাঁকে গুরুবরণ করেন। পরে নীলাচল কুটিরের পাশেই যে ছোট 'জ্যোতি নিবাস' (বর্তমানে হাসপাতালসংলগ্ন কোয়ার্টার) তাঁরা সেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমাদের প্রতিবেশী হলেন। ব্রাহ্মণের নাম ছিল লক্ষ্মণচন্দ্র কুলাভি। হোমিওপ্যাথিক

ডাক্তার হিসাবে বৃদ্ধের সুনাম ছিল। তাঁর স্ত্রী পুরীতে ডাক্তার-মা নামে পরিচিতা, ওড়িশা ভক্তসংঘ অদ্যাবধি তাঁকে ডাক্তার-মা বলেই জানেন।

এই ১৩৩৬ সালের ফাল্গুন মাসে ডাক্তারবাবু ওই বাড়িতে মারা যান। ঠাকুর তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ৮ই ফাল্গুন লিখলেন—'আশা ছিল ডাক্তারবাবু ২।৪ বছর জীবিত থাকিয়া তোমাদের অভিভাবকস্বরূপ আমাদের বাসাতেই অবস্থিতি করিবে। আমি নিশ্চিন্তে কিছুদিন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া লইব। কিন্তু ভগবদিচ্ছা অন্যরূপ। সে-ই সব ভার আমার উপর চাপাইয়া চলিয়া গেল।' ডাক্তারবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী নীলাচল কুটিরে আশ্রয় পান। প্রায় ত্রিশবৎসর তিনি কুটিরেরই একজন হয়ে ছিলেন।

জীবনী ও বাণীতে পাই (রোগশয্যায় ঠাকুরের অনুভূতি-প্রসঙ্গ) তিনি একদিন অন্তেবাসীদের কাছে বলেছিলেন 'তমলুকে একবার আমার ভীষণ জ্বর হয়েছিল। Temperature ১০৬° ডিগ্রি হতে ৯৪° ডিগ্রিতে নেমে যায়। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়েছিল। সে অবস্থায় দেখি হঠাৎ কুণ্ডলিনী উর্দ্ধপথে উঠতে আরম্ভ করে দিয়েছে, এই দেখে আমি উঠে বসলাম, তারপর সেই অবস্থাটা চলে গেল।' ১৩৩৬ সালের ৮ই ফাল্গুন যে চিঠিখানায় ডাক্তারবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার কথা আছে সেই চিঠিতে আমরা এই অসুখের বিস্তৃত বিবরণ পাই। মাঘমাসে সম্ভবত ভীমাচরণ বসুর বাড়িতে তাঁর অসুখ হয়েছিল।

—'এবারকার অসুখে জীবনীশক্তি ৫ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। দ্রুত বৃদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর করিতেছে। এমন জ্বর আর কখনও হয় নাই। ৬ দিনের দিন জ্বরত্যাগকালে নাড়ী বসিয়া গিয়াছিল। কর্মভোগ আছে তাই বাঁচিয়া উঠিলাম। ব্রঙ্কোনিমোনিয়া হইয়াছিল।

ডানদিকের ফুসফুসে কি যে যন্ত্রণা ও বেদনা হইয়াছিল লিখিয়া কি জানাইব। এখনও দুর্বলতা যায় নাই আর যাইবেও না বোধ হয়। বুকেও সামান্য বেদনা আছে। কাশিতে হাঁচিতে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে ব্যথা লাগে। পুরী যাওয়ার জন্য মনটা ব্যগ্র হইয়াছে। ডাক্তারেরাও পুরীর হাওয়াতেই উপকার হইবে বলিয়া বলিতেছে। কিন্তু আমার যাওয়ার উপায় নাই। উপস্থিত কার্যাদি শেষ না করিয়া নিশ্চিন্তে পুরী যাইতে পারিতেছি না।

'আগামী কল্য জামসেদপুর যাইতেছি। ৭।৮ দিন পরে ফিরিয়া আসিব। তৎপরে এখানে আসিয়া আবার কুতবপুর যাইব। আমি না যাইলে সেখানকার কোন কাজ নিষ্পন্ন হইবে না। নানারূপ গোলযোগ হইতেছে। স্কুল খোলার পর আমি আর যাইতে পারি নাই। এত টাকা দিলাম কতদূর কি হইল একবার দেখাও কর্তব্য। যাক কুতবপুর হইতে আসিয়া কলিকাতাতেও অনেক কাজ আছে। দাঁত তোলা বাঁধাই দলিলাদি সংশোধন ইত্যাদিতে কিছুদিন লাগিবে। তাহার পর ভিন্ন পুরী যাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে।'

সন ১৩৩১ সাল হতে '৩৬ সাল পর্যন্ত যে বিবরণ আমি দিয়েছি তাতে একটা কথা স্পষ্ট। বিশ্রাম নেবার জন্য মঠাশ্রম ছেড়ে পুরীতে এলেও বছরে কয়মাসই বা এখানে ঠাকুর থাকতে পারতেন? কথাপ্রসঙ্গে নিজের এই কাজের বোঝাকে তিনি বলতেন 'কমলি নেহি ছোড়্তা'। বলতেন 'আমি ছাড়াতে গেলে হবে কি, কাজ আমাকে ছাড়ে না।' অথচ কি সে কাজ? নিজের যশ-মান-বিত্ত-সঞ্চয়, না স্ত্রীপুত্র-ভরণ-পোষণ অথবা কন্যাদায়? এর কোনটাই কিন্তু নয় সে কাজ। তবু ক্লান্ত দেহ-মনের দাবী অস্বীকার করে তাঁকে ছুটাছুটি করতে দেখি। তমলুকে ওই প্রাণান্তকর রোগযন্ত্রণার পরও দীর্ঘ বিশ্রামের পরিবর্তে তাঁর জামসেদপুর

কুতবপুর ছুটবার কি এমন গুরুতর হেতু ছিল? ভাবতে গিয়ে আবারও তাঁর মুখেরই একটা কথা মনে পড়ে যায় 'সন্ন্যাসীর জীবন হবে রণোন্মত্ত সৈনিকের মত।' জরা ও ব্যাধির আক্রমণে শেষদিকে দেহটা ঠাকুরের কী অপটু হয়ে পড়েছিল আমাদের মত কে তা জানে? তবু 'যাওয়া কর্তব্য' —এই যুক্তিতে তাঁকে বিশ্রাম নিতে দেখিনি।

২০শে ফাল্গুন গুরুধাম থেকে লিখলেন—'জামসেদপুর হতে হাওড়া এসেই পরদিন এখানে এসেছি। দোলের পূর্বে যেতে পারব না।' চিঠির শেষে রয়েছে 'এবার আমার সঙ্গে রাধাকান্তপুরের মাসীমা ও নরেনের মা ও যাইতে পারে।'

রাধাকান্তপুরের মাসীমা অর্থে তাঁর ছোট মাসী—যোগেন্দ্রমোহিনীর কনিষ্ঠা সহোদরা গোবিন্দমোহিনী দেবী ওরফে গোলাপসুন্দরী। আর 'নরেনের মা' হলেন শ্রদ্ধেয় তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্মিণী। শেষ পর্য্যন্ত কি কারণে জানি না ইনি সে-বার ঠাকুরের সঙ্গে পুরী আসতে পারেননি। কিছুদিন পরে এসেছিলেন নরেনদার* সঙ্গে। শ্রীযুক্তা গোবিন্দমোহিনী দেবীকে নিয়ে ঠাকুর চৈত্রের প্রথমেই দীর্ঘ দিন পরে পুরীতে ফিরে এলেন।

'আমি প্রায় একবৎসর পরে ৪ঠা চৈত্র প্রাতে পুরী আসিয়াছি'—ঠাকুরের চিঠি ২য় খণ্ড ৮৩ নং চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে। চিঠিখানার তারিখ ১৩।১২।৩৬। তৃতীয় খণ্ডেও (১৬ই চৈত্র '৩৬ সালে লেখা)

* ৺নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—শ্রদ্ধেয় তারাপদ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৩৩৫ সালে একবার বাড়ি থেকে পালিয়ে পুরী চলে এসেছিলেন জেঠা মশায়কে দেখার জন্য। মায়েদের কাছে শুনেছি তাঁর সে বয়সের চেহারার সঙ্গে ঠাকুর মহারাজের প্রথম জীবনের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল।

৩৬নং চিঠিতে ৪ঠা চৈত্র পুরী ফেরার কথাটা সমর্থিত হয়েছে। দু'খানা চিঠিতেই তমলুকের প্রবল রোগাক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঠাকুরমাকে (গোলাপসুন্দরী) যখন দেখেছি তখন অতি বৃদ্ধা তিনি। তবু গায়ের রং কি সুন্দর ছিল তাঁর—অল্প বয়সে যে রীতিমত রূপসী ছিলেন দেখলে বোঝা যেত। নীলাচল কুটিরে তাঁকে নিয়ে আমরা একখানা ফটো তুলি। ফটোখানার জীর্ণদশা—আর বেশিদিন আয়ু নাই তার।

একদিনের কথা মনে পড়ে। উপলক্ষ্য কি জানিনা, আগে কি নিয়ে আলাপ হচ্ছে তা'ও মনে নাই। কুটিরের বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন ঠাকুর, বেলা দশটা হবে। ঠাকুরমা পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ বিগলিত স্নেহে 'নলিন, বাবা আমার নলিন' —বলে ঠাকুরের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে আরম্ভ করলেন সজল চোখে। অবাক হয়ে দেখি মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে বাবার, চোখ ছল ছল করছে আহ্লাদে। মাসীর আদরে তিনি যেন সুদূর শৈশবে ফিরে গেছেন মুহূর্তে। এক পলকের জন্য কুতবপুরের 'আদুরে ছেলে নলিন'কে সেদিন দেখতে পেয়েছিলাম মনে আছে।

১৩৩৭ সালের প্রথমেই ঠাকুর আবার ভ্রমণে বার হলেন। '৩৬ সালের ৪ঠা চৈত্র পুরী ফিরলেও তিনি অল্প দিনের জন্যই পুরী এসেছিলেন। ২।৮৩ নং চিঠিতে (তাং ১৩।১২।৩৬) পাই 'আমি বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়ার সময় মঠে যাইয়া ফিরিবার সময় জগৎসী হইয়া আসিব এরূপ সংকল্প করিয়াছিলাম।' তমলুকে রোগ-ভোগের জন্য সে সংকল্প শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারবেন কি-না

সন্দেহ প্রকাশ করে আবার লিখছেন 'তবে এখনও মাসাধিক কাল সময় আছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে নিশ্চয়ই মঠে যাইব।'

পুরী ছেড়ে বৈশাখ মাসেই বেরিয়ে পড়েছিলেন নিশ্চয়। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শিলং থেকে নীলাচল কুটিরে এক দীর্ঘ পত্র এল। চিঠি থেকে জানি, অত শীঘ্র তাঁর আবার বাইরে যাওয়াটা কুটিরবাসিনীদের কারও অভিপ্রেত ছিল না। ঠাকুরমা তো বিধিমতে নিষেধ করেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কে শোনে সে কথা? রণোন্মত্ত সৈনিকের জীবন যাঁর আদর্শ, সাধ্য থাকতে বিশ্রামসুখ ভোগ তাঁর কাম্য ছিল না।

—'নিরাপদে ঘোড়পাকুড়ী কুচবিহার আলিপুরদুয়ার ও বগুড়া বেড়াইয়া ১৫ দিন পরে হাওড়া ফিরিয়া আসি। উত্তরবঙ্গে তখন বেশ ঠাণ্ডা ছিল, প্রায় বৃষ্টি হইতেছিল। রাত্রে চাদর ও বালাপোষের দরকার হইত। সঙ্গে ৪।৫ জন সেবক ছিল। বেশ আনন্দে ও স্বচ্ছন্দেই কয়দিন কাটিয়াছিল। দ্বিতীয়বার হাওড়া আসিয়া অসহ্য গরম অনুভব করিলাম। কয়েক দিনের জন্য পুরী গিয়া যাত্রা বদল করিয়া আসিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ রাজাসাহেব আসিয়া জানাইল শিলংএ সব বন্দোবস্ত ঠিক, ইচ্ছা করিলে আজই যাওয়া যায়। ৩রা জ্যৈষ্ঠ শিলং রওনা হইলাম। সেবক দুইজন বাসে আসিতেছিল। আমি আগেই শিলং পৌঁছিয়া স্নান করিলাম কিন্তু ভালরূপে মাথা মুছিতে পারিলাম না; পাহাড়ে জল মাথায় বসিল। তৃতীয় দিন কাশি আরম্ভ হইল। শেষ রাত্রি হইতে হাঁপানির টান। প্রাণ যায় আর কি! ডাক্তার ডাকিবার কথা হইল। আমি মনে করিলাম স্নানাহার করিলে অন্যান্য বারের ন্যায় কমিয়া যাইবে। মাথা ধুইলাম, সামান্য আহার করিলাম, কিন্তু কিছু হইল না। বৈকালে আরও বাড়িল। হাঁপানির মধ্যে কাশির চোটে দম বন্ধ হইয়া যাইতে

লাগিল। হার্টের স্পন্দন অস্বাভাবিক হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলাম। ভিন্ন বাড়িতে উপর তলায় আমরা তিনটি প্রাণী। অন্য ঘরে মণি জ্বরে শয্যাশায়ী, কেবল প্রিয়ব্রত* আমার কাছে। প্রয়োজনে অন্য স্থানেও তাকে যাইতে হইতেছে। মানুষের অভাব সেদিন বেশ বুঝিলাম। মরিতে অবশ্য দুঃখ নাই। কিন্তু তোমাদের দারুণ মনোবেদনা দিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আর ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না মনে হইয়া কেবলই কান্না আসিতে লাগিল। একটি দিনের জন্য তোমাদের কাছে যাইবার জন্য প্রাণটা ছটফট করিতে লাগিল। এমন কখনও হয় নাই। রাজা-রাণী আসিয়া ডাক্তার ডাকিতে মটর পাঠাইল। বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বিধান রায় (৩২ টাকা ভিজিট) আসিল। সে ব্লাডপ্রেসার হার্ট ফুসফুস নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল ইনফ্লুয়েঞ্জা, সাবধানে না থাকিলে নিউমোনিয়া হইতে পারে। ব্লাডপ্রেসার ও হাঁপানিতে হার্টের অবস্থা সাংঘাতিক। জ্বর ১০৩° হইতে ১০৪° ইত্যাদি। সে ইনজেকশন করিল, সঙ্গে সঙ্গে হাঁপানির টান কমিয়া গেল। দুই প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ডাঃ রায় চলিয়া গেল।

'প্রাতে ভুবনকে আসিবার জন্য আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করিলাম। পরদিন সে আসিল। হাঁপানিটি কমিয়া যাওয়ায় অনেক সুস্থ বোধ করিলাম। মনেও জোর আসিল। তবে কাশি, বুকে কফের সাঁই সাঁই শব্দ ও জ্বর ৪।৫ দিন থাকিয়া ক্রমশঃ কমিল। আট দিনের দিন অন্নপথ্য দিল। আজ পাঁচদিন ভাত খাইয়াছি। আর ভয়ের কোন কারণ নাই। ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা পাইব।

* এসময় কুটিরে হরেনদার দু'জন সহকারী ছিলেন, মণীন্দ্র ও প্রিয়ব্রত ব্রহ্মচারী।

'* * * ডাঃ রায়ের সঙ্গে আমার একটু ভাব হইয়াছে। তাহাকে আমি স্থায়ীভাবে চিকিৎসার ভার দিতে চাহিয়াছিলাম। সে বলিল "এখানে পাহাড়ের উপর ব্লাডপ্রেসারের জন্য চিকিৎসায় ফল হইবে না। আপনি কলিকাতায় চলুন সেখানে চিকিৎসা করিব। আপনার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। অতি ঠাণ্ডা বা অতি গরম আপনার সহ্য হইবে না। ট্রেন বা মটরে যাতায়াতও বিপজ্জনক। পুরী বা ওয়ালটেয়ারের মত স্থানে স্থায়িভাবে থাকিলে ২।৪ বছর বাঁচিতে পারেন।" ৩।৪ দিনের মধ্যে চলিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিয়া ডাক্তার আজ কলিকাতা চলিয়া গেল। রাজারও সেই মত। কিন্তু একবার জন্মের মত মঠ ও যোগমায়াকেও দেখিয়া যাওয়া কর্তব্য। এত নিকট হইতে চলিয়া গেলে আর বুঝি অবসর পাইব না। মহা সমস্যা।

'মাসীমাকে আনন্দে রাখিতে চেষ্টা করিও। অন্যান্য কুশল। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী ঠাকুর'

এর পরই ২৪শে জ্যৈষ্ঠ হাওড়া হতে চিঠি এল—

'গত কাল বেলা একটায় শিলং মেলে হাওড়া আসিয়াছি। শরীরের অবস্থা বুঝিয়া আর মঠে যাইতে সাহস হইল না বলিয়া মনটা খারাপ হইয়াছে। আর বুঝি যোগমায়ার সঙ্গে দেখা হইবে না।

'আগামী পরশু সোমবার পুরী রওনা হইয়া মঙ্গলবার প্রাতে পৌঁছিব। তবে ডাক্তারের হাতে সব নির্ভর করিতেছে। যদি ২।১ দিন বিলম্ব করিতে হয় তবে পুনরায় জানাইব। নতুবা এই শেং পত্র।'

আগেই বলেছি '৩৬ সালে দার্জিলিঙে ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের সূচনা দেখা দিয়েছিল। তমলুকের প্রবল জ্বর, শিলঙে দারুণ পীড়া—এ-সবই তাঁর আসন্ন দেহপাতের প্রস্তুতি। ডাঃ বিধান রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যভাবে সত্য হয়েছিল কিন্তু। খুব ভালভাবে তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র পরীক্ষা করে ডাঃ রায় বলেছিলেন 'আপনার হার্টের যা অবস্থা তাতে বড় জোর ৫।৬ বৎসরের বেশি ও আর কাজ করবে না।' 'কি করে বলছেন? আয়ুর কথা কি বলা যায়?' ঠাকুর কৌতূহলী হয়ে জানতে চান। তাতে নাকি বিধান রায় বলেছিলেন 'আয়ুর কথা বলা যায় না সত্য। কিন্তু যন্ত্রটা কতদিন চলবে সেটা একরকম বলা যায় মশাই। ভাল ঘড়ি মেরামত করে যারা তারা ঘড়ির স্পন্দন শুনে বলে দেয় কত দিন চলবে ওর হেয়ার স্প্রিং, দম ফুরাতে কত দেরী। এ-ও তাই। আপনার হার্টের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভাল করে দেখে যা বুঝছি তাতে এ-যন্ত্রের পাঁচ-ছয় বৎসর চালু থাকাই যথেষ্ট। তার বেশি কাজ দেবে বলে মনে হয় না।'

পুরী এসে ডাঃ রায়ের মন্তব্য জানিয়ে ঠাকুর স্মিতমুখে বলেছিলেন 'বিধানের বিধান অকাট্য।' তার মানে হয় তো এই যে দৈববলে আয়ু-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলেও ঠাকুর তা চাননি। তিনি বিশ্বের সাধারণ বিধানে চলতেই মনস্থ করেছিলেন। ডাঃ রায় বলতে চেয়েছিলেন যন্ত্র বিকল হলেও অভাবিত উপায়ে কখন কখন তার বৈকল্য ভাল হয়েও যায়। এইটাই তাঁর মতে আয়ু—কোনও বড় ডাক্তার জন্মমৃত্যুব্যাপারে দৈবকে অস্বীকার করেন না বা করতে পারেন না। তিনি বলেছিলেন যান্ত্রিক নিয়মের কথা। সে নিয়ম উল্টে দেওয়ার ইচ্ছা ঠাকুরের ছিল না।

আষাঢ় মাস নাগাদ পুরী এসে মাস দেড়েক বিশ্রাম নিয়ে একটু সুস্থবোধ করতেই ঠাকুরমা ও আমাদের নিয়ে ঠাকুর গুরুধামে রওনা হলেন। যে তিন-চার মাস ঠাকুরমা ছিলেন আমাদের কাছে—মায়েরা অবসর পেলেই তাঁর কাছ থেকে ঠাকুরের কথা শুনতেন। তাঁর বাল্য কৈশোরের কিছু অপ্রকাশিত তথ্য গোবিন্দমোহিনী দেবীর কাছেই আমাদের শোনা। মা-ঠাকুরাণী দেখতে কেমন ছিলেন, বন্ধুর জন্য পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি বলে ভট্‌চাষ-বাড়ির ছোট জামাই হরিপদ মুখুয্যে মশাই কেমন ক'রে ঠাকুরকে নিয়ে গিয়েছিলেন হালিসহরে, এমনি আরও কয়েকটা ঘটনা তিনি বলেছিলেন। আমরা যখন দেখেছি তখন অনেকটা স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে বৃদ্ধার। বলতেন 'এখন আর কি মনে আছে কিছু? সব যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।' যাই হ'ক পুরীতে একবার রথ দেখার ইচ্ছা ছিল তাঁর। 'নলিনের কল্যাণে সেটি হল' বলে বৃদ্ধা খুবই আনন্দ প্রকাশ করতেন।

পুরী থেকে সদলবলে এসে হাওড়ায় ওঠা হ'ল ২০৩, পঞ্চাননতলা রোড বা আমার দাদামশাইয়ের বাড়িতে। ঠাকুরের অন্যতম গৃহস্থ ভক্ত-শিষ্য বলে সারস্বত সংঘে একদা যিনি বহুখ্যাত ছিলেন, সজ্ঞানে সেই প্রথম চিনলাম তাঁকে। দার্জিলিঙ্ যাওয়ার পথে একবেলা কি একদিন ছিলাম ওখানে আগেই বলেছি। কিন্তু সেবারের দেখাটা মনে নাই। এইবারই ঠিক পরিচয় হল। ২০৩ নম্বরের উপরের দালানে বসেছেন ঠাকুর, তাঁকে প্রণাম করে পাখা হাতে বাতাস করছেন দাদা-মশাই—ঝড়ের মত পাখা চলছে তাঁর, যাতে খুব জোরে হাওয়া লাগে ঠাকুরের, এই ছবিটা মনে ফুটে আছে দেখছি। সেটা কবে কোন্‌দিন তা বলতে পারব না। কিন্তু আমার মনে তাঁর প্রথম ছবিটা ওই রকম। বাঙালীর ঘরে তখনকার দিনেও ফণীবাবুর মত স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ ক্ষত্রতেজমণ্ডিত

দেহ বড় সুলভ ছিল না। রং ছিল কাল—একটু বেশি রকমই কাল বটে কিন্তু পেটা লোহার মত প্রাণসার বপু দীর্ঘাকৃতি সুঠাম মানুষটিকে দেখলে অজ্ঞাতে মনে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম জাগত। অন্তত আমার তো জেগেছিল। ঠাকুরকে দেখে আমার প্রথম যে অনুভূতি তা অবিমিশ্র ভয় সে তো বলেইছি। হাওড়ায় এসে এই ভদ্রলোককে দেখেও ভয় হল। অথচ দার্জিলিঙে রাজাসাহেবকে দেখেছি আমি—তিনিও দীর্ঘচ্ছন্দ সুপুরুষ, স্বাস্থ্যে ভরপুর, কিন্তু ভয় করিনি তাঁকে। একা মেয়েদের মাঝে মানুষ হওয়ায় অচেনা লোক দেখলেই সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে যেতাম, পালাতাম। রাজাসাহেবের সামনেও কোনদিন যেতে চাইতাম না—তিনি আদর করে কোলে নিতে চেয়েছেন কতদিন, উঁহু। তাবলে ভয় পাইনি তাঁকে দেখে। কিন্তু সেদিন যখন আমায় কাছে ডেকে নিয়ে বাবা পরিচয় করে দিলেন, 'লীলা ইনি তোমার মায়ের বাবা—দাদামশাই তোমার'—আমি তখন বিড়ালছানার মত বাবার দুই হাঁটুর মধ্যে ঢুকে পড়েছি। ভীষণ ভয় করছে আমার। পাখাটা বুঝি মায়ের হাতে দিয়ে (তখন পাখা ছিল কি-না তাঁর হাতে আজ তাও ঠিক স্মরণ হয় না) হাত বাড়ালেন দাদা-মশাই—'কোলে এস দিদিমণি।' বয়ে গেছে আমার কোলে যেতে—বাবাকে বিশ্বাস হল না আর। কি জানি যদি ঠেলে দেন জোর করে। চট করে তাঁকে ছেড়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরলাম দিদিকে (সরযূ-মা)। হাসির রোল উঠল ঘরে। দিদি আমায় তখন কোলে তুলে নিয়েছেন। ঠাকুর আবার বললেন—'আর এই আমার বড় মেয়ে সন্তোষ—লীলা ইনি তোমার দিদিমণি', মুখ তুলে তাকালাম সঙ্গে সঙ্গে—কে রে বড় মেয়ে বাবার? দার্জিলিঙে রাণীসাহেবার উপরে হিংসা হয়েছিল আমার। এখানেও বড় মেয়ে শুনে মোটেই ভাল লাগল না। কিন্তু মুখ তুলে চাইতেই চোখাচোখি হল উজ্জ্বল গৌরবর্ণা সৌম্যকান্তি মাতৃমূর্তি

একজনের সঙ্গে। হেসে হাত বাড়ালেন তিনি—দিদির কোল থেকে নির্ভয়ে অমনি আমি তাঁর কোলে চলে গেলাম। তাঁকে আর হিংসা করতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত। কেন তা বলতে পারব না।

আমার ছোট্ট গণ্ডীর বাইরে অনাত্মীয় পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার সেই প্রথম। কিন্তু মায়েদের ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে এমনভাবে মিশতে দেখলাম সে পরিবারটির সঙ্গে যে আমার সহজেই মনে হল এঁরা আমাদেরই একজন বটে। দার্জিলিঙে এ অবাধ মেলামেশা তো ছিল না রাজপরিবারের সঙ্গে! তাহলে সত্যি এঁরা আমার দাদামশাই দিদিমণি মামার দল—শিশুমনে এ-ধারণা পাকা হয়ে গেল। রীতিমত বড় হওয়ার আগে পর্যন্ত সে ধারণা আমার ভাঙেনি। আর ভাঙলেও, হাওড়ার মিত্রপরিবারের সঙ্গে যে-হৃদ্যতা ছিল তা টোটেনি কোনদিন। ও যে ঠাকুরের মধ্যস্থতায় গড়ে ওঠা হৃদ্যতা। আত্মীয়সম্পর্কের চেয়েও বড় পরমার্থসম্পর্ক।

দাদামশাই দিদিমণি আর তাঁদের ছোট ছেলে খোকাও (গুরুদাস) চলল আমাদের সঙ্গে গুরুধামে। আমার চেয়ে বছরদুই-এর বড় হবে খোকা—তাকে মামা ডাকার অবসর পাওয়ার আগেই এমন খেলা জুড়ে দিলাম দু'জনে যে শেষে বাবাও আর তাকে মামা পদবীতে তুলে দিতে পারলেন না। মায়েদের বললেন, 'থাক, ওরা দু'জন এ ওর নাম ধরেই ডাকুক, প্রায় সমবয়সীই তো!' গুরুধাম যাওয়ার পথে দিদিমণি ও খোকার সঙ্গে রীতিমত ভাব-সাব হয়ে গেল সে-বার। সে-বার বিমলা মাসীমাও আমাদের সঙ্গী ছিলেন। নীলাচল কুটিরে এর আগেই তাঁর সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছিল। কিন্তু এই সময় হতে ভালরকম আত্মীয়তার সূত্রপাত হল।

কুতবপুরে গিয়ে ভাল লাগল না সত্যি কথাই বলব। গুরুধামের মহিমা বোঝবার বয়স আমার তখনও হয়নি। বাংলার গ্রাম দেখলাম সেই প্রথম—দেখে মোহিত হওয়ার কিছু পাইনি। শুকনো খটখটে পুরীতে মানুষ আমি আর ঊর্মিমুখর বিশাল সমুদ্র উদার দিগন্ত আমার নিত্যপ্রত্যক্ষ। আকাশে-বাতাসে সেখানে প্রকৃতির অবাধ বৈপুল্যের একটা ইঙ্গিত পেয়েছি বয়সে শিশু হলেও। সেই দৃষ্টিতে মজে যাওয়া ভৈরব নদ বাঁশবাগান ঝোপঝাড়ে আর হাঁটুভর কাদায় ডোবা কুতবপুর আমার মনে হল যেন একটা বিভীষিকা। ফলে দার্জিলিঙের সব ছবি যেমন মনে আছে সে তুলনায় কুতবপুরের কিছু আমার মনে নাই। এমন কি গুরুধামের মন্দিরও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আর সে কী মশার কামড়! মশার কামড়ে গুরুদাসের গায়ে পাঁচড়ার মত চুলকানি বেরিয়ে গেল। প্রাতঃকৃত্য সারতে মাঠে বা বাগানে যাওয়া, ওঃ সে-ও এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

ওরই মধ্যে মনে আছে নিগমানন্দ সারস্বত বিদ্যালয়ের প্রাসাদটি—দু'দণ্ড চেয়ে দেখার মত বটে। আর মনে আছে রাধাকান্তপুরের বসতবাড়ি—ঠাকুরের মাতুলালয়। কয়েকদিন কুতবপুরে থাকার পরই সদলবলে রাধাকান্তপুরে আসা হল। একটা কথা কিন্তু আজ ভাবলে আশ্চর্য লাগে। প্রকৃতির রম্য সৌন্দর্য আর বড় বড় শহরের অনায়াস জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আমার চেয়ে ঠাকুর অনেক বেশি দেখেছেন। কিন্তু বর্ষাকালের সেই অজ পাড়াগাঁয়ে মাটির ঘরেও তাঁকে হাসিমুখে আনন্দ করতে দেখেছি। আর্যদর্পণে স্বামী যোগানন্দজীর ও শ্রীশশধর চক্রবর্তীর লেখায় ঠাকুরের গুরুধাম-বাসের কিছু বর্ণনা আছে। সেটি আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে। তিনি সেখানে ওই গ্রামের ছেলে ওই বাড়ির মানুষ এই ভাবেই বিভোর থাকতেন। গ্রাম্য পরিবেশের

কদর্যতায় বিন্দুমাত্র বিরাগ দেখিনি। আজ যদি তিনি থাকতেন, কুতবপুর গ্রামসম্বন্ধে আমার মন্তব্য পড়ে ভ্রূকুটি করতেন নিশ্চয়। তাই ভয়ে এখানেই থেমে যাচ্ছি। তিনি দয়া করে একবার নিয়ে গিয়েছিলেন তাই—তা না হলে পুণ্যভূমি কুতবপুর যাওয়ার সৌভাগ্য এ জীবনে আর হত না। আজ উদ্দেশে প্রণাম করছি কাদা-জঙ্গলে ভরা সেই ছোট্ট গ্রামটিকে। একা আমি তো নই—এ যে জগতেরই নিয়ম। পদ্মফুলটিকে আদর করে তুলে আনে লোকে, কোথায় কোন্ পুকুরে তার জন্ম সে আর পরে মনে করে না। কিন্তু এ-বিচারে আমাদের রুচি-অরুচি রাগ-বিরাগ কতই না মিথ্যা। আমরা যা দেখে নাক সিঁটকাই তার বুকে হয়তো সম্ভাবিত হচ্ছে কমলযোনির কোন দিব্য স্বপ্ন। তাই ঋষির দৃষ্টিই সত্য—এই ধূলার ধরণী হিরণ্যবক্ষা অদিতি, একটি কণাও তার হীন নয় দীন নয়।

রাধাকান্তপুরের দোতলা বাড়িটি মনে পড়ছে। বাড়ির গা ঘেঁষে নারকেল গাছ চারদিকে, বেশ খোলা উঠান। উপরে একটা ছাদও ছিল মনে পড়ছে যেন। অন্নপ্রাশন ছাড়া ঠাকুরের জাতকর্ম উপনয়ন বিবাহাদি সবই হয়েছিল এই বাড়িতে। ঠাকুরমা ও খুড়িমারা সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে ছিলেন কোথায় কোন্ শুভকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। এতকাল পরে আমাদের সেসব আর স্মরণ হয় না। কেবল মনে আছে একদিনের এক আনন্দভোজের কথা। রাধাকান্তপুরের লম্বা দালানে তিন ভাই বাড়ির সব ছেলেমেয়েকে নিয়ে খেতে বসেছিলেন। ঠাকুরের ইচ্ছাতেই এ-ব্যবস্থা হয়। ঠাকুর মাঝখানে, তাঁর এক পাশে বসলেন রামজী, অন্যপাশে তারাপদজী। তাঁদের বিপরীত দিকে সারি দিয়ে বসলেন বাড়ির ছেলে-মেয়েরা, নরেনদা নারায়ণ জয়রাণী। জয়রাণীর কথাটা খুব মনে আছে। শ্রদ্ধেয় রামজীর একমাত্র মেয়ে সে, গোলগাল

সুন্দর পুতুলের মত দেখতে, শামলা রং। বয়সে আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট বোধহয়। মেয়েটি প্রাণচঞ্চলা—দুদিনেই জেঠামশায়কে (আমাদের ঠাকুরকে) পেয়ে বসেছিল একেবারে। দিনরাত সবসময় ঘুরত তাঁর কাছে-কাছে। জন্মোৎসবের দিন গুরুধাম-মন্দিরে সে নাকি জয়গুরু বলে উদ্দাম হয়ে নেচেছিল—মায়েদের কাছে শুনেছি। জয়-রাণীকে ঠাকুরও একটু স্নেহের চোখে দেখেছিলেন। হয়তো তিনি জানতেন ও বেশিদিনের জন্য সংসারে আসেনি। কিশোর বয়সেই জয়-রাণী চলে গিয়েছে মর্ত্যের মায়া কাটিয়ে। জীবনে আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে—কিন্তু তার হাসিভরা মুখ আর বড় বড় কাল দুটি চোখের চঞ্চল দৃষ্টি আজও স্মরণে জাগে।

সে-বার গুরুধাম যাবার সময় দুই ভাইয়ের ছেলে-মেয়েগুলির জন্য ঠাকুর কয়েকটি ছোট রূপার বাটি আর আংটি নিয়ে গিয়েছিলেন মনে পড়ে। বাটিগুলি ঘিয়ের বাটি হতে পারে এই রকম ছোট। মোটকথা, সে-বছর কুতবপুর রাধাকান্তপুরে একান্তে ঠাকুর কয়েকদিন আত্মীয়দের নিয়ে আত্মীয়তার অভিনয় করে এসেছিলেন। দিন ফুরিয়ে আসছে ক্রমেই—আমরা না জানলেও তাঁর সর্বদাই মনে থাকত নিশ্চয়।

গুরুধাম হতে ফিরে হাওড়ায় ফণীবাবুদের বাড়ির পাশেই ওই বাড়ির অন্য অংশটা ভাড়া করা হল—২০৪নং পঞ্চাননতলা রোড। আমাদের নিয়ে ঠাকুর ওই বাড়িতে উঠে কয়েক মাসের স্থায়ী আস্তানা পাতলেন সেখানে। খড়কুসমা আর্যদর্পণে (১৩৬৫—১৩৬৬) ফণীবাবুর ভাগিনেয় শ্রীশুকদেব সেন—আমার ছেলেবেলার মাষ্টার মশাই বা শুকো মামা 'পথের গুরু' নিবন্ধে এই সময়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। কৌতূহলী পাঠক অনেক তথ্য পাবেন ওই সুলিখিত রচনাটিতে।

তখন আমার কাজ ছিল পাশের বাড়িতে গিয়ে মামাদের উপরে উৎপাত করা। আমি ঠাকুরের মেয়ে—অতএব যতই বাঁদরামি করি না কেন, কারও কিছু বলার সাহস হবে না। সুতরাং আর পায় কে? এ-বাড়িতে এটা করিস্ না ওটা বলিস্ না—কত বিধি-নিষেধ। ও-বাড়িতে অবাধ স্বাধীনতা। কাজেই ফাঁক পেলেই চলে আসছি দিদিমণির কাছে। সেই এতটুকু বয়েসেই এমনি করে গভীর স্নেহের বন্ধন গড়ে উঠেছিল মিত্রপরিবারের সঙ্গে। বাইরে সবাই জানতেন ঠাকুরের কাছে লীলার অবাধ প্রশ্রয়। কিন্তু আমি যে কিরকম ভয় করতাম তাঁকে আর তুচ্ছ ব্যাপারেও এক-একদিন কেমন শাসন করতেন তিনি, সেটা অনেকেই জানেন না। খুব ছোট থেকেই তাঁর নির্দেশ ছিল সমুদ্রতীর ছাড়া অন্য কোথাও বেড়াতে যাবে না। অন্য কোথাও অর্থে লোকের বাড়ি। আমার সঙ্গী-সাথী চিরদিনই আমি নিজে। তবে পুরীতে ডাক্তারবাবুদের পরিচয়-সূত্রে এক ব্রাহ্মণপরিবারের সঙ্গে মায়েদের আলাপ হয়ে যায়। সে-বাড়িতে আমার বয়সী দুটি ছেলে-মেয়ে ছিল। তারা আমাদের বাড়ি আসত মাঝে মাঝে। আমাকেও প্রায়ই যেতে বলত। অনুমতি নাই যাবার, খুব ইচ্ছা হলেও যেতে পারতাম না। একদিন দৈবক্রমে ডাক্তার-মায়ের এক বোনপো আমায় নিয়ে বেড়াতে বার হলেন। কথা ছিল সমুদ্রতীরে যাবার কিন্তু আমার অনুরোধে তিনি আমায় একটুখানি সেই আমার বন্ধু-বান্ধবীর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দু'চারটে কথা কয়েই চলে আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু তারা আমায় আর ছাড়ে না। খেলনা পুতুল আর তাদের নিয়ে খেলতে খেলতে আমিও মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে বসলাম। প্রমাদ গণে' সঙ্গী ভদ্রলোক যত তাড়া দেন ততই বলি আর একটু পরে। নেশা যখন ছুটল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। রাস্তায় নেমেই বুঝলাম কাজটা বড় খারাপ করেছি—কপালে আজ কি আছে কে জানে!

নীলাচল কুটিরে ততক্ষণে সাড়া পড়ে গেছে—কোথায় গেলাম আমি তার সন্ধান নিতে হরেনদা বা আর কেউ বেরিয়েছেন। ছাদে আমার পথ চেয়ে বসে আছেন ঠাকুর স্বয়ং। কড়া নাড়তেই তিনি নিজে এসে দাঁড়ালেন ছাদের আলসের কাছে 'কে ?' সেই গম্ভীর প্রশ্নে ডাক্তার-মার আত্মীয় ছেলেটি সভয়ে উত্তর দেন—'আমি, খুকীকে নিয়ে এসেছি।' আমি আর নাই—প্রাণ উড়ে গেছে প্রশ্নের ভঙ্গিতেই। 'এতক্ষণ কোথায় ছিল ও ?' আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পেয়ে আমার বাহন বেচারী বলেন 'ছিল বিমলদের বাড়িতে। আমি কখন থেকে বলছি চল বাড়ি যাবে। খুকী কিছুতেই আসতে চায় না।' 'তাহলে যেখানে ছিল সেইখানেই যেতে বল তোমাদের খুকীকে। এখানে আসার দরকার নাই' বলে সরে গেলেন আমার ভাগ্যবিধাতা। সহজে সে-রায় উল্টায়নি সেদিন। ডাক্তার-মা হরেনদা ডাক্তার-মায়ের সেই বোনপো—অনেকের অনুনয়-বিনয়ে তারপর নীলাচল কুটিরের দরজা খুলেছিল আমার জন্য। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ, মুখদর্শন না করাও চলেছিল হয়তো তিন-চার দিন। মোটকথা, এমন শাসিত হয়েছিলাম যে কারও বাড়ি যাওয়ার রুচিটা সেই শৈশবেই যেন মরে গিয়েছিল। সেই আমি দাদামশাইয়ের ওখানে যাবার অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম। সে যে কী মুক্তির উল্লাস! তাছাড়া ঠাকুরের কাছে যেমন শাসনে থাকতাম ঠিক ততখানিই তোষণ পেতাম দিদিমণির কাছে। আমার কোন অত্যাচারেই কখনও তাঁরা বাধা দিতেন না। আমিও দিনরাত ওইখানেই পড়ে থাকতাম। ফলে একটা জিনিস তখনই চোখে ঠেকেছিল। দাদামশাইকে কী নির্ভর করতেন বাবা! সব ব্যাপারেই তাঁর কাছে ফণীর ডাক পড়ত।

তারই মধ্যে একদিন আবার কি হল কে জানে! হঠাৎ এ বাড়ি আসা বন্ধ করলেন দাদামশাই। ঠাকুরের উপর কি কারণে কে জানে

রাগ (না অভিমান ?) হয়েছে তাঁর। মায়েদের মুখে আভাস পেয়ে ঠাকুরেরও রাগ অভিমান যাই-ই হ'ক, হ'ল। ব্যস, সে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। জ্ঞানবুদ্ধিতে যত বড়ই হন না কেন, হৃদয়ের ব্যাপারে আমাদের ঠাকুরকে ছেলেমানুষ বললে অত্যুক্তি হয় না। একদিকে যেমন প্রবীণতার শেষ ছিল না তাঁর, অন্যদিকে বালকস্বভাবেরও চূড়ান্ত। শিষ্য-ভক্তের ব্যবহারে মনে ব্যথা পেয়ে খেতে পারতেন না, রাত্রে ঘুম হত না ভাল করে, চোখে জল ঝরত কতবারই দেখেছি। সে-বারও ঠাকুর মনে ভারি কষ্ট পেয়েছিলেন। দাদামশাইও তাঁর তেমনি অবুঝ আব্দেরে ছেলে। মন-কষাকষিটা আরও বাড়িয়ে তোলার জন্যই হয়তো—পাশের বাড়িতে ঠাকুর থাকা সত্ত্বেও পূজার ছুটিতে তিনি চলে গেলেন বাইরে বেড়াতে। দিদিমণি অত্যন্ত আপত্তি করেছিলেন। যেতে বারণ করা সত্ত্বেও গৃহকর্তা শুনবেন না দেখে, শেষে বললেন 'যেতে হয় তুমি একা যাও।' তা-ই চলে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর ?

সে দিনটার কথা আমার বেশ মনে আছে। সকাল বেলা সেই ২০৪নং পঞ্চাননতলার দোতলায় বারান্দার এক প্রান্তে ঠাকুর জলচৌকিতে বসে মুখ ধুচ্ছেন। ও-বাড়ির পূবদিকটা ছিল ফাঁকা—মস্তবড় একটা পুকুর ছিল ওখানে। দোতলার বারান্দায় ওই পূবদিকে বড় জানালা একটা। সে জানালা দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ঠাকুর সেই খোলা জানালার সামনেই বসেছেন সুখাসনে—ডান পা-খানি বাম উরুতে রাখা। বাম হাতে মাজন, ছায়াচ্ছন্ন মুখে করুণ গাম্ভীর্য। ক'দিন ধরেই মুখখানি ওই রকম দেখছি মনে পড়ে। দাদামশাইয়ের সঙ্গে একটা মন-কষাকষি হয়েছে মায়েদের মুখে শুনে আমার পর্যন্ত জানা হয়ে গেছে সেটা। সেই মানুষ হঠাৎ সোজা হয়ে বসে সহর্ষে বলে উঠলেন 'ফণী না ?' জল-চৌকির পাশেই মাটিতে বসে মা জলের ঘটি হাতে অপেক্ষা করছিলেন,

ঠাকুরের হাতে জল ঢেলে দেবেন—চকিত হয়ে বললেন 'কই ঠাকুর, কোথায় দেখলেন ? বাবা তো আসেননি !' খেলা ছেড়ে আমি এবং কোন একটা হাতের কাজ ফেলে সরযূ-মাও কৌতূহলী হয়ে এসে দাঁড়াই —কোথায় ফণীবাবু, কাকে দেখলেন বাবা ? 'ওই যে যাচ্ছে—বাজারের থলি হাতে ফণীই তো' হাত তুলে রাস্তা দেখিয়ে দিলেন ঠাকুর। ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তিনজনই—দ্রুত পায়ে এক ভদ্রলোক মিলিয়ে গেলেন রাস্তার বাঁকে। তিনিই যে দাদামশাই নিঃসংশয় হতে পারি না। কিন্তু যিনি প্রথম দেখেছিলেন তাঁর সংশয় নাই—আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ক'দিনের বিষণ্ণ মুখ। ছেলেমানুষের মত একগাল হেসে বললেন 'ফণী এসেছে – খোঁজ নিয়ে দেখ। আমি ওর হাঁটা চিনি—ভুল হয়নি আমার।' আমি ছুটলাম সন্ধান নিতে। সত্যই ফিরেছেন দাদামশাই ; আগের দিন রাত্রে এসেছেন তাই আমরা তখনও পর্যন্ত জানি না। সকালে উঠে বাজারে গেছেন তা-ও ঠিক। ফিরে এসে খবরটা দিলাম পিতাঠাকুরকে। কী আনন্দ তাঁর ! এত আনন্দের কি ছিল ? ফণীবাবু পূজার পুরো ছুটিটা বাইরে কাটাবেন বলে গিয়েছিলেন কিন্তু দশ-বার দিন যেতে না যেতেই ফিরে এসেছেন—শুধু এইটুকু। ফণী চলে যাওয়ায় মন ভার হয়ে ছিল তাঁর, সে ফিরেছে জেনেই খুশির অবধি রইল না—এ যে কত বড় স্নেহের অভিব্যক্তি, অন্যে হয়তো বুঝবে না। দাদামশাই কিন্তু বুঝেছিলেন। মায়ের মুখে সকালের ঘটনাটা শুনে চোখ ছলছল করতে লাগল তাঁর, কথা বলতে পারলেন না চুপ করেই রইলেন। বিকালের দিকে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে সদালাপ শুরু করলেন। আহা ! যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন তাঁর ঠাকুর। ফিরে এলেও কে জানে ফণী হয়তো রাগ করে তাঁকে এড়িয়েই চলবে। তাহলে কি করে প্রসন্ন করবেন ওই জিদী মানুষটিকে, নিশ্চয়ই এ নিয়ে ঠাকুরের

মনে দুর্ভাবনা ছিল। অতএব ফণী যখন বিনা সাধ্য-সাধনায় তাঁর সন্নিহিত হল, তিনি আহ্লাদে গলে গেলেন।

আর কারও কথা জানি না কিন্তু দাদামশাইকে নিয়ে স্নেহ-প্রীতির ক্ষেত্রে ঠাকুরের হৃদয়োচ্ছ্বাস ও ব্যাকুলতা অনেক দেখেছি। সামান্যতেই মানাভিমান চোখে জল আসা, মন খারাপ, আবার অল্পেই উছলে উঠা হর্ষমুখরতা। আশে পাশে সকলেরই রীতিমত ছেলেমানুষী বলে বোধ হত সে-সব। অভ্রভেদী গাম্ভীর্যে আত্মসমাহিত গুরুভাবের পাশাপাশি এই রমণীসুলভ চিত্তবৈকল্য যেন একেবারে খাপছাড়া ব্যাপার। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নাই দু'টিই ছিল তাঁর মধ্যে। জ্ঞানের অতলতায় যোগেশ্বরের অচলপ্রতিষ্ঠা আর স্নেহ-প্রেমের নিঃসীম বাহুল্যে রসোদ্‌গারের বিক্ষুব্ধ অধীরতা—এ দুয়ের জোয়ার-ভাঁটা খেলত তাঁর চরিত্রে। তাঁর স্বভাবের এ-বৈষম্য যাঁরা না বুঝেছেন তাঁদের পক্ষে ঠাকুরকে পুরোপুরি ধারণা করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। সমস্ত গৃহীভক্তের মধ্যে এক দাদামশাই বোধহয় ঠাকুরের এই স্বভাববৈচিত্র্যটা সব চেয়ে বেশি তলিয়ে বুঝেছিলেন। তার কারণ তিনি নিজেও ছিলেন জটিল চরিত্রের মানুষ। অনেক আপাত-বৈষম্য ছিল তাঁর মধ্যে। গুরুর স্বভাবে তারই বৃহত্তর প্রতিরূপ দেখে তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। তাঁর মুখে ঠাকুর সম্বন্ধে একটি মন্তব্য শুনেছি যা আর কারও মুখে কখনও আমি শুনিনি। বলতেন—'ও (ঠাকুর) কতবড় জ্ঞানী কি যোগী না সাধু আমি এ সব বুঝি না। আমি ভালবাসি মানুষটাকে। অমন প্রেমের মানুষ আর কোথাও দেখিনি।' ঠাকুরের তিরোভাবের পর কত দিনের কত ছোটখাট ঘটনার কথা তুলে তিনি সজল চোখে আক্ষেপ করতেন 'সে আমায় যা ভালবাসত স্ত্রী পুত্র পরিবার কারও কাছে তা পাইনি। কিন্তু পাষণ্ড আমি, একটা অর্থপিশাচ,—টাকা মান যাগ-

ছেলেই আমার বড় হল, সে-লোকটাকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে পারলাম না!' ফণীবাবুর এ কথা-ক'টি প্রণিধানযোগ্য।

সাল তারিখ কিছুই আজ আর আমাদের স্মরণ নাই। হয় পুরীর বাড়ির উইল সম্পাদন নয়তো ট্রাষ্টডিড নিয়ে আলোচনার জন্য—ঠাকুরেরই এমনি কোনও প্রয়োজনে একবার ফণীবাবু নীলাচল কুটিরে এসেছিলেন। তিনি এসে প্রণাম করে দাঁড়াতেই ঠাকুর বললেন 'এ কি? তুমি এলে, সন্তোষকে আননি?' ফণীবাবু নিরুত্তর। তৎক্ষণাৎ হরেনদাকে ডেকে আদেশ হল 'টেলিগ্রাম করে দাও, গুরুদাসকে নিয়ে সন্তোষ যেন চলে আসে। এখানে স্টেশন থেকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা থাকবে।' ঠাকুর স্থূলে বর্তমান থাকাকালে দিদিমণি সেই একবারই নীলাচল কুটিরে এসে দিন ১০।১২ ছিলেন। সপরিবার অশ্বিনীবাবু যেমন পরমাদরে গৃহীত হয়েছিলেন, মিত্রপরিবারকেও ঠাকুর ঠিক তেমনি সমাদরে গ্রহণ করলেন।

ঠাকুরের 'বড় মেয়ে সন্তোষ' আজও তাঁর সেই যত্ন ও আত্মীয়তার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। আর কখনও তিনি পুরীতে যাননি, যেতে চাননি। যাওয়ার কথা কেউ কখনও তুললে বলেন, 'সেবার আমি বাপের বাড়িতে গিয়ে ঠিক তাঁর মেয়ের মতই আদর পেয়ে এসেছিলাম। আর কার কাছে যাব? কি করতেই বা যাব? তিনি তো আর নাই যে সর্বদা খোঁজ করবেন, সন্তোষ কি দেখল না দেখল, কোথায় গেল, কেমন থাকল!' বলতে গিয়ে গলা ধরে যায়—আঁচলে চোখ মোছেন তাড়াতাড়ি।

তীক্ষ্ণধী আর হৃদয়বান্ এই ছিল ফণীবাবুর পরিচয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় বুদ্ধির চেয়ে তাঁর হৃদয়াবেগই প্রবল হ'ত, ফলে এমন একেকটা কাজ করতেন যাতে পাঁচজনের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। অথচ সব মিলিয়ে

মানুষটি ছিলেন সৎ। মানুষভাবের বিচারে আমাদের ঠাকুরও এই শ্রেণীর। এজন্য তাঁর এই শিষ্যটি তাঁকে অনেকটা বুঝতে পারতেন। বড় হয়ে ফণীবাবুর দৃষ্টিতে ঠাকুরকে নতুন করে চিনেছি।

সুখে-দুঃখে অনুদ্বিগ্ন অভয় অমৃতাস্বাদে স্থিতধী নিত্যযুক্ত প্রসন্নাত্মা—ঠাকুরের এই এক পরিচয়। আবার ক্ষণে রুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট কাণ্ডাকাণ্ড-বিচারশূন্য খামখেয়ালী—এ-ও তাঁর এক পরিচয়। তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি ঘটনা এখানে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আসর জমিয়ে গল্প বলায় দাদামশাইও কম যেতেন না। তাঁর মুখে বড় সুন্দর লাগত ঠাকুরের গল্প। এ-ঘটনা দুটির সাক্ষী ছিলেন তিনি নিজে।

প্রথম ঘটনাটার সময় বা কার্য্যকারণ সঠিক বলতে পারি না এখন। ব্যাপারটা এইরকম। ঠাকুর বরাবরের মত হাওড়ায় এসে দাদামশাইয়ের ওখানে উঠেছেন। সঙ্গে সেবক ব্রহ্মচারী হিসাবে হয়তো হরেনদা ছিলেন। আরও দু'চারজন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীও থাকতে পারেন। সারস্বত মঠের বর্তমান মোহান্ত শ্রদ্ধেয় আত্মানন্দ মহারাজ যে ছিলেন এইটি কেবল নিশ্চয় করে জানা আছে। সেদিন ঠাকুরের ভোগ-শেষে সেবক ও সমবেত শিষ্য-ভক্তরা প্রসাদ নিতে বসেছেন। হঠাৎ সিঁড়িতে রুদ্রতালে চটাপট্ চটির আওয়াজ। এ কি? ঠাকুর নেমে আসছেন না কি এ সময়ে? ত্রস্তবিস্ময়ে চায় সকলে, হ্যাঁ ঠাকুরই। ভোগ শেষে বিশ্রাম করছিলেন। যে ভাবে ছিলেন ঠিক সেই ভাবেই যেন নেমে এসেছেন—জামাটা গায়ে গলিয়েছেন কি-না ঠিক নাই, হাতে ছড়ি। নীচে নেমেই সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ করে চড়াগলায় বললেন 'একখানা গাড়ি ডাক্ এখনই স্টেশনে যাব—মালপত্র গুছিয়ে নে হরেন'—বলেই দ্বিতীয় কথার অবকাশ না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বৈঠকখানার দরজা দিয়ে। সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীরা তৎক্ষণাৎ পাতা ছেড়ে উঠে পড়ে আদেশ

প্রতিপালনে লেগে গেলেন। খাওয়া ভুলে চাপা গুঞ্জন তুললেন অন্তরা—'কি হল ফণী? কি ব্যাপার ভাই?' ফণীবাবু মাথা হেঁট করে বসে থাকেন। অপরাধ তাঁরই তিনি বুঝেছেন। কিন্তু এভাবে শাস্তি পেতে হবে ভাবতেও পারেননি। ঠাকুরের অবাঞ্ছিত কোনও ব্যক্তিকে তিনি বাড়িতে স্থান দিয়েছিলেন কি সাহায্য করেছিলেন বা অন্তরঙ্গতা করেছিলেন তার সঙ্গে—এমনি কিছু একটা হবে। সংক্ষেপে দোষ স্বীকার করে গুম্ হয়ে থাকেন ফণীবাবু। ওদিকে গাড়ি ডেকে উঠে বসেছেন ঠাকুর—মালপত্র তোলা হতেই গাড়োয়ান গাড়ি ছেড়ে দিল; কারণটা কি না বুঝে গৃহী শিষ্য-ভক্তরা মধ্যস্থতা করতে সাহস করেননি। ততক্ষণে ঠাকুর রওনা হয়ে গেছেন—সেবক ও সন্ন্যাসীরা তাঁর সঙ্গ ধরেছেন। তাঁরা যে ঠাকুরকে এ বাড়িতে থাকতে অনুরোধ করবেন না, এ জানা কথা। কোনও গৃহস্থ বাড়িতে তাঁদের ঠাকুর যদি থাকতে অপমানিত বোধ করেন বা তাঁর অসুবিধা হয়—তাঁরা কেন বলবেন সেখানে থাকতে? আর সেবকদের কারও কাছ হতেই ফণীবাবুর অপরাধটা ঠাকুরের কানে উঠেছিল এ-ও সম্ভব। মোট কথা তিনি যে ফণীবাবুর বাসায় তিলার্ধ থাকবেন না সংকল্প করেই অসময়ে চলে গেলেন এ অনুমানে বোঝা গেল। কে একজন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করেছিলেন 'এখন কোথায় যাবেন ঠাকুর?' 'হাওড়া স্টেশনে'—এই উত্তর পেয়ে আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছেন গৃহস্থরা। হাওড়াতেই ঠাকুরের আরও শিষ্য আছেন। তিনি কারও বাড়িতেই পা দেবেন না। সন্ধ্যায় পুরী এক্সপ্রেস—দুপুর থেকে এতটা সময় স্টেশনেই থাকবেন ঠিক করেছেন, এতে তাঁর রোষের পরিমাণ ভাল করেই বোঝা গেল।

এদিকে গাড়ি ছেড়ে যাবার পর অন্য সকলে যখন ফণীবাবুকেই অল্পবিস্তর দোষারোপ করতে আরম্ভ করেছেন, এমন সময় আচমকা

ফণীবাবু মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি ধরে তুলে দেখা গেল দাঁতে দাঁত লেগে গেছে, হাত-পা ঠাণ্ডা। বেরিবেরি রোগের আক্রমণে দাদামশাইয়ের হৃদ্‌যন্ত্র ছিল অত্যন্ত দুর্বল। বাইরে থেকে বোঝা যেত না অমন দশাসই মানুষটির বুকে জোর নাই। ঠাকুর চলে যাবার উপক্রম করতেই ঘাড় হেঁট করে তিনি স্থাণুর মত বসেছিলেন। গুরুভাইদের প্রশ্নে অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া কোন আক্ষেপ বা অনুতাপ প্রকাশ করেননি, চোখে জলও ছিল না। কিন্তু ভিতরে ভূমিকম্প হচ্ছিল—ঠাকুর আমায় জন্মের মত ত্যাগ করে গেলেন ভেবে ব্যাকুল যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা হল তাঁর। বাড়িতে কান্নার রোল উঠল। অমলবাবু হেমবাবু ইত্যাদি হাওড়ার বিশিষ্ট গুরুভাইরা তখন উর্দ্ধশ্বাসে স্টেশনে ছুটলেন। মোট-ঘাট নামিয়ে তার মধ্যে বসে গম্ভীরমুখে ঠাকুর তামাক খাচ্ছিলেন—সেবকরা ওয়েটিং রুমের এদিকে-সেদিকে রয়েছেন। এসে তাঁর পায়ে পড়লেন অমলবাবুরা 'ঠাকুর ফিরে চলুন। ফণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আপনি না গেলে প্রাণে বাঁচবে না আর। তার ছেলে বৌ কাঁদছে। ফণীকে ক্ষমা করুন ঠাকুর।' কিছুক্ষণ চুপচাপ তামাক টেনে উঠে দাঁড়ালেন আমাদের ভোলানাথ—'কই রে হরেন, তোল্ সব। অমল একটা গাড়ি দেখ।'

তিনি বাড়িতে পা দেওয়ার পর, এদিকে ফণীবাবু যখন সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন আর ঠাকুরও শান্তভাবে বসেছেন হুঁকার নল হাতে—তখন আত্মানন্দ মহারাজ নাকি বলেছিলেন 'সেই তো ফিরে এলে বাপু! মাঝখান থেকে আমাদের খাওয়াটা পণ্ড করলে কেন?' মন্তব্যটি এ-নাটকের উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

আরেকটা ঘটনা বোধহয় ঠাকুর ২০৪ নম্বরে থাকার সময় ঘটেছিল। সে-বার ঠাকুর হাওড়ায় থাকার সময় রাজাসাহেবও কলকাতায় ছিলেন।

বিকালে রাজাসাহেব ঠাকুরকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য রোজই মোটর পাঠাতেন। কোন দিন আমরা কখনও দাদামশাই বা আর কেউ সঙ্গী হতেন ঠাকুরের। রাজাসাহেব নিজে আসতেন ঠাকুরকে নিতে এমনও হত। তখন কেবল তিনিই হয়তো যেতেন তাঁর সঙ্গে। দাদা-মশাইয়ের কাছে শুনেছি ঠাকুর যেরকম কলকাতার প্রত্যেকটি রাস্তা চিনতেন, আজীবন কলকাতার কাছে থেকেও তিনি নিজে নাকি কলকাতার গলি-ঘুঁজি সেরকম চিনতেন না। এই সময় রাজাসাহেবের গুরুচরণ নামে এক হিন্দুস্থানী ড্রাইভার ছিল। তার মত সরল গোবেচারী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। রাজাসাহেব ওকে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে গুরুচরণের হাতে গাড়ি থাকলে অ্যাক্সিডেণ্ট-এর ভয় নাই। তা ঠিকই। কারণ রাস্তায় মহিষের গাড়ি (সে সময় কলকাতায় গরুর চেয়ে মহিষটানা গাড়ি বেশি ছিল) সামনে পড়লেও গুরুচরণ কখনও তার পাশ কাটাতে চাইত না। কেবলই হর্ণ টিপত আর বলত 'আরে বড়হাও আগে বড়হাও!' কি জানি পাশ কাটাতে গিয়ে যদি দুর্ঘটনা হয়! গুরুচরণ সবসময়ই সবার পিছনে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে ভালবাসত। কাজ কি মেলা ঝামেলায়—এই তার ভাব। তার অসীম ধৈর্যে আমাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত অনেক সময়, গুরুচরণ নির্বিকার। আর এক মজা—কলকাতার কোন রাস্তাই সে চিনত না এবং চেনার জন্য ব্যগ্রও ছিল না। ঠাকুর তাকে যে রাস্তা দিয়েই যেতে বলুন না কেন সব সময়ই 'মুঝে তো মালুম নেহি গুরুজী'—এই ছিল তার বিনীত উত্তর। গঙ্গার ধারে রেড রোড বা স্ট্রাণ্ড রোডে পড়লে তখন সে সানন্দে বলত, এইবার আমি ঠিক যেতে পারব—অর্থাৎ ওইখান থেকে হাওড়া ব্রীজ হয়ে পঞ্চাননতলা রোড পর্যন্ত সে ভালই চেনে। আর চেনে রেড রোড হয়ে ল্যান্সডাউন রোডে রাজাসাহেবের

বাড়িতে যাওয়ার রাস্তা। তার বাইরে যাই-ই বল না কেন 'মালুম নেহি'। মজা দেখার জন্য একেকদিন ঠাকুর তাকে এমন ঘুরিয়ে রেড রোড বা স্ট্রাণ্ড রোডে এনে ফেলতেন যে অত চেনা রাস্তাও গুরুচরণ প্রথমটা চিনে উঠতে পারত না। অচেনা রাস্তায় ঘুরে এমনই হকচকিয়ে যেত সে যে ধাঁধা লেগে যেত বেচারীর। এই নিয়ে হাসাহাসি করতাম আমরা। যেতে যেতে শেষে হাওড়া ব্রীজ চোখে পড়লে তবে তার মালুম হত কোন্ জায়গায় এসে পড়েছে। তখন সবিস্ময়ে আকর্ণবিস্তৃত অপ্রস্তুত হাস্যে গুরুচরণ বলত 'আরে এ তো রেড রোড ধরেই চলেছি' অথবা, 'স্ট্রাণ্ড রোডই তো বটে, আমি চিনতে পারিনি!' স্মিতমুখে ঠাকুর বলতেন 'তাই তো, চিনে ফেলেছ এবার?'

কোন কোন দিন বিশেষ কারও বাড়িতে যাবার কথা থাকলে আমরা যেতাম না। হয়তো দাদামশাই একা সঙ্গী হতেন তাঁর এমনও ঘটেছে। তিনি যে ঘটনাটা বলেছিলেন তা এই রকম একদিন মোটরে বেড়াতে যাবার সময়ই ঘটেছিল। সে এই সময় না অন্য কোনও বার, তা আজ আর কেউই বলতে পারব না। সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে শুধু ফণীবাবুই ছিলেন।

মোটরে বেশ খানিকটা ঘুরে এসে প্রিন্সেপ ঘাটে বসেছেন ঠাকুর—একেবারে গঙ্গার কোলে এক সিঁড়িতে। সূর্য অস্ত যায়-যায়। কয়েক ধাপ উপরে এক সিঁড়িতে ফণীবাবুও বসে আছেন। হঠাৎ কানে এল মাতাল দুটো গোরার চিৎকার। চেয়ে দেখেন রেড রোডের ওপারে ময়দানের উপর,দিয়ে দুটো মাতাল সেলর অকথ্য গালিগালাজ করে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই তেড়ে গিয়ে ঘুষি মারছে আর পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে গঙ্গার দিকে। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে দাঁড়ান দাদামশাই—খুব বেশী দূরে নাই গোরা দুটো। এই ঘাটে এসে পড়া বিচিত্র নয় কিছু। 'ঠাকুর!'

সভয়ে ডাক দেন তিনি 'উঠে আসুন গাড়িতে। দুটো গোরা মাতাল হয়ে মারপিট আরম্ভ করেছে রাস্তার উপর।' কোন সাড়া নাই। মানাভিমান রাগরঙ্গ যতই করুন, গুরুকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন ফণীবাবু। সাড়া না পেয়ে কাজেই একটু কুণ্ঠিত হলেন। অন্তরে বুঝলেন আপন ভাবে বিভোর হয়ে রয়েছেন তাঁর ঠাকুর। ব্যাঘাত করব তাঁর ধ্যানানন্দে? কয়েক সেকেণ্ড ইতস্তত করেন। কিন্তু উপায় নাই। চেঁচামেচি গালিগালাজ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এই ঘাটের দিকেই ওদের লক্ষ্য যেন। 'ঠাকুর শুনছেন?' জোরে এবার ডাক দিলেন একটা। 'কি?' গম্ভীর প্রত্যুত্তর এল। আবার সঙ্কোচ বোধ করেন ফণীবাবু। উত্তরের ধরনেই বুঝেছেন মানুষটির মন এখানে নাই। সম্মুখবর্তী কলপ্রবাহিণী ভাগীরথীর ধারা ধরে কোন সাগর-সঙ্গমে উধাও হয়ে গেছি বুঝি! কাছে এগিয়ে এসে বিনীত অনুনয়ে বললেন 'ঠাকুর দুটো মাতাল গোরা মারপিট করতে করতে এদিকে আসছে।' কথায় বাধা পড়ল—তাঁর বক্তব্য শেষ না হতেই ঠাকুর বলে উঠলেন 'আসুক আমার কি?' স্বর ঈষৎ রুক্ষ যেন। দাদামশাই আমাদের কাছে বলতেন "শুনে হাড় জ্বলে গেল। নাও ঠেলা! তোমার কি? তা তো বটেই। বেশ জান, আগে ফণীকে মেরে লাশ বানিয়ে তবে তোমায় ছুঁতে পারবে। তাই বলে বসলে আমার কি? ওদিকে আমার যে প্রাণসংশয়। আমি একা ওই দুটো ষণ্ডামর্ককে ঠেকাতে পারব? রাগ করে বলি 'উঠে আসুন গাড়িতে। কি হচ্ছে! এ কি ছেলেখেলা নাকি? মাতাল আপনাকে সাধু ভেবে ছেড়ে দেবে ভেবেছেন? আমিই বা একা ওদের দু'জনকে আটকাব কি করে?' কোন উত্তর নাই। যেন কে কাকে বলছে! যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল গা!" তাঁর বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারি না। 'তারপর দাদামশাই?' দাদামশাই

চোখ বুজে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখ মেলে চাইলেন যখন তাঁর রক্তাভ চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে একটু—তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী চাহনী যেন অন্তর্মুখ। ভাবে বুঝতে পারি মনে মনে সেদিনের ছবিটি আস্বাদন করছেন। গলা নামিয়ে ধীরে ধীরে বলতেন "চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না দিদিমণি! গোরা দুটো ততক্ষণে রাস্তা পার হয়ে এদিকে এসে পড়েছে। সামনেই পড়ল একটা বিহারী—হয়তো কুলি-কামিনের কাজ ধরার জন্য জেটিতে এসেছিল—দিল তার পেটে ধাঁই করে এক ঘুষি বসিয়ে। 'আরে রাম' বলে ঠিকরে একদিকে গিয়ে পড়ল লোকটা। কী চেহারা মাতাল দুটোর! কাছে এসে পড়েছে, আমি কাঠ হয়ে চেয়ে দেখছি দশটা বাঘে খেয়ে কুলাতে পারবে না যেন এমনি তাগড়াই জোয়ান। ঘাড় তো নয় ঠিক বৃষস্কন্ধ যাকে বলে। ইয়া হাতের কব্জী। দেখছ তো আমাকে, দশজন বাঙালীর মধ্যে দাঁড়ালে লোকে ফিরে তাকিয়ে বলে মশাইয়ের স্বাস্থ্যখানা দেখার মত। কিন্তু আমি তাদের কাছে একটা পোকছানা (পাখীছানা অথবা পোকার ছানা?)। তার উপর স্কচ হুইস্কি খেয়েছে নির্জলা—রক্ত ফেটে বেরোচ্ছে চোখে মুখে, একটা মানুষ যেন পাঁচটা হয়েছে ফুলে। গাঁ গাঁ করে তেড়ে আসছে আমাদের ঘাটের দিকেই। সেলর তো, বড় কঠোর বড় শুষ্ক জীবন ওদের। ডাঙায় নামলেই তাই পশু হয়ে যায় ওরা। দাপাদাপি না করে পারে না। তোমায় বলব কি ভাই, বুকের রক্ত আমার জল হয়ে গেল। ঠাকুরকে ডেকে তোলার আর সময় নাই। বেটারা দেখেছে দুটো নেটিভ আছে গঙ্গার ধারে, মেরে হাতের সুখ করে নেবে। বুনো মোষের মত গোঁ-ভরে সোজা এই দিকেই আসছে আর সে কী যাচ্ছেতাই খিস্তি করছে।"

নিরুপায়ে চারদিক অন্ধকার দেখেন ফণীবাবু। ঠাকুরের জন্ম মার খেতে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু তবুও বাঁচাতে পারবেন না তাঁকে এই আফ্‌শোষ। গুরুচরণ বোধহয় গাড়ি নিয়ে পালাবে, কখনই নেমে আসবে না সাহায্য করতে, যা লোক ও! এল! এল! আস্তিন গুটিয়ে ছাতি ফুলিয়ে ফণীবাবুও রুখে দাঁড়িয়েছেন। তারই মধ্যে দেখছেন ঘাটের শেষ সিঁড়িতে নিশ্চল হয়ে বসে আছেন একজন—যেন পাথরেরই ঠাকুর। রাগ বিরক্তি যত হচ্ছে সেই সঙ্গে একটা সশ্রদ্ধ বিস্ময়। লোকটা কি? দাদামশাই বলতেন "ভাবলাম humbug না সত্যই যোগী ও, বুঝতে পারলাম না বাবা! বেশি ভাবার সময়ও ছিল না। ওরা দুটো তখন ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়েছে। ত্বরিতে ভেবে নিচ্ছি একবার কি মিষ্টি কথায় নিরস্ত করতে যাব, না প্রথমেই হাতাহাতি করব? হাতাহাতিতে যে পারব না সেটা দিনের আলোর মত দেখতে পাচ্ছি।"

এমন সময় ওদের সেই বুটের শব্দ আর মত্ত কণ্ঠের প্রলাপেই বোধহয় সম্বিৎ ফিরল অন্তজনের। যৌবনে অভিনয়ের সখ ছিল দাদামশাইয়ের। গঙ্গার ঘাটের সেই একাঙ্ক নাটকটা তিনি একাই চমৎকার অভিনয় করে দেখাতেন আমাদের। মাতাল দুটো ঠিক ফণীবাবুর এক সিঁড়ি উপরে তখন—চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালেন ঠাকুর। দাদামশাই বলতেন "সেই ঝুঁটিবাঁধা চুল আর দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ, তার উপর নির্বিকার অতি প্রশান্ত গম্ভীর একটা ভাব। ঘাড় ফিরিয়ে যে তাকাল যেন খোঁচা খেয়ে মাথা তুলে চাইল বনের ঘুমন্ত সিংহ। দুনিয়ার কাউকে পরোয়া করে না এমনই ভঙ্গি। বলব কি দিদিমণি—একটার হাতে একটা খালি বোতল অন্যটার হাতে আধা ভরতি বোতল একটা; ওই বোতল মাথায় ভাঙবে আমাদের সেই মতলবে ঝড়ের মত আসছে। ঠাকুর ফিরে চাওয়ামাত্র প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে সচল এঞ্জিন থেমে যাবার

মত ঠিক যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল দুজনে—একেবারে dead stop !"

এখনও চোখে ভাসে দাদামশাইয়ের বর্ণনা, মাতাল দুই গোরা বিস্ফারিত চোখে একটু ঘাড় ঝুঁকিয়ে দেখছে ঠাকুরকে। তিনি কিন্তু একবার চেয়েই আবার যেমন ছিলেন তেমনি বসে আছেন গঙ্গার দিকে মুখ করে। ঠাকুর ফিরে চাওয়া মাত্র একজন বলে উঠেছিল "Oh !" তারপর বিড় বিড় করে কি বলাবলি করল দুটোতে ফণীবাবু বুঝতে পারলেন না। খুব আশ্চর্য কিছু দেখে ভয় পেলে মানুষ যেমন উৎকণ্ঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে, কয়েক সেকেণ্ড তেমনি হতচকিত ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পরক্ষণে পিছন ফিরে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল মাতাল দুটো। ঘাটের উপরে উঠেই আবার আগের মত গালিগালাজ করতে করতে আর একদিকে ধাওয়া করল তারা। ফণীবাবু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এ প্রসঙ্গে যোগেশ্বরদার (গাঙ্গুলী) লেখা একটা ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। সেও কলকাতাতেই ঘটেছিল। গড়ের মাঠে সেদিন প্রসিদ্ধ দুটি দলের খেলা। ঠাকুরকে নিয়ে কোনও এক গুরুভাই (রাজাসাহেব, ফণীবাবু না আর কেউ ? যোগেশ্বরদা নাম দেননি।) গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছিলেন। কি খেয়াল হল, মোটর থামিয়ে ঠাকুরও মাঠের এক পাশে নেমে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লেগে গেলেন। এমন সময় অত্যধিক ভিড়ের চাপ হওয়ায় ঘোড়সওয়ার দুই সার্জেন্ট মাঠের এদিকে বিশৃঙ্খলা ঘটবার ভয়ে ঘোড়া থেকে নেমে ব্যাটন হাতে এলোপাথাড়ি পিটাতে আরম্ভ করল। সেই সঙ্গে কিল চড় ঘুষিও যে না চালাচ্ছে তা নয়। যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। ভিড়ের জন্য ঠাকুরের সঙ্গী যিনি তিনি প্রথমটা সার্জেন্টের উপস্থিতি দেখতে পাননি। সামনের মানুষগুলি হঠাৎ ছিটকে সরে যেতে ব্যাটন হাতে দুই লালমুখোকে তিনি

দেখতে পেলেন। তখন আর সরে যাওয়ার সময় নাই—এত কাছে এসে পড়েছে দুজন! এদিকে দুহাতে কিল চড় চাবুক চালাতে চালাতে ঠাকুরের সামনাসামনি এসে পড়েই সার্জেণ্ট দুটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একে অপরকে বলল 'He is a gentleman !' অন্যজন সায় দিল 'Oh, yes !' তারপর দু'জনেই ঘুরে অন্যদিকে চলে গেল। ভদ্রলোক (gentleman !) যেমন খেলা দেখছিলেন তেমনি দেখতেই লাগলেন !

দাদামশাই বলেছিলেন, "একদিন হাওড়া কোর্টের বারলাইব্রেরীতে উকীলদের মধ্যে তর্ক উঠেছিল প্রকৃত সাধু চেনা যায় কি করে? নানা জনে নানা কথা বলছে, আমি চুপ করে আছি। শেষে হেম ঘোষ (হেমচন্দ্র ঘোষ, গুরুভ্রাতা) বল্‌লে 'কিহে তুমি চুপ-চাপ কেন? বল কিছু।' তখন আমি বলেছিলাম, 'দেখ সাধু পরখ করতে চাও যদি তো একটা খোলা জায়গায়—এই ধর কোন মাঠে কি সমুদ্রের ধারে সার সার সাধুদের বসিয়ে একটা বাঘ ছেড়ে দাও। ওর মধ্যে যে উঠে পালাবে না জানবে সে-ই ঠিক সাধু। সময় না হলে বাঘেও ছোঁয় না এই জ্ঞান বা ভগবদ্বিশ্বাস তার পাকা হয়ে গেছে জানবে। মৃত্যুভয় জয় করেছে যে তাকে বলি সাধু।' হৈ হৈ করে উঠল সবাই, বললে 'এ কি হয়?' আমি দম্ভ করে বলেছিলাম, 'হয়—আমি চোখে দেখেছি।' তারপর বললাম বস্তার স্টেটে যাওয়ার পথে ইন্দ্রাবতী নদীর ধারে সেই অভিজ্ঞতা আর এই প্রিন্সেপ-ঘাটের ব্যাপারটা। সবাই হাঁ হয়ে গেল শুনে, বললে, 'তোর গুরুকে একদিন দেখা ফণী!' আমি বললাম, 'সখ থাকে নিজে দেখ গিয়ে। আমার বয়ে গেছে'।"

বস্তার স্টেটে যাওয়ার সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাটি শিশিরদা তাঁর নিগমানন্দ-স্মৃতির দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আমরা ফণীবাবুর মুখে শুনেছি সে গল্প। কী অপূর্ব করেই না বলতেন! মোটর

যেমনি slip করে নদীগর্ভে পড়ার উপক্রম হল ঠাকুর বলে উঠলেন 'সেরেছে রে'—মুখে মুচকি হাসি, যেন কি আমোদের কাণ্ডই হচ্ছে! খরস্রোতা পাহাড়ী নদীতে মোটরের পিছনের চাকাদুটি প্রায় ডুবে গেছে —ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে পাথর ঠেলে ছুটেছে ইন্দ্রাবতী, গর্জনে কানে তালা লাগে। স্রোতের বেগে মোটরখানা কাঁপছে। তার মধ্যে হুঁকার বাক্স সুটকেশ ইত্যাদি যেসব ঠাকুরের বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস মোটরের মধ্যে ছিল সব গিয়ে পড়েছে ঠাকুরের বুকের উপর। কারণ মোটরের পূর্বভাগ খাড়া হয়ে আছে, পশ্চাৎ ভাগ ঢালু পাড় দিয়ে নেমেছে নদীতে। তাড়াতাড়ি মোটরের দরজা খুলে হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এসে সঙ্গীরা দেখেন মালের বোঝার নীচে দিব্যি নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন একজন। 'নেমে আসুন শীগ্ গীর' বলায় উত্তর হয়েছিল 'আমি ঊর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ড হয়ে বেশ শুয়ে আছি বাপু। উঠতে টুটতে পারব না।' যেন কি মজাই না হয়েছে! মরণভয়ের সামনে এসে তাঁর এই বে-পরোয়া আনন্দের ভাবটি গভীর ভাবে ফণীবাবুকে প্রভাবিত করেছিল।

পঞ্চাননতলার বাড়িতে রাজাসাহেবকে আরও ভাল করে চিনলাম। দার্জিলিঙে তাঁকে দেখলেই আমি পালাতাম বলে স্মৃতি অনেকটা ঝাপসা। কিন্তু হাওড়ায় তাঁকে যে দেখলাম আর ভুলিনি। 'পথের গুরু' নিবন্ধে শুকোমামা রাজাসাহেবের যে বর্ণনা দিয়েছেন সে এই সময়েরই বর্ণনা। ইং ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে দাদামশাইয়ের ২০৩নং পঞ্চাননতলার বাড়িতেই রাজাসাহেব প্রথম ঠাকুরের দেখা পান। ফলে ফণীবাবুদের সমগ্র পরিবারটির সঙ্গেই রাজাসাহেবের প্রথমাবধি অন্তরঙ্গতা হয়।

তাঁদের কাছে রাজাসাহেবের হাওড়ার বাড়িতে প্রথম আসা সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে ঠাকুরের আরেক পরিচয় মেলে। একজন সঙ্গীসহ

রাজাসাহেব বেলা সাড়ে চারটা নাগাদ পঞ্চাননতলায় এসেছিলেন। ঠাকুর সেদিন ডায়মণ্ডহারবারে গেছেন। ফণীবাবু তখনও কাছারিতে। বাড়ির ছেলেদের মারফৎ আগন্তুকের পরিচয় জেনে মিত্রজায়া তো সন্ত্রস্ত। কি করবেন, কোথায় বসাবেন রাজ-অতিথিকে ভেবে পান না। ফণীবাবুর সেই সময়ের পুরানো বৈঠকখানা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা অবশ্যই বুঝবেন লোহার চেয়ার আলমারি ও টেবিল-ঠাসা ছোট্ট ঘরখানা রাজ-রাজড়ার পক্ষে মোটেই সুখদায়ক ছিল না। শীতের বেলা, দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল। সেইসঙ্গে হাওড়ার অসহ্য মশার ঝাঁক। ফ্যানের বালাই নাই ঘরে—ছেলেরা একজন একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করবার উপক্রম করতেই রাজাসাহেব তার হাত হতে সেটা কেড়ে নিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন।

কাছারি হতে ফিরে ব্যাপার দেখে ফণীবাবুও তটস্থ। তবে বস্তার-রাজ যে মোটেই কড়া মেজাজের লোক নন, বরং 'মাই ডিয়ার-গোছের' মানুষ, একটু আলাপেই সেটা ধরতে পেরে দাদামশাই আশ্বস্ত হন। সদালাপ চলে।

ঠাকুরের ফিরতে দৈবগত্যা সেদিন খুব দেরি হল। রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় ফিরে গাড়ি হতে নেমেই বৈঠকখানায় লোক দেখে —ফণীর মক্কেলরা আছে বিবেচনায়—ঠাকুর গটগট করে ও-বাড়ির খিড়কিদুয়ারের দিকে চলেছেন। এমন সময়, ফণীবাবুর মুখে ঠাকুর এসেছেন বার্তা পেয়েই রাজাসাহেব তাড়াতাড়ি উঠে এসে পথের মাঝখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। প্রণামটি নিয়েই বিনা বাক্য-ব্যয়ে ঠাকুর আবার হাঁটা ধরলেন। উঠান দিয়ে ঘুরে দালানে গিয়ে একেবারে সোজা দোতলায়।

পিছু পিছু গিয়ে, তিনি চেয়ারে বসতেই হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে করতে দিদিমণি নীচু গলায় বলেন, 'বেচারি বিকাল থেকে আপনার আশায় পথ চেয়ে আছে।' ফণীবাবুও গিয়ে পড়েছেন ততক্ষণে। গায়ের পাঞ্জাবী খুলতে খুলতে ঠাকুর উপেক্ষাভরে বলেন 'কে ও ব্যাটা? কি চায়?' দাদামশাই সসম্ভ্রমে বলেন 'উনি বস্তারের রাজা প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেও। আপনার বই পড়ে বড় ব্যাকুল হয়ে দেখা করতে—'। কথা শেষ না হতেই জবাব হয় 'এখন দেখা-টেখা হবে না। গরজ থাকে কাল আসবে।'

ফণীবাবুর অবস্থাখানা ঠিক সেই পুরীর বাড়িতে প্রথম দিকের ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর মত। মশার কামড়ে রাজাবেচারীর গোলাপী গা দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে গেছে। তবু যে মানুষ হাসিমুখে ঠাকুরের প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তাঁকে বলতে হবে 'আজ ফিরে যাও'! 'কি হল?' ঠাকুর ভ্রূকুটি করে একটু বিরক্ত হয়েই বললেন 'কি বললাম শুনতে পাওনি? আজ কিছু হবে না। কাল সকাল ন'টা নাগাদ আসতে পারে।' উপায় নাই—কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। রাজাসাহেব কিন্তু অম্লান মুখে হুকুম মেনে নিয়ে তখনই চলে গেলেন এবং পর-দিন ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন। তাঁর অবিক্ষুব্ধ নিরভিমান চরিত্রে সস্ত্রীক ফণীবাবু মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রাজাসাহেবেরও ফণীদাকে খুব ভাল লেগেছিল। তিনি ঘরের ছেলের মতই মিশে গেলেন সবার সঙ্গে।

ঠাকুর ওখানে এলে তো কথাই নাই। প্রফুল্লদা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন ও-বাড়িতে। কানে বীরবৌলি, জরিপাড় ধুতি, রেশমের পাঞ্জাবী গায়ে স্বর্ণকান্তি এই ক্ষত্রিয়টিকে দেখলে মধ্যযুগের মানুষ বলেই মনে হত। আভিজাত্য তাঁর সহজ সম্পদ। কিন্তু

তার চেয়েও বড় ছিল তাঁর নিরহঙ্কার অমায়িক ভাব আর প্রাণ-খোলা আনন্দ। কখনও হাসি ছাড়া দেখিনি। দু'চারদিন ঠাকুরের কাছে (কোন অসঙ্গত বা অদ্ভুত প্রস্তাব করেই হয়তো) ধমক খেতেও দেখেছি—তাতেও হাসি!

তাঁর পাগলা হাসি শুনে ঠাকুর জনান্তিকে বলতেন 'বেটার মাথায় একটু ছিট্ আছে।' সেই হাসির জন্য বেচারী মাসীমাকে (বিমলা-মাকে) কিন্তু একদিন বড় বেকায়দায় পড়তে হয়েছিল। ঠাকুর আছেন দোতলায়। নীচে বিলাতী হাসির রেকর্ড (মত্তাবস্থায় সাহেবরা কেমন হাসে তখনকার দিনে তার রেকর্ড পাওয়া যেত একরকম) বাজিয়ে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসছেন রাজাসাহেব। কিছু নতুন রেকর্ড কিনে বুঝি ঠাকুরকে শোনাতে এসেছিলেন, না কি জানি না। হাসিরোগ মাসীমারও ছিল। তাঁর সদা হাস্যময়ী প্রকৃতির জন্যই ঠাকুর বিমুকে বড় পছন্দ করতেন। কপালের কর্মভোগ—নীচে মাসীমাও ছিল। রাজাসাহেবের হাসি দেখে তারও হাসি পেয়েছে। সে-ও সমানে হাসছে খিলখিল করে। এমন সময় চড়া গলার হাঁক শোনা গেল—'বিমলা!' মুহূর্তে হাসি শুকিয়ে গিয়ে বুক গুর গুর করে উঠল মাসীমার। বিমু নয়, বিমলা? লক্ষণ ভাল নয়। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে দোতলায় উঠে আসে মাসীমা—'আমায় ডাকছেন ঠাকুর?' 'হ্যাঁ।' দোতলায় বুঝি মুখ ধুচ্ছিলেন ঠাকুর, ফিরে বসে গম্ভীরমুখে বললেন—'অত হাসছিলে কেন?' শুকনো মুখে মাসীমা নীচুগলায় বলে 'রেকর্ড শুনে রাজাসাহেব হাসছিলেন, আমারও হাসি পেল।' 'তোমারও হাসি পেল? সে একজন বাইরের লোক, তায় গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি। সে হাসছে বলে গৃহস্থের বৌ হয়ে তুমিও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসবে? তোমাদের কি কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নাই? সামাজিকতা ভদ্রতা এগুলো মুঠ-

আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা শেখে না জানি। কিন্তু তুমি একজনের ঘরের বৌ হয়ে আজও শেখনি এসব ?' চাপা গলার এই কঠোর তিরস্কারে লজ্জায় দুঃখে বিমলা-মা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেন। চোখের জল দেখেও দয়া হল না ভদ্রলোকের, আরও খানিক মুণ্ডপাত করে তবে থামলেন। পালিয়ে বাঁচল মাসীমা। এ-গল্প বড় হয়ে তার মুখেই শুনেছি। মাসীমা আমায় আমার আরও ছোটবেলায় দেখেছে নীলাচল কুটিরে। আমার কিন্তু তাকে মনে আছে এই ১৩৩৭ সাল থেকে। পঞ্চাননতলার বাড়িতে প্রথম তাকে জেনেছিলাম আমার মাসী বলে। অদ্যাবধি আমার সে-জানা মিছে হয়ে যায়নি—ঠাকুরের বিমু সে, আমার পরমাত্মীয়া। ছোটবেলায় ঠাকুরের হাতে নির্দয় প্রহার আর শাসন সইতে হয়েছে তাকে। সেসব গল্পও তার মুখেই শুনেছি। কিন্তু এই একজনকে দেখেছি, যে ঠাকুরের প্রহার ও শাসনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর স্নেহ-ভালবাসাকেই বড় করে দেখেছে। মাসীমার বিচার হল—'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে গো'। ঠাকুরকে এই দৃষ্টিতে মঠের খুব কম ছেলেমেয়েই বিচার করতে পেরেছে। অবশ্য মাসীমার অদৃষ্টও সুপ্রসন্ন। দৈবানুকূল্যে তার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়া অর্থাৎ মা মঠেই ছিলেন। স্নেহের তুলনা করার সুযোগ ঘটেছিল মাসীমার। অতি শৈশব থেকে নাকি তার মনে হত মায়ের চেয়ে ঠাকুর আমায় বেশি ভালবাসেন। অন্য ছেলেমেয়েদের কাছে আত্মীয়স্নেহই বেশি লোভনীয় লেগেছে—তাঁরা দূরে থাকায় তাঁদের মমতা সম্বন্ধে মোহ রয়ে গেছে মনে। সে-তুলনায় ঠাকুরকে মনে হয়েছে নির্মম নিষ্ঠুর ! 'যে মাছটা পালিয়ে যায় সেইটাই বড়।' মাসীমা ভাগ্যবতী—তার আজও দৃঢ় ধারণা ঠাকুর ছাড়া কেউ তাকে ভালবাসেনি কোনদিন, বাসবেও না।

যাক, রাজাসাহেব-সম্পর্কিত আর একটা ঘটনা বলেই পঞ্চানন-তলার অধ্যায় ইতি করব। ওখানে আসার দিন-কয়েক পরেই একদিন তাঁকে প্রসাদ নিতে বলা হল। দুপুরে ঠাকুরভোগ হওয়ার পর সেবকরা খাওয়াচ্ছেন রাজ-অতিথিকে। আসন পেতে আদর করে বসিয়ে বড় থালার চারপাশে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে ছোট বড় অনেক বাটি। আড়াল থেকে মায়েরা তদারক করছেন। খাবেন কি, রাজাসাহেব হেসেই আকুল! নিজের হাতে খেতে পারতেন না তিনি—বরাবর তাঁর মা তাঁকে খাইয়ে দিতেন। হরেনদারা কেউ একজন সেদিন একখানা চামচ ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁর হাতে। মুখে ভাত তুলতে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে অর্ধেক, প্রফুল্লদা হাসতে হাসতে খুন হওয়ার যোগাড়। ব্যাপারটা চোখে দেখবার জন্ত ঠাকুরও একবার বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। কিন্তু ফিরে যখন ঘরে গেলেন কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিল। খাওয়া সেরে রাজা-সাহেব তো চলে গেলেন, বকুনি খেতে হল মায়েদের। আড়ালে তাঁদের ও সেবকদের লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন 'ওকে অত থালা-বাটি সাজিয়ে জামাই আদর করার কি দরকার পড়েছিল?' সেবক-সেবিকাদের মধ্যে কেউ হয়তো মৃদুস্বরে বলেছিলেন 'উনি রাজা—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সাধারণ ভাবে দেওয়াটা কি ঠিক হত? যদি অসম্মান হয় ওঁর—।' জ্বলে উঠলেন ঠাকুর 'কিসের অসম্মান? ও রাজা জমিদার যাই-ই হ'ক এখানে সবাই যা, ও-ও তাই। গুরু-গৃহে প্রসাদ নিতে এসেছে সে—সকলকে যেভাবে প্রসাদ দাও ওকেও তা-ই দেবে। রাজা বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে তোমাদের যে মোসাহেবী শুরু করেছ সকলে মিলে?' অপ্রস্তুতের একশেষ সবাই। কিন্তু এমন মর্জি বুঝে চলাও দায়। অশ্বিনীবাবুকে অন্ত

সবাইয়ের মত গণ্য করায় তাঁরা বকুনি খেয়েছিলেন। এখানে আবার উল্টা উৎপত্তি। এ-মানুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা কি সহজ ব্যাপার ?

এখানে একটা কথা বলা ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ বিষয়ে প্রফুল্লদা ১৩৬৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা আর্যদর্পণে 'দীক্ষারহস্য বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে স্বয়ং যা লিখেছেন তার সঙ্গে কিন্তু আমার দেওয়া বিবরণীর গরমিল হবে। আমার ধারণা বহুদিন পরে লিখতে বসে তিনি প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে পরবর্তী কোনও সাক্ষাৎকারের স্মৃতি গুলিয়ে ফেলেছেন। ফণীবাবুদের দেওয়া বিবরণটি ঠাকুর মহারাজের গুরুভাবের সঙ্গে চমৎকার মেলে। 'ঠাকুর আপনি এখন রাজগুরু' ধরণের কথায় যিনি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন 'রেখে দে তোর রাজা-ফাজা। রাজা শিষ্য হয়েছে তো কি হয়েছে ?' (ঠাকুরমাহাত্ম্য ২য় সং, পৃঃ ১৮০) যিনি রাজসাহেবকে বেশী সমাদর করায় সেবকদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন—তিনি রাত্রি দশটার সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত বস্তাররাজকে অভ্যর্থনা করার মানুষ ছিলেন না। তাই ফণীবাবুদের বিবৃতিই আমি প্রামাণিক বলে গ্রহণ করেছি।

১৩৩৭ সালের আশ্বিন কিংবা কার্তিক মাসে ঠাকুর এই পঞ্চানন-তলার বাসাতে থাকাকালেই অভাবিত এক বিপর্যয় দেখা দিল। খবর এল মঠাধ্যক্ষ চলে গেছেন মঠ ত্যাগ করে।*

* মঠ ছাড়ার প্রাক্‌কালে নির্বাণানন্দজী নিজে তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলেন কারও অনবধানতায় ঠাকুর তা যথাসময় পাননি। মঠাধ্যক্ষ চলে যাওয়ার ২।৩ মাস পরে বড়মায়ের জবানীতে কোনও ব্রহ্মচারী ঠাকুরকে সংবাদ দেন মঠাধ্যক্ষ চলে গেছেন।

শুনেছি তাঁর বিদায়-সংবাদ পড়তে গিয়ে ঠাকুরের হাত কাঁপছিল থর থর করে, ক্ষোভে চোখে জল এসে গিয়েছিল। 'কমলি নেহি ছোড়তা'—কতবার তাঁকে বলতে শুনেছি। তিনি কাজ ছাড়তে চাইলে কি হবে, কাজ তো তাঁকে ছাড়ল না। ১৩৩৪ সালে ট্রাষ্টডিড করে সব ভার ছেলেদের হাতে দিলাম ভেবে তাঁর আনন্দের অবধি ছিল না। কিন্তু বিশ্বেশ্বরী ছুটি দিলেন না। তাঁর বোঝা আবার তাঁকেই মাথায় তুলে নিতে হল। দার্জিলিঙ্ হতে ফেরার পর তাঁর শরীর মন দুই-ই দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। সেই ভগ্ন দেহ-মনে আবার নতুন করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া—এই তাঁর নিয়তি ছিল ?

ঠাকুর আমাদের পুরী পাঠিয়ে দিলেন। অগ্রাণ মাসে মঠ থেকে নীলাচল কুটিরে লিখলেন, 'আমি যে কতদিনে মঠ হইতে বাহির হইতে পারিব তাহার নিশ্চয়তা নাই।' পৌষ মাস না পড়তেই আরও দুটি দুঃসংবাদ তাঁর কানে গেল। রাণী প্রফুল্লকুমারীর যক্ষার সূচনা হয়েছে, ওদিকে নীলাচল কুটিরে আমার হয়েছে ডিপ্‌থিরিয়া। দুই আদরের মেয়ের প্রাণসংশয় পীড়া শুনে কত যন্ত্রণা হয়েছিল তাঁর সে জানেন ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী সেবক-সেবিকারা। তারই মধ্যে ময়নামতীতে ভক্ত-সম্মিলনী হয়ে গেল। আজমিরীগঞ্জ ঘুরে ভাওয়াল আশ্রম হয়ে ঢাকাতে এসে ঠাকুর নীলাচল কুটিরে লিখলেন 'মাঘের প্রথমে হাওড়ায় এসে কুতবপুর যেতে হবে। স্কুলটি গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করেন নাই। আমার কোন কাজই সহজে নিষ্পন্ন হবে না। মঠ-আশ্রমের কর্তৃত্ব আমাকেই বহন করিতে হইবে। এ জীবনে আমার আর ছুটি নাই।' তাং ২২।৯।৩৭

'কাজই যখন করতে হবে তখন ভাল করেই করি। আগামী শুক্রবার ১৬ই খড়কুসমা যাব। আরও ২।১ স্থানে যাব। হালিসহর আশ্রম নিয়েই গোলে পড়িয়াছি।' তাং ১৩।১০।৩৭—হাওড়া।

খড়কুসমা হতে ফিরে এসে পঞ্চাননতলার বাসা থেকে ১লা ফাল্গুন লিখলেন "এইবার পুরী যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। শিবরাত্রির ২।৪ দিন পরেই রওনা হব।"

পুরী এসে সেবার শিষ্যভক্তদের যেসব চিঠি লিখেছিলেন তার মধ্যে তিনখানা ৫৭, ৬২ ও ১০০ নং চিঠি লিপিবদ্ধ রয়েছে দ্বিতীয় খণ্ড ঠাকুরের চিঠিতে। ২৮শে চৈত্রের চিঠিখানা (১০০ নং) উল্লেখযোগ্য—

'পুরী আসিয়া অবধি শ্বাসকষ্টটা একটু কমিয়াছিল কিন্তু পেশীতে বাতের আক্রমণ হওয়ায় দৈহিক কষ্ট বাড়িয়াছে। বাম হাতটা অকর্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। কোনদিকে ঘুরাইতে ফিরাইতে বা ঊর্দ্ধ-দিকে তুলিতে পারি না। কোন কারণে একটু ঝাঁকি লাগিলেই অসহ্য বেদনা হয়। দেহের অন্যান্য অঙ্গেও ক্রমশঃ অনুভব করিতেছি। জানি চিকিৎসায় ফল হবে না, তবু এটা ওটা ব্যবহার করিতেছি। ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও রুগ্নদেহ লইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা, ক্রমশঃ দেহটা দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু কোন উপায় নাই, মালিকের ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করিতেছে। যাক, তোমরা সুখে আছ আনন্দে আছ জানিলেও কতকটা তৃপ্তিতে থাকিতে পারি।'

১৩৩৭ সাল এইভাবেই শেষ হয়ে গেল। উল্লেখ করার মত অন্য আর কোন ঘটনা নাই।

১৩৩৮ সালে বৈশাখ মাসটা ঠাকুর পুরীতেই ছিলেন। বৈশাখের শেষে মঠসংক্রান্ত কাজে আবার তাঁকে বিশ্রামের আশা ছেড়ে আসাম রওনা হতে হল। ১লা জ্যৈষ্ঠ হাওড়া থেকে নীলাচল কুটিরে লিখলেন, গাড়ির ঝাঁকুনিতে হাতে ব্যথা হয়েছে। ব্যাটারি লাগিয়ে চিকিৎসা

চলছে। দেরি হলে মঠে প্রেসের দেনা বাড়বে। তাই ফিরে এসে চিকিৎসা করাবেন স্থির করেছেন। নরেনদার সঙ্গে খুড়িমা (শ্রদ্ধেয় তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্মিণী) এইবারই পুরী এসেছিলেন। এ-চিঠিখানায় তাঁদের উল্লেখ আছে।

যেজন্য অসময়ে ঠাকুরকে সেবার মঠে ছুটতে হল এখানে সেই ঘটনাটার কথা একটু বলে নিই। ঠাকুরের কর্মজীবনে তিনটি গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়েছিল (১) দুর্গাপুর আশ্রম লুণ্ঠন (২) সরুরামের বিদ্রোহ (৩) প্রেস-বিভ্রাট। প্রথমটিতে ঠাকুরের ডান হাত ছিলেন যোগানন্দ ও চিদানন্দ মহারাজ। দ্বিতীয়বারের সঙ্কট মোচন করেন যোগানন্দ স্বরূপানন্দ ও প্রেমানন্দজী। আর তৃতীয় পর্বে ঠাকুরের মুখ্য সহায় শুদ্ধানন্দ ও প্রজ্ঞানন্দজী এবং ব্রহ্মচারী শক্তিচৈতন্য।

মঠেরই জনাকয়েক প্রাক্তন কর্মীর দুর্নীতিতে যোগমায়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং মঠকে দুর্বহ ঋণজালে জড়িত হতে হয়। মঠের সুনাম নষ্ট করা শুধু নয়, বিরোধীপক্ষ ঠাকুরকে পর্যন্ত নানা দুর্নামের ভাগী করে তোলে। ঘোর মনস্তাপে তিনদিন তিনরাত্রি ঠাকুর নাকি অবিরাম চোখের জল ফেলেছিলেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শক্তিদার কাছে তিনি বলেন 'যে ভীষণ অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। আমি একেবারে অসহায়। তোমরা ২।৩ জন কেবল আমার ভরসা।' এই "দু'তিনজন" বলতে শুদ্ধানন্দজী ও প্রজ্ঞানন্দজী তো আছেনই, আর ছিলেন সত্যদা। কর্মযজ্ঞে শক্তিদাই তাঁর সর্বপ্রধান সহায়ক। তাঁকে ঠাকুর বললেন, 'দেখ, তুমি একদিন আমায় বলে রেখেছ সকলে আমায় ছেড়ে গেলেও তুমি "আমার" হয়ে থাকবে। এবার এ অবস্থায় প্রেসের সব ভার কিন্তু তোমায় নিতে হবে।' শক্তিদা বিনা দ্বিধায় এতে সম্মতি দিলেন।

এর আগে শ্রীমৎ শক্তিচৈতন্যজীকে আমি 'কর্মবীর' আখ্যা দিয়েছি। গত ছয়-সাত বছরে অবশ্যই ঠাকুর তাঁর কর্মদক্ষতার প্রমাণ পেয়েছিলেন। তা নইলে মঠে এসেই তিনি তাঁকে টেলিগ্রাম করে বগুড়া থেকে ডেকে আনবেন কেন? শক্তিদা ওরফে সিদ্ধানন্দজী যে কত বড় অক্লান্ত কর্মী সেই সময়ে ভাল করেই তা প্রমাণ হয়ে গেল। বিরোধী পক্ষের শাসানি গালমন্দ থানা-পুলিশের টানাটানি সব-কিছু উপেক্ষা ক'রে প্রজ্ঞানন্দজীর নেতৃত্বে শক্তিদা দৃঢ়তা ও নিষ্ঠাসহকারে প্রেস পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সত্য ও শক্তি—তাঁর এই দুটি সন্তানকে অবলম্বন করেই আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত ঠাকুরমহারাজ সেবার বুক বেঁধেছিলেন। এঁদের হাতেই নষ্টপ্রায় প্রচার বিভাগের পুনরুজ্জীবন ঘটল। ১৩৩৭ সালে ব্রহ্মচারী সত্যচৈতন্যকে আর্যদর্পণের সম্পাদকরূপে মনোনীত করে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩৩৮ সাল হতে শক্তিদাকে প্রচার বিভাগের কার্যাধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত করেন। সত্যদা ও শক্তিদা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ঠাকুরকে উত্তরোত্তর প্রসন্ন করে তুলেছিলেন। শেষদিকে তিনি পুরীর বাড়িতে মায়েদের নাকি বলেছিলেন— 'ওই ছেলে দুটো আমায় বড় শান্তি দিয়েছে। ভাগ্যে ওরা ছিল তাই প্রচার বিভাগটা নিয়ে আর ভুগতে হয় না।'*

* ১৩৪১ সালের প্রথমাংশে তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ ব্যক্তিগত কারণে সত্যদা ও শক্তিদাকে মঠাশ্রমের সংস্রব ছাড়া করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ঠাকুরের কানে এ কথা যাওয়ায় তিনি পুরী হতে বগুড়ার হরপ্রসাদদাকে লিখলেন, 'অমুকের ঘাড়ে আবার ভূত চাপিয়াছে। সত্য ও শক্তি গেলে আমার আর থাকে কি?'

পুরী হতে শ্রীশ্রীঠাকুর ৯।৫।৩৪ ইং ('৪১ বৈশাখ) বগুড়ার স্থরেনদাকে একখানা চিঠি লেখেন। তার মধ্যে শক্তিদার একখানা চিঠির উল্লেখ করে লিখেছিলেন—

'বেলঘরিয়া থাকিতে শক্তির পত্রে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।'

ঠাকুরকে কি লিখেছিলেন সে চিঠিতে—এতকাল পরে শক্তিদার তা মনে নাই। আমায় বললেন 'প্রাণের শ্রদ্ধাপ্রীতি ভাবের অর্ঘ্য দিয়েছিলাম এইমাত্র মনে পড়ে।' সে যাই হ'ক, ঠাকুর তাতে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলেন বলেই ওই ছত্রটি তাঁর কলমে এসেছিল। এটি আমার বক্তব্যের সমর্থক।

৮ই জ্যৈষ্ঠ মঠ থেকে কোনও পুত্রশোকাতুর পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে লেখা একখানা চিঠি আছে তৃতীয় খণ্ডে (ঠাকুরের চিঠি ৩।৮)। ১২ই আষাঢ় হাওড়া হতে তিনি যে চিঠি লিখলেন তা থেকে জানি ১৪ই আষাঢ় পুরী রওনা হবেন ঠিক করেছেন। ২০৪নং বাসা তখনও ভাড়া করাই ছিল। সে বাসা এবার ছেড়ে দেওয়া হল। নরেনদার ম্যাট্রিক পাশ করে তখন কলেজে পড়ার কথা। ফণীবাবুকে সে ভার দিয়ে তিনি পুরী ফিরে এলেন।

এইবারই ৪ঠা শ্রাবণ পুরী হতে যোগানন্দজীকে তিনি একখানা চিঠি লেখেন (২।৮৫)। তাতে জানা যায় পুরী এসে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। উৎকট কাশি ও দুর্বলতা দেখা দেয় তার ফলে। চিঠিখানা আরেক কারণেও উল্লেখযোগ্য। প্রথম জীবনের শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর কি অন্তরঙ্গতা ছিল চিঠিখানার ছত্রে ছত্রে তার স্বাক্ষর। উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখছেন তোমরাই যে এই সন্ন্যাসীর অন্তর্নিহিত রসকে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার

আকর্ষণে বাহিরে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলে, কঠিনকে সহজ বা সরস করিয়াছিলে! তোমাদের মধ্যে অনেকেই একে একে আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছে, তাই আজ আবার সে রস ও আনন্দ অন্তরে লুপ্ত। * * * সে-জীবনের সাথীদের মধ্যে তুমিই অবশিষ্ট। তাই তোমার পত্র পড়িয়া আজ যুবকের আনন্দে এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম—নতুবা প্রাণ খুলিয়া প্রাণের কথা বলিবার আর লোক নাই। ভাব ও ভাষা সুপ্ত।'

আমি তখন পড়াশোনা আরম্ভ করেছি। পড়ার বই ছাড়া হাতে পড়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশীদাসী মহাভারত। অনেক পদ মুখস্থ হয়ে গেছে ওর থেকে। অবসর পেলেই বাবার কাছে গিয়ে হাত-পা নেড়ে সেসব শুনিয়ে বাহবা নেওয়া চাই। নীতিপালনে তাঁকে রক্ষণশীল দেখেছি সেকেলে মানুষের মত। কারও বাড়ি যেতে দিতেন না, সেই ছোট্ট বয়সেই আমার বেশিক্ষণ বাইরে থাকা কি ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে বেড়ানো অপছন্দ করতেন—এসব নালিশ তো আগেই করেছি। বেজায় রাগ হত মনে মনে। কি বেয়াড়া শাসন রে বাবা, কতবার বলতাম নেপথ্যে। একা নিজে তো নন মায়েদের উপরেও অমনি সব নির্দেশ ছিল আমার সম্বন্ধে। সুতরাং ছ'বছর বয়স হতে না হতেই খাঁচার পাখি আমি, কারণ আমি মেয়ে। নিরুপায় ক্ষোভে মনে হত, হায় কেন ছেলে হলাম না। তাহলে তো ওই ঘাসউলীদের ছেলে-মেয়েদের মত কেমন পথের ধুলায় খেলে বেড়াতাম। কিন্তু এই সেকেলে ধাঁচের ভদ্রলোক আমার কপালগুণেই হয়তো এক বিষয়ে পরম আধুনিক ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষায় অসাধারণ আগ্রহ ছিল তাঁর—আমি ভালরকম লেখাপড়া করব এতটুকু বয়স হতে এতে তিনি নিজে উৎসাহ দিয়েছেন। মজা এই, সে

লেখাপড়া কেবল প্রাচীন কালের শাস্ত্রপাঠ কি সংস্কৃত বাংলা শেখা নয়। ইংরেজি অঙ্ক ইত্যাদি সহ আধুনিক শিক্ষার পাঠ নেব আমি এই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। পুরী এসেই খোঁজ নিতেন লীলার পড়াশোনা কতদূর এগোল। এ-বিষয়ে তিনি কি রকম সজাগ ছিলেন সংক্ষেপে তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে পারি।

চারবছর বয়স না হতেই তাঁর মনে আমার বর্ণপরিচয়ের ভাবনা ঢুকেছিল। শিশুশিক্ষা ছাড়াও তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ নির্বাণানন্দজীকে বলে প্রকাণ্ড এক বর্ণমালা আনানো হল। কাঠের গায়ে জড়ানো বড় বড় খানকয়েক পাতা। তাতে লাল নীল সবুজ হরেক রঙে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' জাতীয় সব লেখা। পাশে পাশে ছবিও ছিল যেন। তবে কিনা অক্ষরপরিচয়ের চেয়ে রঙবেরঙের ছবি দেখতেই প্রথম প্রথম ভাল লাগত। দার্জিলিঙ্‌ যাওয়ার পর রাণী প্রফুল্লকুমারীর মুখে হাসিখুসি আর খোকার বইয়ের প্রশংসা শুনে সেও দুখানা এসে গেল। প্রথম শিক্ষকতা করলেন মা (শ্রীযুক্তা সুরবালা দেবী)। স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ তাঁর কাছেই চিনলাম। তারপরই মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কথা। ১৩৩৫ সালে তিনি পুরী এসে কিছুদিন ছিলেন। অমনি আমার শিক্ষকপদে বৃত হলেন তিনি। মনে আছে খুব আদর করে আমায় পড়াতেন। নানারকম গল্প বলতেন মুখে মুখে। সেই সঙ্গে করতেন আমার গুণানুবাদ। ঠিক কি বলতেন মনে পড়ে না, তবে আমি যে অসামান্যা মহামহিমান্বিতা—ছন্দে-বন্ধে সস্নেহে এবং সোৎসাহে মহারাজ একথাটা কেবলই আমায় শোনাতেন। অথচ কেন এ স্নেহ? না, আমি তাঁর ঠাকুরের স্নেহপাত্রী। এইখানেই প্রজ্ঞানন্দজীর অনন্যতা। ঠিক যেমন হরিদাসদা প্রাণের অধিক ভালবেসেছিলেন আমায়, আমি 'ঠাকুরের' এই বুদ্ধিতে! লীলুকে স্নেহ করা তাঁদের

গুরুভক্তিরই অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, এ কি তাঁদের ঠাকুরগতপ্রাণ হওয়ারই পরিচয় নয়?

'গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নিকট হইতেও নিকটতম সম্বন্ধ; প্রকৃত গুরু-শিষ্য এক আত্মা, কায়া ভিন্ন মাত্র।' (২।৮৫) ঠাকুরের একথার সত্যতা অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে দিয়ে প্রমাণ হয়েছে। ছোট্ট লীলুর অগণিত উৎপাত সয়েও দাদামশাইদের মত হরিদাসদাদের মত প্রাণভরা স্নেহে তাকে যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁরা আসলে গুরুনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন। লীলু সেখানে নিমিত্ত মাত্র। আসলে তাঁরা সে ভালবাসা তাঁদের ঠাকুরকেই দিয়েছেন। ফলদাতা অন্তর্যামী কেন, আমিও সেকথা বুঝতে পারি। তাই তাঁরা প্রত্যেকে আমার শ্রদ্ধার পাত্র, আমার কাছে চিরস্মরণীয়।

দার্জিলিঙ্ হতে ফেরার পর হাসিখুসি আর খোকার বইয়ের অনেক ছড়া মুখস্থ হয়ে গেল।

চৌদ্দ দিন জ্বরে ভুগে উদ্ধব পোদ্দার।
কলাসিদ্ধ ভাত খেয়ে তুলিছে উদ্গার॥

ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে ভাল হয়ে ঠাকুর পথ্য করার পর, মনে পড়ে একদিন তাল-মাফিক এ ছড়া শুনিয়ে দিতেই তিনি হেসে ফেললেন। উৎসাহিত হয়ে আরও শোনাই—'এখন আমি বড় হয়েছি, ঐক্য বাক্য মাণিক্য বলতে শিখেছি।' কিংবা 'এনেছি রে পক্কবিল্ব ঝুনা নারিকেল। কই দাদা পক্কবিল্ব এ যে পাকা বেল॥' গুরুভাবের গুরু-ভারে অবসন্ন ঠাকুর ছেলেমানুষের মত খুশী হয়ে ওঠেন। 'মৃন্ময়ী ও রুক্মিণীর কত আত্মীয়তা। দেখা হলে গলাগলি চোখে-মুখে কথা॥'—এটা ম-ফলা বাবা, বুঝলে? আর এই দেখ 'নাক কাটা কান কাটা শূর্পণখা কাঁদে। মর্কটেরা হাহা-

হিহি হাসে নানা ছাঁদে ॥'—ছুটে গিয়ে বই নিয়ে আসি। 'সব মুখস্থ হয়ে গেছে তোর ?' তামাক খেতে ভুলে গিয়ে নল হাতে সোজা হয়ে বসেন ঠাকুর। আমার অহংকার দেখে কে ? হাসিখুসি না খোকার বইয়ে কোনটাতে মনে পড়ে না, শেষকালে একটা মজার ছবি ছিল। সে এক বামুনের ছেলে, নুলো—তার সর্বাঙ্গে ফলা বানান দেখানো হয়েছে। তার নাম ফলানিধি। ম ফলা হয়েছে জুতা, 'ন ফলা রেখেছে চেপে বগল তলায়', ণ ফলা তার নুলো হাত। শেষ লাইন হল 'রেফ্‌টিকি মাথায় ওই ফলানিধি যায় ॥' এখন আর সে-ছড়া মনে পড়ে না। তখন আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ ছিল। আগাগোড়া সবটা শুনিয়ে 'রেফ্‌টিকি মাথায় ওই ফলানিধি যায়' বলে হাত নুলো করে তাঁর সামনে নাচতে লাগলাম। হাসির চোটে ভদ্রলোকের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। এক চালে বাজি মাৎ আমারও। বোঝা হয়ে গেল এই মন্ত্রে আদর বাড়ানো যাবে যথেষ্ট এবং আমার মূল্য আজ অনেক বেড়ে গেল।

সত্যিকারের বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ঠাকুর। মার কাছে শুনেছি তাঁরা অর্থাৎ সে-যুগের বালক-বিভাগের সভ্য-সভ্যারা (বিমলা-মা কেনারামদা ঈশ্বরদা ননীদা ফণিদা ইত্যাদি) যত মার খেয়েছেন ঠাকুরের হাতে সে কেবল পড়া না করার অপরাধে। তিনি নিজে তখন নুর বিমলা নরসিং ঈশ্বর, এঁদের পড়াতেন। দু'তিন জন ছাড়া বেশির ভাগই ফাঁকিবাজ, পড়া পারত না কেউ। ক্ষেপে যেতেন ঠাকুর, সুরু হত প্রহার। অনাহারে থাকা বন্ধন ইত্যাদি শাস্তিও জুটত। স্বরূপানন্দজীর দিনলিপিতে দেখছি এই নিয়ে একদিন তাঁর কাছে ঠাকুর আক্ষেপ করছেন। বলছেন 'কি ছিলাম আর কি হয়েছি! একসময় কুকুর-বিড়ালকেও ভাল বেসেছি। যে গাল দিয়েছে তাকেও হাসিমুখে উত্তর দিতে পারতাম। একদিন একজন বলেছিল ভাতখাওয়া সন্ন্যাসী! পেটের দায়ে সন্ন্যাসী সেজেছে।

আমি হেসে বললাম ভাই তুমি আমায় ঠিক চিনেছ ; এত সহজে কি করে চিনলে ? বলে খিল খিল করে হাসতে লাগলাম, লোকটা অবাক হয়ে গেল। বিমলা ফণী ওদের এখন আমি মারি। কিন্তু এমন দিন ছিল দোষ করেছে দেখেও নরসিংকে মারতে পারিনি। একদিন ওকে মেরে কেঁদেছিলাম। নরসিং আমায় বোঝাতে লাগল, বলল ঠাকুর আমার লাগেনি। আচার্যদেব কি বাবাও এর চেয়ে জোরে আমায় মারেন। শাস্তি কত বোঝাল। আর এখন দিন দিন যেন পাষাণ হয়ে যাচ্ছি।'

আগেই বলেছি আমাদের ঠাকুর ছিলেন জটিল চরিত্রের মানুষ। আপাতবিরুদ্ধ বিচিত্র ভাবের সমাহার তিনি, কোমলে কঠোর আরও কত কি ! আর রাগখানা যে কি প্রচণ্ড ছিল সে প্রত্যক্ষদর্শীরাই জানি। সরযূ-মার কাছে গল্প শুনেছি ঠাকুর একবার সন্দ্বীপে গেছেন, মহাসমারোহে ভোগের আয়োজন হয়েছে। বোধহয় ভবরঞ্জন গুহ কিংবা গোপাল বাঁড়ুজ্যে মশায়দের বাড়ীতে আছেন। ভোগ হতে দেরী হবে জানা কথা। ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর গল্প করছেন। বেলা দেড়টা নাগাদ পাক শেষ হল। এবার ভোগের ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্নব্যঞ্জন। যে-পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঠিক সেইখানেই কার ছোট ছেলে অকাজ করে রেখেছে। যিনি ভোগ নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি সেই প্রস্রাব মাড়িয়ে গেলেন অতর্কিতে —সঙ্গে সঙ্গে মনে হল বিনা মেঘে বাজ ডেকে উঠল আকাশে—হুঙ্কার করে উঠলেন ঠাকুর 'এ কি ঠাকুর ভোগ না ভূতের ভোগ দিচ্ছিস তোরা ?' সরযূ-মা বলতেন, 'ওদেশে খড়ের ঘর। ঠিক মনে হল মচ্ মচ্ করে মটকাশুদ্ধ ঘরখানা ভেঙে পড়ল, এমনি ভয়ঙ্কর সে-গর্জন!' ঠক ঠক করে কাঁপছে ছেলে-বুড়ো সকলে। একটু আগেই হুঁকার নলে সুখটান দিতে দিতে হাসিমুখে গল্প করছিলেন যিনি, তিনি মুহূর্তমধ্যে রাগে যেন

লাল হয়ে গেছেন। ঠক ঠক করে কাঁপছেন তিনিও। সবাই মিলে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে শেষে তাঁকে শান্ত করে—সব ফেলে দিয়ে নতুন করে ভোগ রান্না হয় আবার। অথচ কেন এ রাগ? লোকটি যে খুব আচারী কি শুচিবাইগ্রস্ত ছিলেন তা নয়। দূর পল্লীগ্রামের নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণপরিবারে জন্মালে কি হবে, যথার্থ চতুর্থাশ্রমী তিনি। জাতি-বর্ণের গণ্ডি সন্ন্যাসজীবনেই ঠাকুর পার হয়ে গিয়েছিলেন। এ যে কত বড় মুক্তমনা হলে সম্ভব, জাতি-বর্ণের সংস্কার যাঁদের আছে কেবল তাঁরাই বুঝবেন। দণ্ডত্যাগ করার পর তাঁকে সবাই পরমহংসের ভূমিকাতেই দেখেছেন। 'নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ' গোস্বামী শুকদেবের এই অনুশাসনমতই তিনি চলতেন। শুচি-অশুচি সমান হয়ে গিয়েছিল, বাছবিচার ছিল না নিজের। তবে যে সন্দীপে রাগ করলেন, সে তো তাঁর নিজের জন্য নয়। তিনি সব খেতে পারেন। কিন্তু গুরুসেবা করছেন যাঁরা, তাঁদের প্রত্যবায় হবে। এ তাঁদের নিষ্ঠার অভাব, অসতর্কতা। 'সমনস্কঃ সদাশুচিঃ' হয়ে দেবসেবা গুরুসেবা করতে হয়, এ তাঁরা জানতেন না বলেই ঠাকুরের রাগ।

বিভিন্ন ভাবের আশ্চর্য অভিব্যক্তি ফুটত ঠাকুরের মুখে। আর গলায় স্বরের পর্দাও ছিল নানা রকম। সাধারণত নীচু গলাতেই কথা কইতেন। কিন্তু কোন কারণে রুষ্ট হলে গলায় যে বাজ ডাকত সে আমিও শুনেছি। অতি শৈশবেই একদিন কি কারণে রাগ করতে দেখেছিলাম তাঁকে। ব্রহ্মচারীদের কার নাম ধরে একটা হাঁক যে দিলেন, যেন চড় চড় চড়াৎ করে ফেটে গেল আকাশখানা, সেই সঙ্গে আমার বুকটাও। মনে হয়েছিল ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাব। জীবনে নিজে একদিন তাঁর সে-ধমক খেয়েছিলাম, যথাস্থানে দেব তার বিবরণ। তবে শ্রীহস্তের প্রহার কখনও খাইনি, কানমলাও নয়।

মায়েদের কাছে যা বর্ণনা শুনি, তা এক-ঘা পিঠে পড়লে আর বাঁচতাম না। আমার এ উক্তিতে কারও ভাবভঙ্গ হলে ক্ষমা চাইছি সেজন্য। তাঁর সে ভৈরব পরিচয়ে আমি তো দোষের কিছু দেখি না। ঠাকুর কি কেবল অবিমিশ্র ভাল, কাল কিছু নাই তাঁর মধ্যে? হিন্দুর গুরু-ভগবানের পরিচয় তো তা নয়! তিনি "নিগ্রহানুগ্রহে শক্তঃ"। যিনি শিব-শংকর তিনিই আবার মহারুদ্র চণ্ডভৈরব। ভক্তের চির শুভানু-ধ্যায়ী নিগমানন্দের করুণা-কোমল বিশ্বতোভদ্র মূর্তির অন্তরালে নির্মম নিষ্ঠুর এক কঠোর সন্ন্যাসী ছিলেন, যাঁর মায়া দয়া ভদ্রতা বলে কোন বালাই ছিল না। আমি তাঁর দক্ষিণ ও বাম দুটি মুখই দেখেছি যে! দেখেছি বলেই আমার একটা কথা মনে হয়। আমাদের মত অজ্ঞানীর ভগবানকে প্রেমময় দয়াময় স্নেহময় না বলাই ভাল। তিনি ইচ্ছাময় এবং মঙ্গলময় বা করুণাময়, আমাদের কাছে এই-ই তাঁর সত্য পরিচয়। তিনি চলেন তাঁর ইচ্ছামত; 'স্ব-তন্ত্র ঈশ্বর' তাঁর পরিচয়। কিন্তু সে ইচ্ছা সর্বদাই জীবের মঙ্গলপ্রদ কল্যাণকর। এ বুদ্ধি পাকা না হলে গুরুকে নরাকার পরব্রহ্ম বলে ধরা যায় না জোর করেই বলব।

যা বলছিলাম। পড়াশোনার সূত্র ধরেই ঠাকুরের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। যুক্তাক্ষর ফলা বানানের পরীক্ষা নিলেন নিজে। শরীর অসুস্থ হওয়ায় ক'দিন নিত্যকর্ম অর্থাৎ শিষ্যবর্গের কাঁদুনিভরা চিঠি পেয়ে কড়ি ও কোমল সুরে তার উত্তর দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। সেই ফাঁকে একটু আমার মাষ্টারী করলেন।

পরীক্ষা নিয়ে কি বলেছিলেন সে-কথা থাক। কিন্তু ভাবনা বেড়ে গেল তাঁর। লীলার এবার ইংরেজী শেখা দরকার বলে ফার্স্ট বুক আনানো হল, এল ধারাপাত। অর্থাৎ বিধিমত পড়াশুনা করা চাই,

যাতে আর বছর খানেক পরেই হাইস্কুলে ভর্তি করানো যায়। উৎসাহ দিয়ে বললেন, 'এবার শ্রীপঞ্চমীতে তোমার বিদ্যারম্ভ মা-মণি! ভাল করে পড়াশোনা করা চাই। তাহলে প্রাইজ পাবে আমার কাছে।' কিছুদিন পরে সদ্য সদ্য একটি পুরস্কার আদায় করে নিলাম—বিদ্যারম্ভ হ'ক বা না হ'ক। অবশ্য পিছনে হরেনদার প্ররোচনা ছিল।

আমি খেলনা পুতুলের বেজায় ভক্ত ছিলাম। সব বাচ্চাই থাকে, তবে আমার ঝোঁক কিছু বেশী রকম। বাজারের দিকে গেলেই কিছু-না-কিছু চাই। ডাক্তার-মা আর হরেনদা সুযোগ পেলেই টুকিটাকি খেলনা এনে দিতেন। বাবার কাছে একেবারে যে খেলনা পাইনি তা বলব না। অবিরাম কিনে না দিলেও যখন দিতেন ভাল ভাল খেলনাই দিতেন। সর্বপ্রথম একপ্রস্থ পিতলের বাসন-কোসন দিয়ে ভাব করেছিলেন আমার সঙ্গে। তারপর দিয়েছিলেন একবছরের খোকার মত বড় একটি আলুর বড় পুতুল। আরেকটা জিনিস পেলাম—তিনরঙা টর্চ। কি খেয়াল হল পুতুলটাকে প্রায়ই তেল মাখিয়ে স্নান করাতাম। একদিন তেলমাখা পুতুল পিছলে হাত থেকে পড়ে গিয়ে নাকটা বসে গেল। সবিষাদে এনে ঠাকুরকে দেখালাম। স্নানান্তে আমীলিত নেত্রে জপ করছেন তখন, এলোচুল ছড়ানো পিঠে, ওষ্ঠ স্ফুরিত হচ্ছে উপাংশু মন্ত্রে। একটু পরে ভাল করে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন 'ইস্ তাইতো কঠিন রোগ দেখছি। নাকটা গেল—কুষ্ঠ হয়েছে বোধহয়।' রেগে গিয়ে বলি, 'না কখনও না। আমার ছেলের নাকে ঘা হয়েছে। ওষুধ দিয়ে দাও ভাল হয়ে যাবে।' এ সময় বেশি কথা বলতেন না। আমায় এড়ানোর জন্য বললেন 'তোর দিদির (সরযু-মা) কাছে যাস্ ভাল করে দেবে।' তিনি পিন দিয়ে নাকটা পরে তুলে দিয়েছিলেন। এরপর টর্চটাকেও তেল মাখিয়ে স্নান করাই। দেখি আর জ্বলে না। ভয় পেয়ে

রেখে দিলাম চুপচাপ। আট দশদিন পরে মা যখন তার খোঁজ করলেন তখন ভিজ্জা ব্যাটারি গলে গিয়ে টর্চটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এর পর অনেকদিন বাবার কাছে আর ভাল খেলনা পাইনি। বোধহয় ভেবেছিলেন ভাল মন্দ বোঝার বয়স হয়নি এখনও। এ সময় দু' এক পয়সার খেলনাই ভাল। সেবার প্রাইজ পাবার কথা উঠতেই হরেনদা কানে মন্ত্র দিতে লাগলেন 'দাদু একটা খেলনা আদায় কর্। বাবা খুশী হয়েছেন তোর লেখাপড়ায়।' একে মা মনসা তায় ধুনার গন্ধ—নেচে উঠি মনে মনে। হরেনদাই একদিন 'বাজারে বেড়াতে যাচ্ছে' বলে আমাকে নিয়ে গেলেন পুরীর তখনকার একমাত্র বড় মনোহারী দোকান আর. এন. শা'র ওখানে। দাঁড়ে বসা দুটি টিয়া দেখলাম সেখানে—একটা ছোট একটা বড়। দেখা মাত্র প্রাণ পড়ে রইল সেই টিয়ার পদতলে। ও না পেলে জীবন-জনম বৃথা এমনই হতাশার হাহাকার চিত্তে। হরেনদা আমার উঁচু নজর দেখে ভয় পেয়ে যান। চার আনা আট আনার খেলনা হলে তিনিই কিনে দিয়ে বাড়ি গিয়ে ঠাকুরকে বলতেন 'মনু চেয়েছিল ঠাকুর,—এটা ওকে কিনে দিয়েছি। ওকে প্রাইজ দেবেন বলেছিলেন।' কিন্তু এ যে দেড় টাকা পাঁচসিকার খেলনা! বেগতিক দেখে হরেনদা আমাকে ফিরিয়ে আনলেন। 'গিয়ে বাবাকে বল্', পরামর্শ দেন তিনি। তা কি বলতে পারি? ওদিকে ভয় ষোল আনার উপর আঠার আনা। যদি সেই রকম ধমক দেন বাজখাঁই গলায়? রাস্তা থেকেই চোখ মুছতে আরম্ভ করেছিলাম। বাড়ি এসে ঘরের কোনায় গোঁজ হয়ে বসে রইলাম—চোখে ধারা বইছে। হরেনদারই মুস্কিল, মায়েরা তাঁকে দুষছেন, ও খেলনা দেখালে কেন? আমারও তাঁর উপরেই রাগ। যাহয় একটা উপায় করে পাইয়ে দাও ওটা। বৃথা আশায় নাহলে নাচালে কেন? উভয়সঙ্কটে পড়ে হরেনদাকেই হাল ধরতে হল।

সন্ধ্যায় ঠাকুর যখন ছাদে নিরালায় বিশ্রাম করছেন, হরেনদা কথাটা পাড়লেন 'ঠাকুর আজ আর. এন. শা'র দোকানে নিয়ে গেছলাম মনুকে। ও একটা টিয়া পাখী দেখে খুব কিনতে চেয়েছিল। দাম বেশি বলে কিনতে দিইনি। বলছি বাবাকে বল্, ওটা বাবা প্রাইজ দেবেন তোকে। তা কিছুতেই বলবে না। বিকাল থেকে কেবল কাঁদ কাঁদ মুখে ঘুরছে আর আমায় ঠেলছে।' 'তাই বুঝি সন্ধ্যা থেকে কাছে আসছে না, বক্ বক্ করে কানের পোকা বার করে দিচ্ছে না আমার?' সিঁড়ির দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সভয়ে শুনছি কি জবাব হয় হরেনদার সওয়ালের। হরেনদা বোধহয় ইশারা করে থাকবেন যে আমি অদূরেই আছি—ডাক পড়ল 'লীলা!' 'যাই বাবা', ভাল মানুষ সেজে হাস্যবদনে হুজুরে হাজির হই। 'কাল গিয়ে কিনে আনিস্ যেটা পছন্দ হয়েছে'—বলতেই হরেনদার তালিম মত বলে বসি, 'না তুমি যাবে সঙ্গে। কোন্‌টা কিনব তুমি দেখিয়ে দেবে।' তার অর্থ এই যে আমার নজর বড় পাখিটাতে। হরেনদা কি শেষে দেড় টাকার খেলনা কিনে দিয়ে বিপদে পড়বেন? স্বয়ং কর্তার উপস্থিতিই বাঞ্ছনীয়। এক টাকা বা পাঁচসিকার পাখিতে আমার মন উঠবে না। কিন্তু দেড় টাকার পাখি কে কিনবে বাপু? মনে রাখতে হবে সে-সময় দেড় টাকার গুরুত্ব ছিল আজকের চৌদ্দ-পনের টাকার মত। আর ঠাকুর সাধারণত অযথা ব্যয়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। সেবক-সেবিকারা সবাই তাঁর ব্যয়কুণ্ঠ স্বভাবের কথা জানতেন। হরেনদা তো এক-একটা ব্যাপারে তাঁর কার্পণ্য দেখে আড়ালে রীতিমত দাঁত কিড়মিড় করতেন। নিশ্চয় কৃপণ বলতেন মনে মনে -নীলাচল কুটিরের সবাই বলতেন। তিনটা লণ্ঠন কেন জ্বলে এ নিয়ে তাঁর আপত্তি—লণ্ঠন অকারণে বাড়ানো আছে দেখলে নিজে উঠে গিয়ে তার সলতে কমানো, কাপড় ময়লা হয়েছে ধোপা বাড়ি যাবে

শুনলে চোখ কপালে তোলা—সে অনেক কাণ্ড। বাইরের লোকে কেবল ফুলবাবুটিকে দেখেছে। তাঁর বৈরাগ্যটা দেখেছি আমরা। সে যাহ'ক, মোট কথা হরেনদা চালাক ছেলের মত নিজে খেলনা কিনে দেওয়ার দায়িত্ব নিলেন না। 'হ্যাঁ ঠাকুর, আপনিই চলুন না ওকে নিয়ে—গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব। ওর কোন্‌টা পছন্দ তা' ও ভয়ে বলতে চায় না।' ব্যাপারটা বুঝলেন ঠাকুর—টাকা খসাবে এরা। কিন্তু সত্যি আমার উপরে সেবার প্রসন্ন হয়েছিলেন। দোকানে গিয়ে ছোট বড় টিয়ার দাম শুনে সকৌতুকে তাকান আমার দিকে 'কোন্‌টা নিবিরে?' ভয়ে ভয়ে ছোটটা দেখাই, অবাধ্য চোখ কিন্তু গিয়ে পড়ছে বড় টিয়ার উপরে। ওহো টিয়া নয় তো লালমন। সত্যিকারের লালমনের মতই বড় সাইজ, কী যে সুন্দর! বিপত্তারণের ভূমিকা নিয়ে হরেনদা মন্তব্য করেন 'ওর বড়টাই ইচ্ছা, ভয়ে বলতে পারছে না।' আর কথা না বাড়িয়ে দাঁড়-সুদ্ধ বড় পাখিটি আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন আমার বরদরাজ। সেদিনের সেই অভাবিত প্রাপ্তির উল্লাস আজও মনে পড়ে। আর মনে পড়ে তাঁর বিপুল স্নেহ। অবাধ প্রশ্রয় অফুরন্ত আদর রাশি রাশি খেলনা দিতে কি পারতেন না তিনি? পারতেন, সবাইকেই দিতে পারতেন যে যা চায়। দেননি তো শুধু আমাদের কল্যাণের জন্যই! ছাই মাটি নিয়ে আসল চাওয়া ভুলে যাব আমরা তাই অকরুণের মত হাত মুঠি করে রাখতেন। মাঝে মাঝে বোধহয় মুঠি খুলে দেখাতেন, দেখ দিতে জানি আমিও। কিন্তু তোরা কি যা-তা-ই চাইবি! আজও মনে পড়ে মস্ত বড় পাখিটি কিনে দিয়ে মোটরে গিয়ে বসলেন তিনি, সারা রাস্তা গম্ভীর হয়েই রইলেন। পাখি পাওয়ার উল্লাসে আত্মহারা হলেও অপরাধবোধে মন সঙ্কুচিত হয় থেকে থেকে। এটা ওটা সেটা বলে তাঁকে হাসাতে চাই। আমি যে তাঁর অপ্রসন্নতা ধরতে পেরেছি তা বুঝেই বোধহয় ক্রমে সহজ

হল মুখভাব। বাড়ি এসে সকলকে পাখিটা দেখিয়ে তারপর আমায় সম্বোধন করে বললেন, 'তুমি বড্ড সখ করেছিলে তাই এবার কিনে দিলাম। আর যেন এমন দামী খেলনা চেও না। এত পয়সা দিয়ে বাজে জিনিস কিনতে নাই। বড় হচ্ছ তো, বুঝতে শেখ এ সব।' আহা-হা, আমার আনন্দোল্লাসের মাদকতায় কে যেন এক বালতি বরফজল ঢেলে দিল গো! ঘাড় নাড়লাম স্থবোধ মেয়ের মত। ওই শেষ, আর কোনও দামী খেলনা তিনি আমায় কিনে দেননি। আমিও চাইনি সাহস করে।

সম্ভবত এইবারই আশ্বিন মাসে ছোটমা রেণুমামাকে (অশ্বিনী-বাবুর ছোটছেলে) নিয়ে পুরী এসেছিলেন। সাল-তারিখ কিছুই সঠিক স্মরণ নাই কিন্তু তাঁরা যে পুরীতে ছিলেন বেশ কিছুদিন, এটা মনে আছে। আর মনে আছে একটা আশ্চর্য ঘটনা। রেণুমামার এ-সময় একটা ফাঁড়া ছিল বলেই তাঁকে নিয়ে ঠাকুরের কাছে আসা। পুরী আসার পর আমার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল তাঁর, ঠিক যেমন হাওড়ায় হয়েছিল গুরুদাসের সঙ্গে। তফাতের মধ্যে গুরুদাস প্রায় আমার সমবয়সী, আর ইনি ৫।৬ বছরের বড় অতএব কিঞ্চিৎ সমীহের পাত্র। সে থাক, আমার সঙ্গীহীন জীবনে এইসব ছুদিনের সঙ্গীরা যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ। বেশ খেলি বেড়াই তাঁর সঙ্গে, হঠাৎ তাঁকে জ্বরে ধরল। সে-জ্বর আর ছাড়ে না, সেই সঙ্গে বগলে একটা 'অ্যাবসেসে'র মত হল। ছোটমার মুখ শুকিয়ে এতটুকু, এ যে রেণুর ফাঁড়া তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন। এক ভরসা ঠাকুর আছেন সামনে। আগেই বলেছি এই পরিবারটির সঙ্গে ঠাকুরের যেমন হৃদ্যতা ছিল এমন দেখিনি আর—অন্তত আমি দেখিনি। অশ্বিনীবাবুর সব ছেলে-মেয়েগুলিই প্রিয় ছিল ঠাকুরের, সকলের ছোট রেণু তো প্রিয় হবেই। বলেছি তো, আমার এইসব মামা-মাসীরা

ছিলেন ঠাকুরের বন্ধু। 'আমার ঠাকুর বন্ধু—তোমার মাখন বন্ধু' অথবা 'বড় বন্ধু—তোমার ছোট বন্ধু', 'প্রিয় বন্ধু—তোমার কানু বন্ধু'—এমনিতর সম্ভাষণে ক্রিস্-মাস কার্ড পাঠাতেন তাঁরা। ঠাকুরের দপ্তর থেকে সেসব আমার দপ্তরভুক্ত হয়েছিল, বড় হয়ে পড়ে আনন্দে চোখে জল এসেছে। আবার ঠাকুর তাঁদের 'আমার মানকু ছানকু' বলে চিঠি দিতেন তা-ও দেখেছি। মাখন-ছানার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মানকু ছানকু। রেণুমামা জন্মেছিলেন বলতে গেলে শান্তি-মার হাতে। এই মহিমময়ী সন্ন্যাসিনীর কত গল্প শুনেছি মায়ের কাছে। অশ্বিনীবাবুর পরিবার শান্তি-মাকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর সূত্র ধরেই ঠাকুরের কাছে এঁদের আসা। সদ্যোজাত শিশুকে ঠাকুরের পায়ের ধূলা মাখিয়ে শান্তি-মা অশ্বিনীবাবুর ওই ছোট ছেলেটির নামকরণ করেন ঠাকুরপদরেণু—তাই থেকে রেণু। স্বরূপানন্দজীর ডায়েরীতে দেখছি যেবার অশ্বিনীবাবুদের সঙ্গে ঠাকুর পুরী আসেন, সেবার রেণুকে উদ্দেশ করে ঠাকুর তাঁর কাছে বলেছিলেন 'ও ছেলে যোগভ্রষ্ট হয়ে জন্মেছে। ওকে রাখা শক্ত হবে ওদের। উপযুক্ত আদর যত্ন না হলে এদের দেহ থাকে না।' হয়তো অনুরূপ কিছু তাঁর মা-বোনেদেরও বলেছিলেন। সবার ছোট বলে রেণু সহজেই সকলের প্রীতিপাত্র ছিল। তার অনেক ফাঁড়া আছে এ-ও সবাই জানতেন। সেবার মৃত্যুতুল্য ফাঁড়া বলেই 'লালঠাকুরে'র কাছে রেণুকে আনা। দাদা-দিদিরা ঠাকুরকে বন্ধু বলতেন, রেণুমামা তাঁকে ডাকতেন 'লালঠাকুর'। নামটি মৌলিক সন্দেহ নাই। তাঁর জর উপলক্ষেই জীবনে প্রথম ঠাকুরের সামান্ত একটা বিভূতি দেখেছিলাম।

প্রায় আঠার দিন জর লেগে আছে কিছুতেই ছাড়ে না যখন, তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা রোগীর মাথার কাছে বসে ঠাকুর আপদুদ্ধারকবচ বা নৃসিংহকবচ জাতীয় কিছু পাঠ করলেন। এখনও স্পষ্ট মনে আছে সে-

দৃশ্য। নীলাচল কুটিরের বড় ঘরে পূবশিয়রে মাথা রেখে রোগী শুয়ে আছে, ক্লান্ত বিবর্ণ মুখ, শরীর শুকিয়ে গেছে। বার তের বছরের ছেলে —কতই বা প্রাণশক্তি তার! এমনিতেই পাতলা চেহারা, খুব একটা স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ শরীর নয়। ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে—এক পাশে ছোটমা বসে আছেন। আমি ঘুরছি এদিক ওদিক। জ্বর সর্দি কি কোন অসুখ বিসুখ দেখলে আমি আর তার ধারে-কাছে যেতাম না, কেমন ভয় করত। বাবা কি মায়ের অসুখ হলে পর্যন্ত সে-ঘরের দরজা মাড়াতাম না। কাজেই রেণুমামাকেও যথাসাধ্য এড়িয়ে চলি। কিন্তু সেদিন ওর জ্বর ভাল হয়ে যাবে সবাই বলছে। বলছে, ঠাকুর ভাল করে দেবেন। কৌতূহলের অন্ত নাই মনে, উঁকি ঝুঁকি মারছি তাই। এমন সময় চটাস্ চটাস্ শব্দ উঠল সিঁড়িতে। বাবা নেমে আসছেন উপর থেকে। রাত্রে এক নয়টার সময় খাওয়ার জন্য তাঁকে ডেকে আনি। এসময় নীচে আসাটা নিয়মবহির্ভূত। বুঝলাম সত্যি কি একটা হবে আজ। সুড়ুৎ করে ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঠাকুর এসে রোগীর মাথার কাছে দক্ষিণ দিকে আসন নিলেন। তারপর উত্তরমুখী হয়ে পুঁথি খুলে বসলেন লণ্ঠনের সামনে। চোখে চশমা, একটু ঝুঁকে পড়ে কবচটি সামনে রেখে সুখাসনে বসে মৃদু গম্ভীর গলায় উচ্চগ্রামে পাঠ করতে লাগলেন কিছু একটা। কি তার অর্থ কোন্ ভাষা কিছুই জানি না। শুধু জানি অমন গলা খুলে কোনদিন তাঁকে কিছু পাঠ করতে শুনিনি। আর অদ্ভুত ছন্দ ও শব্দঝঙ্কার কানে বাজতে লাগল। মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাই—একতালে বিন্দুমাত্র ছেদ না দিয়ে পড়ে যাচ্ছেন ঠাকুর। গমকে গমকে স্বর উঠছে নামছে। তাল মাত্রা যতিতে সুবিন্যস্ত দেবভাষা পাঠকের সিদ্ধ কণ্ঠে অনির্বাচ্য একটা কুহক সঞ্চার করছে চারদিকে। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ কেবল ঠাকুরের গম্ভীর স্বর ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে যেন। শেষ দিকে সমুদ্রে

জোয়ার আসার মত একটা গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ রব উঠছে সব মিলিয়ে এমনি মনে হতে লাগল। কার অলঙ্ঘ্য আদেশ যেন তর্জনী হেলনে হাঁকছে 'দূরমপসর'। আকাশ বাতাস charged হয়ে গেল সেই অমোঘ ইচ্ছার শাসনে—পুঁথিতে ডোর দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন ঠাকুর। রোগীর দিকে সস্নেহে চেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন 'কাল দাদুর জ্বর ছেড়ে যাবে'। রেণুমামাকে ঠাকুর অনেক সময় তাঁর দাদা-দিদিদের অনুকরণে 'দাদু' বলেই ডাকতেন। তিনি উঠে ঠাকুরকে হাসিমুখে প্রণাম করলেন। পরদিন সত্যই জ্বরত্যাগ হয়ে গেল। বগলের ফোড়াটা পরে কাটাতে হয়েছিল—কিন্তু সেবারকার মত ফাঁড়া কেটে গেল।

কবচ পাঠ করে আমারও একবার জ্বর তাড়িয়েছিলেন মনে আছে। সিদ্ধাই বিভূতি কিছুই নাই আমার—জোর গলায় বলতেন। শুনেছি হাওড়ার হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একবার বলেছিলেন 'ঠাকুর আপনার কিছু বিভূতি দেখতে ইচ্ছা করি।' ঠাকুর নির্বিকার মুখে বললেন 'বাপু, তোমার মত বি. এ, বি. এল্ উকীল আমার পা টিপে দিচ্ছে এই-ই আমার বিভূতি। এ ছাড়া অন্য কোন বিভূতি-টিভূতি নাই।*

কিন্তু শিষ্যভক্তদের দৌরাত্ম্যে মাঝে মাঝে বিভূতি না হ'ক গুরুশক্তির পরিচয় তাঁকে দিতে হত। যেমন আমার জ্বর ভাল হয়ে যাওয়া, রেণুর ফাঁড়া কাটানো। মায়েদের কাছে শুনেছি হাওড়ার শ্রীযুক্ত অমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয়বর্গের মধ্যে কারও সন্তান হয়েও বাঁচত না।

* দৈবের নির্বন্ধে পরে এই হেমদারই ক্ষয়রোগাক্রান্ত মরণাপন্ন ছোট ভাইকে ঠাকুর তাঁর মায়ের অনুরোধে সুস্থ করে তোলেন। ঠাকুরের এ-বিভূতিটির সাক্ষী আজও হাওড়ায় বর্তমান।

একদিন পুত্রবধূর মৃতবৎসা-দোষ শান্তি করার জন্য তাঁর শাশুড়ী এসে ঠাকুরকে ধরে বসলেন, 'ঠাকুর আপনি বলুন এবারের সন্তানটি বাঁচবে—বৌমা আবার পোয়াতি।' যত অনুনয় করেন তিনি, ঠাকুর ততই বলেন 'তা আমি কি করে বলব? ও সব আমার হাত নয়।' তিনি নাছোড়-বান্দা 'আপনি একবার বলুন হ্যাঁ বাঁচবে, তাহলেই হবে।' প্রায় এক ঘণ্টা এই পর্ব চলার পর রীতিমত বিরক্ত হয়ে ঠাকুর ধমকের স্বরে বললেন 'আচ্ছা আচ্ছা বাঁচবে যাও।' ভদ্রমহিলা সফলকাম হয়ে চলে গেলেন হাসিমুখে, ঠাকুরের ভ্রূকুটিবদ্ধ ললাট আর রুষ্ট মুখ দেখে সেবক-সেবিকারা ওদিকে ভয়ে সারা। জানা কথা দুদিন চলবে এই বিরক্তির জের আর কারণে অ-কারণে তাঁরা বকুনি খেয়ে মরবেন। কিন্তু মজা এই যে সে বৌটির মেয়ে (না ছেলে ?) সেবার বেঁচে গেল সত্যই মরল না। ঠাকুর দেহত্যাগ করার পর'ও তাঁদের সে সন্তানটি ছিল জানি। তার পরের খবর অজ্ঞাত। যাই হ'ক, তাঁর এই বাক্‌সিদ্ধি বা ভবিষ্যদ্বাণী ও শক্তির পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। দাদামশাইয়ের কাছে শোনা দুটি ঘটনা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীবাবুর প্রথম যেবার বেরিবেরি হয় সে বোধহয় ১৩৩৩ সাল। তাঁর রুগ্ন ক্লিষ্ট মুখভাব ও শারীরিক অবস্থা দেখে সেবারের ভক্ত-সম্মিলনীতে ফণীবাবুর বড় কষ্ট হল। ঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে সেই কথা তুলে আক্ষেপ করছেন—তিনি বলে বসলেন, 'তোমার'ও তো ওই রোগ হয়েছে।' আমাদের কাছে দাদামশাই বলতেন 'শুনে প্রাণ উড়ে গেল। সে কি? আমার তো বেরিবেরির কোন লক্ষণ নাই। তবে একথা বললেন কেন? দুর্মুখ বলে রাগও হল লোকটার উপর। বললাম, "আপনি রোগ না হতেও যদি বলেন তোমার এ হবে তাহলে হবে।" তিনি হাসি চেপে নল মুখে দিলেন। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। আমার বিশ্বাস ছিল ও

বাক্‌সিদ্ধ আর ভবিষ্যদ্‌দর্শনও করতে পারে। খুব সাবধানে থাকতে লাগলাম। থাকলে কি হবে, যখন বলেছে তখনই নিশ্চয় ওই রোগের ক্রিয়া সুরু হয়েছিল ভিতরে ভিতরে। তিন চার মাস পরে ঠিক ফুটে বের হল। সে কী কষ্ট! রোগ কিছুটা আরাম হলেও বুকের যাতনা যায় না। এক এক সময় মনে হত এখনই দম আটকে যাবে। সেই নিয়ে কাছারিতে যাই, কাজ না করলে ঘরে হাঁড়ি চড়বে না। কাছারিতে একেকদিন সওয়াল করতে করতে বসে পড়তাম চোখে সরষে ফুল দেখে। তবু ঠাকুরকে কিছুই জানাইনি। মনে অভিমান হয়েছিল—এ রোগ সেই-ই দিয়েছে। তার অশ্বিনী একা কষ্ট পাবে কেন এও ভুগুক—হয়তো এমনি ভাব নিয়েই বলে বসেছিল, তোমারও হয়েছে ওই রোগ। প্রায় এক বৎসর পরে দেখা হল। হতেই শিউরে উঠে বলল "এ কি চেহারা হয়েছে তোমার?" আমি কিছু না বলে প্রণাম করে উঠে আসছি, বললেন, "কতদিন হল?" বললাম। "আমায় তো লেখনি কিছু?"—তার জবাব না দিয়ে পিছন ফিরেছি, বলা হল "রোগটা ভাল হয়ে গেছে। এবার শরীর শীঘ্রই আগের মত সেরে উঠবে।" হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। রোগ না হতেই যে বলেছিল হবে, সে যখন বলছে নীরোগ হবে শরীর, নিশ্চয় তাই-ই হবে। একেবারে অমোঘ তার বাক্য, দিন পনের-র মধ্যেই সে বুক-ধড়ফড়ানি গেল, গায়ে বল পেলাম। আর কখনও বেরিবেরি হয়নি। তবে বুকটা জখম করে দিয়ে গেছে। আমার যা স্বাস্থ্য ছিল তাতে আমাকে পেড়ে ফেলা শক্ত হত। তাই বোধহয় চিরকালের মত হাতের মুঠায় রেখেছে—মৃত্যুভয়ে অহোরাত্র স্মরণ হবে তাকে।'

দাদামশাইয়ের অনুমান মিথ্যা নয়। হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতাই তাঁর একমাত্র ব্যাধি ছিল। তিনি শেষ অবধি ওতেই গেলেন। অমন

আকস্মিক দেহপাত না হলে আশ্রম-মৃত্যু ঘটত না—ফণীবাবু ঘরে স্ত্রী-পুত্র পরিবৃত হয়ে যেতেন। তা ঠাকুরের অভিপ্রেত ছিল না।

তাঁর সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী সন্তান-সন্ততি নিয়ে। ফণীবাবুর তিনটি সন্তান। ছোট ছেলে গুরুদাস দশ বছরের হল। স্বামী-স্ত্রীর ধারণা আর তাঁদের সন্তান হবে না। একদিন কথা হচ্ছে গৃহস্থের অনধিক কয়টি সন্তান থাকা উচিত। ঠাকুর বললেন—চারটি। দুটি ছেলে দুটি মেয়ের বেশি সৎ গৃহস্থের সন্তান হওয়া ঠিক নয়। বলেই প্রশ্ন—'তোমার কয় ছেলে-মেয়ে ফণী?' 'দুটি ছেলে একটি মেয়ে।' স্মিতমুখে ঠাকুর বললেন, 'আর একটি হবে তাহলে।' ফণীবাবু হতবাক্। আমাদের বলতেন, 'মনে জানলাম বলেছে যখন ও হবেই।'

গুরুদাসের যখন এগার তখন বুড়োবয়সে একটি মেয়ে হল তাঁদের। বছর খানেক আগেই ঠাকুর বলেছিলেন কথাটা।

১৩৩৮ সালে হালিসহরে ভক্ত-সম্মিলনী হয়েছিল। চিঠিপত্র থেকে যতদূর জানি সে বৎসর শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস—সম্মিলনীর আগে পর্যন্ত ঠাকুর পুরীতেই ছিলেন। আমার জ্ঞান-বয়সে এত দীর্ঘ সময় তাঁকে পুরীতে থাকতে আর দেখিনি। সেই যেন প্রথম বহুদিন ধরে তাঁর সঙ্গ পেলাম।

দার্জিলিঙ্ গিয়ে পিতাঠাকুরের একটু অনুগত, চলতি ভাষায় যাকে বলে 'নেওটা' হয়েছিলাম। '৩৮ সালে তাঁর পুরী অবস্থানকালে ভাবটা আরও জমল। উপলক্ষ্য যে বিদ্যাচর্চা তা আগেই বলেছি। মুখস্থ বিদ্যায় আমার বাহাদুরি জাহির করা দেখে তিনিও ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন

আমার কাছে। কবির লড়াই বেধে যেত আর কি ! আমি একটা ছড়া মুখস্থ বললাম, বিনিময়ে তিনিও গড়গড়িয়ে মুখস্থ বলে গেলেন—

ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য্য শোভা মনোহর ॥
গুন্ গুন্ গুন্ রবে কত মধুকরে
কেমন পুলকে তারা মধু পান করে ॥
কিন্তু ওরা হারাইবে এ দিন যখন
আসিবে না অলি আর করিতে গুঞ্জন ॥
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর
আর না করিবে এই মধুর ঝঙ্কার ॥

মনে রাখতে হবে ঠাকুরের আমলে বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-কাব্যের চল ছিল না তত। বোধোদয় আখ্যানমঞ্জরী কথামালা চারুপাঠ পদ্যপাঠের যুগ সেটি। আমি কবিতা শুনেই বুঝলাম এ শিশুপাঠ্য কবিতা। ঠাকুর যদিও বলেননি কিন্তু আমি ধরে নিলাম এ তাঁর ছেলেবয়সে পড়া পদ্য। সেই তখনকার পড়া বাবার মনে আছে ? তাঁর স্মরণশক্তির বহর দেখে মেয়ের চোখ গোল হয়ে ওঠে। আমার ধারণা বাবার বয়স অ-নে-ক। কত তা জানি না। তবে সত্তর আশী বলতে যত বোঝায় অতখানিই প্রাচীন তিনি ! তাঁর ছোটবেলা, ওঃ সে কোন্ যুগ-যুগান্তের ব্যাপার। কি করে মনে থাকল অতকাল আগের কথা ? আমার তো থাকবে না। ঠাকুর তখনও বলে চলেছেন—

সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়
অসময়ে হায় হায় কেহ কারও নয় ॥
কেবল ঈশ্বর সেই বিশ্বপতি যিনি
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি ॥

সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করি 'কি করে তোমার এত মনে আছে বাবা? আমার তো থাকে না।' কন্যার দর্প কথঞ্চিৎ চূর্ণ করে পিতাঠাকুর স্পষ্টই খুশী হয়েছেন দেখা গেল। আমার কথাটার উত্তর না দিয়ে প্রসন্নমুখে তামাক টানতে টানতে বললেন, শোন আরেকটা—

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ॥
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

কবিতা মুখস্থ শুনিয়ে হল না, আবার জিজ্ঞাসা করলেন অর্থ বুঝলাম কি-না। সবিনয়ে স্বীকার করলাম বুঝিনি। তখন বিশেষ করে প্রথম কবিতাটির অর্থ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। এক ভগবানই সর্ব অবস্থায় সকলের বন্ধু। তিনি সর্বদা জীবের কল্যাণ চান, তাঁর মত ভাল আমাদের কেউ বাসে না। শিশুর শুভ্র চিত্তে কথা দু'টি ভারি ভাল লেগেছিল, বিশ্বাস করতে একটুও বাধেনি। আজ বুঝতে পারি আমায় ওই উপদেশটুকু দেবেন বলেই পদ্যটি শোনানো। ও ছাড়া আরও কত পদ্য কত গান তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। সেদিন কিন্তু বিশ্বপতির সঙ্গে মেয়ের একটু পরিচয় ঘটাবার জন্যই ওটি বেছে নিয়েছিলেন। ছয় সাত বছরের মেয়েকে ধর্মোপদেশ দেওয়া যায় না। কিন্তু যতটুকু শিক্ষা দেওয়া যায় তা দিতে চেয়েছিলেন। এ তাঁর পিতৃকৃত্য। ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করে আদেশ হল এবার মুখস্থ কর এটা "ফুটিয়াছে সরোবরে কমল নিকর"। দু'তিনবার তাঁর সঙ্গে আাউড়িয়ে পদ্যটি মুখস্থ করে তাঁকে শোনালাম। আদর করে কোলে টেনে নিলেন, আমায় আর পায় কে?

এমনি করে কত কবিতা শুনেছি তাঁর মুখে—'রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণলতিকারে। শুন মোর কথা ধনি, নিন্দ বিধাতারে॥' মাইকেল

মধুসূদন দত্তের লেখা। এই কবিতাটি তিনি কিছু অভিনয় সহযোগে আবৃত্তি করে শোনাতেন। যেমন একটি ছত্র ছিল, 'যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে'—এটা বলার সময় মাথা খাড়া করে মুখখানা গম্ভীর করে শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বুক ফুলিয়ে এমন একটি ভাব করতেন যে বীররস মূর্ত হয়ে উঠত। মধুসূদন এখানে ঝড়ো বাতাসকে বলেছেন 'প্রভঞ্জন'। প্রভঞ্জনের রুদ্রতাণ্ডব আমি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করতাম ঠাকুরের বিশাল বপুতে, রোমাঞ্চ হত শুনে। আবার শেষকালের ওই ছত্র—'হায় বায়ুবলে, হারাইলা আয়ুসহ দর্প বনস্থলে।' বলেই শরীর এমন করে হঠাৎ এলিয়ে দিতেন চেয়ারের গায়ে যে বনস্পতির ভেঙে লুটিয়ে পড়াটা চোখের সামনে দেখতে পেতাম। বড় হয়ে যখন জানলাম ঠাকুর তরুণবয়সে প্রথমেই লিখেছিলেন একখানা নাটক, তখন আর বুঝতে বাকী ছিল না যাত্রাভিনয় গভীরভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তারই ফল নিজের ভাবাভিব্যক্তির অনুশীলন, বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে সখের যাত্রা করা। সহজ অভিনয়দক্ষতা ছিল তাঁর। গল্প করায় গানে আবৃত্তিতে আপনা-আপনিই সেটি সুন্দর ফুটে উঠত। মায়েদের কাছে গল্প শুনেছি মেঘনাদবধকাব্যের প্রথম দৃশ্যটি ওই রকম যথোচিত action (মুদ্রা ?) দিয়ে আবৃত্তি করতেন তিনি—

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত !

রাবণের গভীর ক্ষোভ ফুটে উঠত ওই একটি ছত্রের শ্বাসোৎক্ষিপ্ত গম্ভীর বাচনভঙ্গিতে। তারপর, 'ফুলদল দিয়া কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?' হাতের বিভিন্ন বিন্যাসে 'ফুলদল' 'কেটে ফেলা' এবং 'শাল্মলী তরু' তিনটিই বুঝিয়ে দিতেন ঠাকুর। সেই সঙ্গে ফুটত সার্থক আঙ্গিকের ব্যঞ্জনা। ফুল দিয়ে শিমুলের মত মহীরুহকে কাটা

যে অসম্ভব কথা তাঁর ক্রিয়ামুদ্রায় দর্শকের মনে সে-ছাপ সহজেই পড়ত। প্রথম দিকে আসাম মঠে যাঁরা ছিলেন তাঁরা অনেকেই ঠাকুরের নাটকাভিনয় দেখেছেন। প্রায়ই গিরিশ ঘোষের নাটক, যেমন হরগৌরী দক্ষযজ্ঞ বুদ্ধচরিত চৈতন্যলীলা বিল্বমঙ্গল কালাপাহাড় নসীরাম—এসব অভিনয় হত রীতিমত সাজ-পোষাক করে। ঠাকুর নিতেন প্রধান ভূমিকা। মায়েরা তাঁকে মহাদেব বুদ্ধ চৈতন্য বিল্বমঙ্গল ইত্যাদি ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছেন। ভাবের আশ্চর্য প্রকাশে সে অভিনয় পেশাদার অভিনেতার চেয়ে অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী হত, মায়েদের অন্তত এই অভিমত। বিল্বমঙ্গল সেজে তিনি যখন স্বগত আবৃত্তি করতেন—

আমি কার কে আছে আমার
কার তরে জীবনের উত্তাপ বহন ?
শূন্য অভিপ্রায়ে
ঘুরিতেছি নশ্বর—নশ্বর ছায়া মাঝে।
কোথা কে আছ আমার
দেখা দাও যদি থাক কেহ
জুড়াই প্রাণের জ্বালা
প্রাণমন করি সমর্পণ।

তখন দর্শকদের মনে হত এ বিল্বমঙ্গলের উক্তি নয়—ঠাকুরেরই প্রাণের কথা। এমনি অব্যক্ত ক্ষোভ নিয়েই নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় একদিন সংসার পিছনে ফেলে সন্ন্যাসের পথে ছুটে গিয়েছিলেন।

কদাকার ছায়ার সংসার
হেথা কোথা প্রেমের আধার
কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যাহে হবে লয় ?

এ-জিজ্ঞাসা গিরিশের বিল্বমঙ্গলের নয় শুধু—পরিব্রাজকাচার্য নিগমানন্দেরও। যোগে আত্মসাক্ষাৎকার করে সংসারকে তাঁর কদাকার ছায়া মনে হত। সেই সঙ্গে মনে হত, কই উষর হৃদয় সরস হবে কার স্পর্শে? প্রাণের জ্বালা তো জুড়াল না। সেই জ্বালাই তাঁকে কাশীপুরাধীশ্বরীর দুয়ারে ভিখারী করেছে, নিয়ে গেছে ভাব-সাধনার পথে।

কে কোথায় আছ প্রেমময়
প্রেম দিতে আছে বড় সাধ।

—বলতে গিয়ে অভিনেতার দৃষ্টি সজল হয়ে উঠত। বিল্বমঙ্গলের এ-বেদনা যে নিগমানন্দেরও মর্মকথা তিনি না বললেও মায়েদের তা বুঝতে বাকি থাকত না। গিরিশ ঘোষের এই সব অপূর্ব সংলাপের জন্যই নাট্যকারদের মধ্যে তাঁকে ঠাকুর সবচেয়ে পছন্দ করতেন। আর একটু বড় হয়ে আমিও তাঁর মুখে গিরিশের নাটক শুনেছি। সে কথা যথাসময়ে বলব।

কবে প্রথম গান শুনেছিলাম তাঁর মুখে মনে নাই। হয়তো এই বয়সেই হবে। স্মৃতিপটে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে সেই গান—'নন্দি গিরিনন্দিনী ত্রিনয়নের নয়নতারা, তারাহারা হয়ে রে আমি হয়ে আছি রে তারাহারা'। দক্ষযজ্ঞের গান। শুনেছি ছোটবেলায় যাত্রা দেখতে গিয়ে এই দক্ষযজ্ঞ হরগৌরী-জাতীয় পালা দেখেই মোহাবিষ্টের মত ভগবতীবেশী নটের পিছনে ঘুরেছিলেন। সতীর দেহত্যাগ তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। শিবনিন্দা সইতে না পেরে সতী প্রাণ দিলেন দেখে সতীনাথের মত তাঁরও শোক লেগেছিল কি? সেদিন থেকেই কি আমাদের ভোলানাথও তারাখ্যাপা হয়েছিলেন নিজের অজ্ঞাতে? ওই গানটি যে কোনদিন ভোলেননি তার ব্যঞ্জনা সামান্য নয়। 'ঠাকুর

আমার খাতায় দু'একটা গান লিখে দিন আপনার পছন্দমত' এই অনুরোধ করায় মায়ের খাতায় নিজের হাতে লিখেছিলেন ওই গানটিরই চারছত্র। আজও তাঁর হস্তাক্ষরে সে-খাতায় ও-গান লেখা আছে। কালের ব্যবধান ছাপিয়ে আমার কানে আজও ভেসে আসে ও-গানের করুণ উদাসকরা সুর।

মেঘের স্তনিত নিস্বনে আচম্‌কা কেঁপে ওঠে বুকের মধ্যে, না ভয়ে নয়, অভাবনীয়ের স্পর্শে ঝঙ্কার ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রীতে। অতর্কিতে তাঁর কণ্ঠে যেন গুরু গুরু নাদে ওই গানের সুর শুনে আমারও বুক কেঁপে উঠেছিল।

মনে পড়ে যখনই গান গাইতেন অমনি হঠাৎ হঠাৎ-ই গেয়ে উঠতেন। নলহাতে আনমনা হয়ে দূরনিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন হয়তো। থাকতে থাকতে গানে টান দিলেন—

আমি কি সুখে ঘরে আছি যে
কারে কই তা কেবা শোনে।
ঘরে মা-বাপে মোর ঘোর অনৈক্য
মিলন নাই তিলেক দুজনে॥

এখন বুঝি সর্বদাই ভাবস্থ থাকতেন তিনি। সর্বদাই চিত্তে স্মরণ-মনন চলত আরাধ্য দেবতার। তারই বহিঃপ্রকাশ ওই সব ভাবগর্ভ গান।

কখনও খেদ—

তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসার-গারদে থাটি বল্।
আর বাঁচিতে সাধ নাই বাসনা সদাই ফণী ধরে খাই হলাহল॥

পুরো গানটা হয়তো গাইলেন না! ভাবানুকূল দুয়েকটি ছত্র গেয়েই চুপ হয়ে গেলেন। আবার তেমন পছন্দসই গান হলে হয়তো সবটাই গাইতেন।

কোনও দিন গভীর অভিমানে গেয়ে উঠতেন—

আমার মানস সন্তাপ নাশিতে
যদি তোমার দুখ হয়।
আমার যা হবার তা হবে কেন দুখ পাবে
সুখে থাক ওহে সুখময়॥

*

পড়েছি বিপাকে আপন কর্ম-পাকে
তুমি বিনে আর কে খণ্ডাবে তাকে
মরম বেদনা নিবেদি' তোমাকে
তুষানলে জ্বলে এ-হৃদয়॥

কখনো বা তত্ত্বালাপ—

জ্ঞান কর কি জ্ঞানগোচরা গিরিজা তব নন্দিনী
মা আমার অনন্তরূপা বহু মায়াবিনী॥
তুমি তনয়া ভাব কিন্তু যত ত্রিলোকবাসীতে
কেহ ভাবে অসিতে তারে কেহ বা তারে ভাবে সীতে
কাশীতে নাশিতে দৈন্য অন্নদায়িনী॥

কখনো আবার প্রেমভক্তিতে বিগলিত বিশ্রম্ভালাপ—

কে বলে তারিণী তোমায় কালবরণী
নিরুপমা রূপ শ্যামা ভুবনমোহিনী।
না হলে কি ত্রিলোচন করিত পরম যতন
সতত রেখেছ বক্ষে চরণ দুখানি॥

তাঁর কণ্ঠে এসব গান শোনার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, বাজারে প্রচলিত সাধকসঙ্গীত তাদের আলুনি লাগবেই। শুধু কণ্ঠসম্পদ কি গীতচাতুর্যে এসব গানে প্রাণ সঞ্চার হয় না। ভাবের অভাবে ওর আস্বাদন পনেরো আনাই মাটি।

একদিন তাঁর মুখে শুনলাম এই দুই ছত্র,

আমার বলে ছিল যারা তারা তো কেউ দেয় না সাড়া
আমি কোথায় তারা কোথায় তারা তারা বলে কেবল ডাকি।

শেষ ছত্রের ওই যে 'তারা বলে কেবল ডাকি' এ-গানে তাঁর মুখে তা—রা বলে যে উদাত্ত আহ্বান শুনেছিলাম সেকি জীবনে ভুলবার? ওই হল মন্ত্রবীর্য। সিদ্ধপুরুষের হৃদয়নিঙড়ানো আকৃতিতে নাম কেবল অক্ষরপঙ্‌ক্তি থাকে না, হয় নামীর বাচক। ঠাকুরের মুখে 'তারা' নাম শুনেই এ সত্য জেনেছি।

এমন দিন কি হবে মা তারা
যবে তারা তারা তারা বলে
দুনয়নে বইবে ধারা।

ভাগবত বলেন হরিনামে যার হৃদয় গলে না তার হৃদয় তো পাষাণ। সত্যই পাষাণচিত্ত আমি, নইলে ঠাকুরের মুখে এ সব গান শুনেও কেন প্রাণ গলেনি? শুধু শুনেই গেছি।

অবসর পেলেই তাঁকে গিয়ে ধরে বসি, 'গান কর বাবা, নয়তো গল্প বল।' বেশ পেয়ে বসেছি আর কি! কিন্তু যাঁকে সহজপ্রাপ্য বলে ধরেছি তিনি স্বচ্ছন্দে দুরাপনীয় হয়ে যেতে পারতেন। একদিনের কথা খুব মনে আছে।

সন্ধ্যার লঘু জলযোগ সেরে আপন ভাবে ডুবে থাকতেন। কোন্ সময়ই বা না থাকতেন? আমি তাঁকে যখন দেখেছি তখন বেশির

ভাগ সময়ই তিনি আত্মমগ্ন থাকতেন।—নীলাচল কুটিরে অন্তত তা-ই দেখতাম। সন্ধ্যার পর এই মগ্নদশা আরও বাড়ত। সেবক-সেবিকাদের উপরে নির্দেশ ছিল, তারাও কোন প্রশ্ন করবে না এসময়। এক যা সাতখুন মাপ আমার। আমি কাছে গেলেই জ্বালাতাম কথা কয়ে। কোন দিন বকুনি খাইনি। কিন্তু নিজেই সংবৃত হতাম—দু' একটা কথা বলেই বুঝতে পারতাম আমার সঙ্গে যে বৈঠকী মেজাজে কথা বলেন অন্য সময়, এখন তা নাই। একদিনে বুঝিনি—ধাক্কা খেয়ে খেয়ে তবে বুঝেছি। যেদিনের কথা বলতে যাচ্ছি সেদিন এ অভিজ্ঞতাটা প্রবল রকম হয়েছিল।

অন্য দিনের মত গা ঘেঁষে বসেছি। 'বাবা গল্প বল'—উত্তর নাই। 'ও বাবা বলনা একটা গল্প—না তামাক খেতে হবে না' হাত থেকে হুঁকার নল টেনে সরিয়ে দিই। আধবোজা চোখে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে ঠাকুর চিৎ হয়ে শুয়েছিলেন। আমার উৎপাতে চোখ মেলে চেয়ে হুঁকার নলটা উদ্ধার করে দু'চারটা টান দিলেন। 'গল্প শুনবি?' 'হ্যাঁ' উৎফুল্ল মুখে জড়িয়ে ধরি তাঁর হাতখানা। পুরা মানুষটাকে জড়িয়ে ধরব হাত দু' খানা এত বড় তখনও হয়নি। হয় পেটটা জড়িয়ে ধরতাম নয় তো পিঠটা কি হাতখানা। তিনি স্মিতমুখে গল্প আরম্ভ করলেন—

'একদিন একটা লোক পাখী ধরতে বার হয়েছে। লোকটা বড় গরীব। পাখী ধরাই তার ব্যবসা। সুন্দর সুন্দর পাখী ধরে শহরে এনে বিক্রী করে যা পায় তাতেই সংসার চলে।' গল্পের উপক্রমণিকা শুনে আমি খুব খুশী। পাখীধরা সম্বন্ধে কোনও গল্প শুনিনি এ যাবৎ। জিজ্ঞাসা করি 'সুন্দর সুন্দর কি পাখী বাবা?' তিনি বললেন 'এই টিয়া চন্দনা হীরামন কাকাতুয়া শ্যামা দোয়েল কত কি!' কোন্‌টা দেখতে

কি রকম আমার এই প্রশ্নে বাধা দিয়ে বলেন 'তারপর কি হোল শোন্! লোকটা বনে গিয়ে মস্ত একটা জাল পাতল। পেতে খাবার ছড়িয়ে দিয়ে ঘরে চলে গেল। সারা দিনে অনেক পাখী পড়বে, ও সন্ধ্যাবেলা এসে নিয়ে যাবে। পাখী তো অনেক পড়ল। কিন্তু জালটায় একটা ফুটো ছিল লোকটা জানত না। পাখীগুলোর মধ্যে একটা পাখী সেই ফুটো দিয়ে ফুড়ুৎ করে বার হয়ে গেল।' বলে ভুড়্ ভুড়্ ভুড়্ ভুড়্ করে তামাক খেতে শুরু করলেন গল্পকথক। আমার আর কৌতূহল বাধা মানে না। তারপর? উত্তর হল 'তারপর ফুড়ুৎ করে আরও একটা পাখী বার হয়ে গেল।' আবার চুপচাপ। 'ও বাবা বল তারপর কি হল?' 'তারপর আবার ফুড়ুৎ—আরেকটা গেল।' 'তার পরে?' 'দাঁড়া আগে সব পাখী বার হয়ে যাক। একটার পর একটা ফুড়ুৎ করে উড়ে যাচ্ছে তো!' বলে নলহাতে চোখ বুজলেন তিনি। বেজায় জব্দ হয়েছি বুঝে হতাশভাবে কেটে পড়লাম। তাঁর ইচ্ছা না হলে ধরা ছোঁয়া যায় না তাঁকে সে-দিন সন্ধ্যায় নিঃসংশয়ে এটুকু বুঝেছিলাম।

১৩৩৮ সালের পূজায় তিনি নীলাচল কুটিরেই ছিলেন। পূজার কয়দিন বেশ ভাল ভাল রান্না হয়েছিল, নতুন জামা পেলাম। পূজার স্মৃতি এই প্রথম মনে আছে। মহাষ্টমীতে ঠাকুরের পায়ে জবার অঞ্জলি দিলেন মায়েরা, আমিও দিলাম। সেইবারই সম্ভবতঃ মঠাশ্রমে প্রচলিত স্তোত্রবন্দনাগুলি কণ্ঠস্থ করার নির্দেশ পেলাম। যো হুকুম—স্তোত্রমালা নিয়ে লেগে গেলাম মুখস্থ করতে। সন্ধ্যায় ধূপদানীতে ধূনা ছড়িয়ে তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করতেন মায়েরা। পূজা-বন্দনা বলতে নীলাচল কুটিরে নিত্য অনুষ্ঠান ওইটুকুই ছিল। ও বাড়িতে ঠাকুর তো মঠাশ্রমের ঠাকুর সেজে থাকতেন না, থাকতেন গৃহকর্তার মত।

তাঁর আবার পূজার্চনা কি? তবে আমার শিক্ষার জন্য সে-বছর থেকে একটা নতুন নিয়ম চালু হল। সন্ধ্যায় ধূপ দেওয়ার সময় আমাকে স্তোত্রপাঠ করতে হবে।

আমি তখন ছ'বছরের মেয়ে কাজেই নানা রকম নিয়ম-কানুন প্রয়োগ হতে শুরু করল আমার উপর। একা বাইরে যাওয়া চলবে না, ব্রহ্মচারীদের কাছে গিয়ে খেলা বা গল্প করা নিষেধ। খুব বিরক্ত হলেও এ নিয়ম দুটি সাধ্যমত পালন করতাম। কিন্তু সূর্যোদয়ের আগে উঠতে হবে, দুপুরে ঘুমানো চলবে না, ঘিয়ে ভাজা খাবার বেশি না খেয়ে খেতে হবে ফল দুধ—এর একটা নির্দেশও আমার দ্বারা রক্ষিত হত না। আগেই বলেছি ঠাকুরের আদর্শবাদটা এত বেশি ছিল যে অন্যের পক্ষে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা দুষ্কর। রাত্রি এগারটার আগে নীলাচল কুটির নিস্তব্ধ হত না। আমার মাথা-গরম ধাত—এগারটার আগে ঘুমও আসে না। সারা বাড়ি অন্ধকার হলে চোখে ঘুম নামত। এ অবস্থায় ছ'বছরের মেয়ের ভোর সাড়ে চারটায় ওঠা কি সম্ভব? দুপুরে ঘুমানোটা সত্যই খারাপ, ঘিয়ে ভাজা খাবার বেশি খাওয়াটাও ভাল নয় তা ঠিক। কিন্তু এত তলিয়ে বুঝবার বয়স কি তখনই হয়েছিল? সুতরাং পদে পদে তাঁর নিষেধ অমান্য করতাম। তিনি একদিন আক্ষেপ করে বললেন 'পরের বাড়ির ছেলেমেয়েরা আমার কথা শোনে। কিন্তু নিজের বাড়িতে এ-মেয়েকে আমি কিছুই শেখাতে পারলাম না।' এ শুধু আমায় নয় মায়েদেরও প্রচ্ছন্ন তিরস্কার। তাঁরা কেন আমায় বাগ মানাতে পারছেন না। এমনি করে প্রতিপদে তাঁকে রুষ্ট হতে দেখতাম আমার 'পরে। যমের মত ভয় করতাম ওই জন্য, একটুও ভালবাসতাম না। তবু আমার ভাগ্য ভাল, কোন দিন গায়ে হাত তোলেননি। মঠাশ্রমের ছেলেমেয়েদের অমনিতর অপরাধে নাকি মেরে আধমরা

করে দিয়েছেন মায়েদের মুখে গল্প শুনেছি। সাধারণ বিচারে তাঁর এ অসহিষ্ণুতা কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। আমি সমর্থন করতেও চাই না। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ করি তাঁর বিপুল স্নেহ, তিনি বড় ভালবাসতেন বলেই যারা তাঁর (তিনি যাদের তাঁর বলে মনে করতেন) তাদের কঠিন শাসনও করতেন।

এ আমার মনগড়া কথা নয়। জনৈক মঠান্তেবাসীর দিনলিপিতে পেয়েছি '৩০ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর বিমলা মাসীমার কথা বলতে গিয়েই মঠের ছেলেদের বলেছিলেন 'শুধু বিমু কেন, ঈশ্বর নরসিং সুর, এদের আমি নিজে গড়ে-পিটে মানুষ করেছি। একেক জন কি কম মার খেয়েছে আমার কাছে? তাই, ওদের আমি যেমন ভালবাসি নতুনদের তেমন পারি না। যাকে ধরে মারতে পারি, জানবি তাকেই আমি বড় ভালবাসি! ভালবাসার জনকে মেরে কেটে খুন করে ফেলতে পারি দরকার হলে—এমন জোর যদি থাকে তবে না খাঁটি ভালবাসা!' কথাগুলি শুনতে ভয়াবহ সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি মনে করি এ একেবারে শ্রীগুরু-ভগবানের আঁতের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন 'পরের মঙ্গলের জন্য তমোগুণাশ্রয় করা চলে। উত্তম বৈদ্য বুকে হাঁটু দিয়ে ওষুধ গেলান। উত্তম থাকের আচার্যও তাই।' (কথামৃত ১।৩।৩ ; ১১।৫)

বস্তুত ঠাকুরকে মানুষবুদ্ধিতে দেখলে তাঁর অনেক আচরণ সমালোচনার যোগ্য এ আমি বহুবার বলেছি। কিন্তু গুরুবুদ্ধি করলে কোন সমালোচনাই চলে না এ-ও জোর করে বলব। উপমন্যুর গল্পটা মহাভারত যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় জানেন। আধুনিক যুগেও গুরুভাবে দেবদাসজী (কাঠিয়া বাবার গুরু), ভোলা গিরি—এঁরা কি শিষ্যকে কম নির্যাতন করেছেন? 'তাঁর যত ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়ে' এ উক্তি, মানুষ হয়েও যাঁরা গুরুগিরির মহাদায় বহন করেন সম্ভবত তাঁদের

লক্ষ্য করেই বলা। গুরু হওয়ার ঠেলা আছে অনেক। তার মধ্যে একটা নিশ্চয় এই যে সাড়ে তিনহাত দেহধারী একটা মানুষের মধ্যে জগদীশ্বরের মহাভাব ফুটতে চাইলে সে মানুষটিকে যেভাবে চলতে হয়, অজ্ঞ অল্পবুদ্ধিরা দূরে থাক বিজ্ঞ তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিও তাঁর সে চালচলনের অর্থ বুঝতে পারেন না।

ক্রমেই আমার চোখ-কান ফুটছে, চেয়ে দেখতে শিখছি তাঁকে: ভোরবেলা দেখছি বিরাট পালঙ্কে শয়ান তাঁর মহামূর্তি। সকালের আলো ফুটলে দেখছি তক্তপোষে বসে চেয়ে আছেন পূর্বমুখে, সূর্যকিরণে ঝলমল করছে সমুদ্রের নীল জল। দেখছি দক্ষিণের বারান্দায় চৌকিতে মুখ ধুতে বসেছেন। আসন করে বসেছেন, ডান পা খানি বাম উরুতে রেখে। বাঁ হাতে মাজন, ডান হাতে দাঁত মাজছেন। কতদিন চোখে পড়ত মাজনশুদ্ধ বাঁহাতখানা শিথিলভঙ্গিতে পড়ে আছে বাম-উরু-ন্যস্ত ডানপায়ের উপর। দাঁতমাজা ভুলে তিনি স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছেন। ছোট্ট মেয়ে আমি, আমিও বুঝতাম বাইরের জগৎ ভুল হয়ে গেছে হঠাৎ। কোথায় যেন চলে গেছেন বাবা। ভাল লাগত না আমার। এসে পিছন থেকে পিঠের উপর পড়ে জড়িয়ে ধরতাম, নয় তো পিঠে সুড়সুড়ি দিতাম। বাহ্য ফিরে পেয়ে আবার দাঁত মাজতে শুরু করতেন।

নীলাচল কুটিরের পূবের ঘরে (নীচে) এসে বসতেন সকালের জলখাওয়া সেরে। চেয়ে-চেয়ে দেখি চশমা চোখে দৈনিক জমাখরচের খাতা দেখছেন কি তবিল মেলাচ্ছেন হয়তো। কিংবা গভীর মনোযোগে চিঠি লিখছেন। প্রশস্ত ললাটে তিনটি রেখা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। বিচক্ষণ গম্ভীর মূর্তি। কখনও ঈষৎ ভ্রূকুটি ফুটছে, কখনও মুখভা

চিন্তিত। আবার স্নানের আগে উত্তরের বারান্দায় চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন, পা রয়েছে সামনে চৌকীতে। মায়েরা কেউ চুলে তেল দিচ্ছেন। পরনের কাপড়খানা গুটিয়ে উরুর উপর তুলে দিয়ে হরেনদারা একজন সজোরে সরষের তেল মাখিয়ে দলাই মলাই করছেন তাঁকে। শরীরটা যেন নিজের নয় অন্য কারও এইভাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওই 'স্থল-হস্তাবলেপ' স্বচ্ছন্দে স্বীকার করে তিনি একমনে পড়ে চলেছেন সাপ্তাহিক বসুমতী কি ভারতবর্ষ। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার এত অবাক্ লাগত দেখে! তেলমাখানোতে নিজের বড় আপত্তি ছিল। মাথায় গায়ে মা তেল মাখালে অস্বস্তিতে ছট্‌ফট্ করতাম। মায়েরা বকতেন— 'কি তিড়িং মিড়িং করছিস্, বস্‌না একটু স্থির হয়ে।' অথচ ওই একজনকে ঘণ্টাখানেকের উপরে ময়দার তালের মত ঠাসছে। উনি কি করে কাগজ পড়ছেন কে জানে! বড় হয়ে সে-বিস্ময় অবশ্য কেটে গেছে। বুঝেছি তেলমাখা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ওতে অস্বস্তি ধরে না বরং আরামই লাগে। আচ্ছা, সে নাহয় হল। কিন্তু স্নানকালে তাঁর সেই উঁচু করে ঝুঁটিবাঁধা তৈলচর্চিত বিগ্রহে কেন গঙ্গাধরের সাদৃশ্য খুঁজে পেতাম? স্নানান্তে রাশি রাশি কোঁকড়া চুল ছড়িয়ে পড়েছে মুখে বুকে পিঠে, চুল মুছিয়ে দিচ্ছেন মা। তিনি আমীলিত নেত্রে উপাংশু-জপনিমগ্ন। স্ফুরিত হচ্ছে ওষ্ঠপুট, অব্যক্ত আনন্দের আভা মুখে। মধ্যাহ্নভোগের সময় দেখতাম তাঁর আত্মস্থ রসাস্বাদ। কেন এসব দাগ কেটেছিল মনে? কি দেখতে পেতাম তাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ আচরণে? আমার মুগ্ধতা তো পরিণত মনের গুরুবুদ্ধিতে শ্রদ্ধা নয়!

বড় হয়ে নিজের মনকে নানা রকমে বিচার করেছি। না, ছোটবেলায় গুরু কি ঠাকুর কাকে বলে তা জানতাম না। 'আমার বাবা' এই জানতাম তাঁকে। অথচ পরিপূর্ণ আত্মীয়বুদ্ধি নিয়েও প্রতিপদে তাঁকে সম্ভ্রম

করতাম। নিজের অজানিতে উঠতে বসতে তাঁকে দেখে কৈলাসপতি সদাশিবকে মনে পড়ত। খুব ছোটবেলাতেই ফটো দেখে দেবদেবী চিনতে শিখেছিলাম। কালী কৃষ্ণ দুর্গা সরস্বতী গৌরাঙ্গ হর-গৌরী লক্ষ্মী গণেশ সকলকে দেখে-শুনে আমার ভাল লাগত সরস্বতী আর হর-গৌরী। শিবের ভক্ত ছিলাম ছোটবেলায়। আমার সেই শিশুচিত্তের ইষ্টদেবতাকে অহোরাত্র আমি দেখতে পেতাম পিতাঠাকুরের স্থূল দেহে। একে তাঁর মহিমা ছাড়া আর কি বলব?

কাছে বসে খেয়েছি খেলেছি একসঙ্গে শুয়েছি বেড়িয়েছি গল্প করেছি আবদার করেছি। আমার মত অবাধ প্রশ্রয় কেউ পায়নি তাঁর কাছে। কিন্তু সেই আমিও থেকে থেকে থমকে গেছি তাঁর দিকে চেয়ে। এ কে? এ তো তোমার-আমার মত মানুষ নয়! তাঁর হাসি কথা অতি সহজ ভাবের অন্তরাল হতে ক্ষণে ক্ষণে আরেকজন যেন ফুটে বার হতেন। ছদ্মবেশী অর্জুনকে দেখে দ্রুপদসভায় লোকে বলাবলি করেছিল, ইনি কি সাধারণ ভিখারী ব্রাহ্মণ? তা নয়, এ যে 'অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত।'

ছাইচাপা আগুনের মত আমাদের ঠাকুরের ভিতর থেকেও আলো আর তাপ ঠিকরে পড়ত। যত অজ্ঞানই হই, তার আঁচ না লেগে কি পারে? আজ বুঝতে পারি বাবা বলে যতই দাবী করি না কেন, তাঁর কাছে গেলেই পরমদেবতার স্পর্শ পেতাম হৃদয়ে। আমার সম্ভ্রম ও মুগ্ধতার মূলে ছিল এই অবুঝ মহিমজ্ঞান।

এই কি যথার্থ মহাপুরুষলক্ষণ নয়? তিনি যা-ই করুন তবু তাঁকে আশ্রয় করে আ-ভাসিত হচ্ছেন অ-মানব পুরুষ। আর তুমি-আমি যত সদাচারীই হই তবু মানুষ বৈ আর কিছুই নই। অস্ফুট কৈশোরেই নিজের অজানিতে এবং অনিচ্ছায় আমি তাঁকে 'ঠাকুর' ভাবতে বাধ্য হয়েছি

ভক্তি দূরে থাক বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত শাসিত হয়েছি তাঁর অনুশাসনে, তত রাগ-বিরক্তি জমেছে মনে। সাধারণ ছোট ছেলে বাপকে যেটুকু ভালবাসে আমার বোধহয় তাও ছিল না। তবু ঠাকুর বলে মেনেছি তাঁকে, শিবের ছবি চোখে পড়লেই ভেবেছি এই তো আমার বাবা।

'৩৮ সালের ১লা পৌষ পুরী হতে লেখা একখানা চিঠিতে (ঠাকুরের চিঠি নং ২।১৫) জানি তিনি সে-বার ৮ই পৌষ হাওড়া পৌছাবেন বলে লিখেছিলেন। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের ৩৮নং চিঠিতে দেখছি ১০ই পৌষ তিনি পুরী থেকেই চিঠি দিচ্ছেন কোনও শিষ্যাকে। হয়তো সেই দিন বিকালে তিনি হাওড়া রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু সম্মিলনীর ইতিহাসে দেখছি ১৩৩৮ সালে ১০ই পৌষই সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশন ধার্য হয়েছিল। সম্মিলনীর চিঠির লেখক বলছেন তিনি বগুড়া হতে হালিসহর গিয়েই ঠাকুরের দেখা পেয়েছিলেন। অর্থাৎ চিঠি নং ২।১৫ অনুযায়ী ৯ই পৌষ হালিসহরে উপস্থিত ছিলেন তিনি। এ ক্ষেত্রে বলতে হবে ৩।৩৮ নং চিঠিতে কোন রকম তারিখের গোলমাল আছে।

'৩৮ সালের ভক্তসম্মিলনীর বিস্তৃত বিবরণ সম্মিলনীর চিঠিতে সকলেই পড়েছেন। আমি তার পুনরুক্তি করব না। নীলাচল কুটিরের ইতিহাসে সন ১৩৩৮ সালের গুরুত্ব রয়েছে অন্য কারণে।

বন্যার ভ্রমণ সেরে ১৩৩৫ সালে ঠাকুর কার্তিকের শেষে পুরী ফিরে আসেন। মাসখানেক তিনি পুরীতেই ছিলেন। সম্ভবত সম্মিলনীতে যোগ দেবার জন্য অগ্রাণের শেষে বা পৌষের প্রথমে তিনি বাংলায় যান। এই সময় (ইং ১৯২৮, ১২ই ডিসেম্বর) বালাজী রাজু, দীনবন্ধু দেও এবং ঈশ্বর সাহু ঠাকুরের কাছে দীক্ষা পান। ওড়িশায় ঠাকুরের যে কয়জন দীক্ষিত শিষ্য আছেন, এই তিনজন তাঁদের অন্যতম। তারও আগে

বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন ওড়িশাবাসী যদি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েও থাকেন আমি অন্তত তাঁদের সম্বন্ধে কিছু জানি না। কিন্তু ঈশ্বর সাহু ওড়িশার ভক্তবৃন্দমধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় এইজন্য যে নীলাচলবাণী নামে যে-বইখানিতে মাননীয় দুর্গাচরণদা ঠাকুরের জীবনের কিছু ঘটনাবলী ও কুটিরে দেওয়া উপদেশগুলি সঞ্চয় করে রেখেছেন সেই অমূল্য বইখানার প্রথমেই তিনি ভূমিকালেখক হিসাবে স্থান দিয়েছেন ঈশ্বর সাহুকে। ওড়িশায় নিগমলহরী নামে একখানি কবিতার বই আছে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে তাঁর কয়েকটি দীক্ষিত শিষ্যের হৃদয়োচ্ছ্বাস ওটি। এ-খানি ওড়িশার নীলাচল সারস্বত সংঘে বহু সমাদৃত বই। ওড়িশার বহু ভক্তের মুখে আমি শুনেছি এ-বইয়ে ঈশ্বরসাহু রচিত কবিতাগুলি পড়ে অনেকেই আশ্চর্য প্রেরণা পেয়েছেন চিত্তে, গভীরভাবে ঠাকুর নিগমানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর অনেক ওড়িয়া ভক্তকে ঠাকুরপদতলে টেনে আনার কৃতিত্ব যে ঈশ্বর সাহুর, দুর্গাচরণদা তা জানেন বলেই নীলাচলবাণীতে তিনি তাঁকে অত মান দিয়েছেন। নীলাচল-বাণীর প্রকাশকাল ১৯৪৮ সাল। নিগমলহরী তার অনেক আগেই প্রকাশ পেয়েছিল।

নীলাচল বাণীতে দেখছি ১৯৩১ সালের ১৭ই মার্চ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর ও ওড়িয়া ভক্তদের সাক্ষাৎকারের বিষয় লিপিবদ্ধ। সময়টা তাহলে বাংলা সন ১৩৩৭ সালের চৈত্র মাস। আগেই বলেছি '৩৭ সালের ফাল্গুন মাসে ঠাকুর পুরী ফিরে এসে দু'মাস পুরীতেই ছিলেন। দুর্গাচরণদারা তাহলে এই সময়ই তাঁর কাছে নিয়মিত যাওয়া আসা শুরু করেছিলেন। কালনার সচ্চিদানন্দ সাহা সে সময় পুরী এসেছিলেন। তাঁর কথা আমার মনে আছে। আর দুর্গাচরণদাদের যে কত ছোট থেকে দেখেছি তার সঠিক হিসাব দেব কি করে? নীলাচল কুটিরের প্রধান সেবক

হরেনদাকে (ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, খড়কুশমা আশ্রম)* যতদিন থেকে মনে আছে যেন ততদিন থেকেই ওড়িশার গুরুভাইদেরও আমি দেখেছি। হরেনদার সঙ্গে ওঁদের স্মৃতিও জড়িয়ে রয়েছে। আজ খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি ধারণাটা খুব মিথ্যা নয়।

দুর্গাচরণদা বলছেন প্রথম দফায় ঠাকুরের কাছে এসেছিলেন বালাজী রাজু, দীনবন্ধু দেও ও ঈশ্বর সাহু। দ্বিতীয় দফায় এসেছিলেন তিনি ও তাঁর তিনটি সতীর্থ, নৃপাল জী এবং একাদশী হরিচন্দন ও গোবিন্দ পট্টনায়ক। তাঁরা তখন পুরী জেলা স্কুলের ছাত্র।

১৯২৯ সাল সেটা অর্থাৎ বাংলা ১৩৩৫-৩৬ সাল পুরীর এমার মঠ লাইব্রেরীতে যোগীগুরু ও প্রেমিকগুরু বই হাতে পান দুর্গাচরণদা। বই দুখানা পড়ে কিশোর ছাত্রটির মনে গভীরভাবে দাগ পড়ল। কাজটা অন্যায় জেনেও প্রেমিকগুরু বইখানার ফটো ছিঁড়ে নিয়ে এলেন তিনি। আসাম মঠের ঠিকানাও সংগ্রহ করেছিলেন বই থেকে। বাড়ি এসে কয়েকটা প্রশ্ন করে ঠাকুরকে বাংলা ভাষাতেই চিঠি লিখেছিলেন। ওড়িশার বিদ্যালয়ে তখন বাংলাও শেখানো হত। ঠাকুর মহারাজ চিঠি পেয়ে লিখলেন, 'তুমি যা প্রশ্ন করেছ তার উত্তর চিঠিতে দেওয়া সম্ভব নয়। তুমি সম্মিলনীতে এস অথবা পুরীতে নীলাচল কুটিরে ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা কর।' আশ্বিন মাসে তিমি ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা করে জানলেন ঠাকুর তখন ভ্রমণে রয়েছেন, কবে ফিরবেন স্থিরতা নাই। এরপর ছমাস কেটে গেল। ঠাকুর সেবছর প্রায় পুরীর বাইরেই কাটিয়েছিলেন বৈশাখ মাস থেকে। দুর্গাচরণদা বোধহয় স্কুলের পড়াশোনা করতেন আর মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যেতেন, তাঁর

* শ্রীমৎ স্বামী সেবানন্দ সরস্বতী।

প্রেমিকগুরু বইতে দেখা সেই ঠাকুর এলেন কি-না। এসে হতাশ হয়ে ফিরে যান।

ফাল্গুন মাসে তাঁর জ্বর হল সেই সঙ্গে মুখে একটা ব্রণ। দেখতে দেখতে সেই ব্রণ বড় হয়ে শ্বাস রোধ করে ফেলল যেন। প্রাণ যায় যায় অবস্থা। দুর্গাচরণদা বলেন 'এত কষ্ট হচ্ছিল যে মনে হল আর বাঁচব না। সেই সময় ভাবলাম ঠাকুরকেও আমার আর দেখা হল না।' রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যেন ঠাকুর এসে বলছেন, 'আমি এসেছি নীলাচল কুটিরে।' ঘুম ভেঙে দেখেন শ্বাসকষ্ট নাই, শরীর স্বস্থ বোধ হচ্ছে। ভাল হয়ে উঠেই নীলাচল কুটিরে গেলেন। সত্যই ঠাকুর ফিরেছেন। দেখা হয়ে গেল।

সেবার ৪ঠা চৈত্র ঠাকুর পুরী ফিরেছিলেন। সুতরাং '৩৬ সালের চৈত্রমাসে দুর্গাচরণদা তাঁর দেখা পেয়েছিলেন। একাদশীদা নৃপালদা ও গোবিন্দদা তাঁর সহপাঠী। সুতরাং তাঁরাও এই সময় বা তার কিছু পরে নীলাচল কুটীরে এসে জুটলেন। আমার বয়স তখন পাঁচ। সুতরাং আমি যে প্রায় জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নীলাচল কুটীরের বাইরের রোয়াকে বসে জটলা করতে দেখেছি আমার এ ধারণা কি খুব ভুল ?

সন ১৩৩৭ সালের প্রথমেই ঠাকুর আবার ভ্রমণে চলে গেলেন। আষাঢ় মাসে এসে মাসদেড়েক থেকেই আমাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কুতবপুর যান। ফিরে এসে হাওড়ায় বাড়ি ভাড়া করে বেশ কিছুদিন থাকার পরই মঠের গোলযোগে জড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। এ সব কথা আগেই লিখেছি। '৩৭ সালের শেষে তিনি যখন দীর্ঘদিন পরে পুরী এলেন, তখন আবার বেশ কিছুদিন দুর্গাচরণদারা তাঁর সঙ্গ পেলেন। নীলাচলবাণীতে ১৭ই মার্চ থেকেই (১৯৩১) বিবরণী শুরু হয়েছে।

শুনেছি নৃপালদার তখন থেকেই দিনলিপি রাখার অভ্যাস ছিল। সে সময়ের অনেক কথা তিনি ধরে রেখেছিলেন। পরে তাঁর ও নিজের সংগ্রহ মিলিয়েই দুর্গাচরণদা নীলাচলবাণী প্রকাশ করেন।

আসলে ১৩৩৮ সাল থেকেই ওড়িশার ভক্তদের ঠাকুরের সঙ্গে ভাল রকম মেলামেশা শুরু হল। সুতরাং নীলাচল কুটিরের ইতিহাসে ১৩৩৮ সালের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ বছর একাদিক্রমে প্রায় ছ'মাস তিনি পুরীতে ছিলেন তো! জীবনে এই প্রথম আমি যেমন দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গ পেলাম তেমনি পেলেন আমার ওড়িশার ভাইয়েরা।

'৩৮ সালের অক্ষয় তৃতীয়ায় ঠাকুর নীলাচল কুটিরে ছিলেন। সেদিন দুর্গাচরণদারা প্রসাদ পেয়েছিলেন। আষাঢ় মাসে ঠাকুর ফিরে আসার পর দুর্গাচরণদার বাবা ও কাকা লক্ষ্মীধর ঠাকুরের সঙ্গে এসে দেখা করেন। নৃপালদা ও গোবিন্দদা ছাড়া বাঞ্ছানিধি এবং গণেশ্বর বলে আরও দুজন ভক্ত এসেছিলেন ওই সঙ্গে। শেষের দুজনকে আমি তত চিনি না বলে বিশেষ কিছু বলতে পারব না। কিন্তু নৃপালদা ও লক্ষ্মীধরদার সঙ্গে অল্পদিনেই আমার বেশ আলাপ হয়ে গেল। নৃপালদা ভারি সপ্রতিভ ছিলেন কথায়-বার্তায়। তিনি আমায় পেলেই 'মন্নু' বলে ডেকে ঠাকুরসম্বন্ধে নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। 'ঠাকুর' বলতেন না তিনি। আমার মতই 'বাবা' বলে উল্লেখ করতেন। বাবা কখন খান, কি করেন, কি খেতে ভালবাসেন এই রকম অতি সাধারণ কথা তিনি সাগ্রহে জানতে চাইতেন। ঠাকুরের অতি তুচ্ছ কথাতেও যেন নৃপালদা রস পেতেন, শিশু হলেও এমনি মনে হত আমার। আর তাঁর পাশে বসে উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল মুখে প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগে শুনতেন লক্ষ্মীধরদা ও দুর্গাচরণদা। তাঁরা দুজন নীরব শ্রোতা। ঠাকুরের কথা আমি কি আর বলতে পারি? উঁচুদরের কিছুই বলতে পারব না জানা

কথা। আমি হয়তো বললাম, 'বাবা ভোর চারটা থেকেই জেগে থাকেন, কি বাবার ঘুম খুব কম। রাত্রে কেউ একটু নড়াচড়া করলেই বাবা বলে ওঠেন কে? যেন সারারাত্রি জেগেই থাকেন।' তিন শ্রোতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ কথাটায় তাঁরা কি তথ্য আহরণ করেন সে বয়সে আমি একটুও বুঝতে পারতাম না। খাওয়ার কথায় বলি, 'বাবা মুসুরি ডাল আর আলু পছন্দ করেন না। কচু খেতে ভালবাসেন, শাক খেতে ভালবাসেন আর খান কলাইয়ের ডাল।' তিন শ্রোতা সবিস্ময়ে এবং সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, যেন কি পুরাণ-কাহিনীই পাঠ করলাম! ওইটুকু বয়সেই ওড়িশার ভক্তদের ঠাকুরকে নিয়ে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমের ভাবটি আমার চিত্তে সাড়া জাগাত। উৎকল বৈষ্ণবের দেশ—ভক্তি ওখানকার সহজধর্ম। সেদিন যে কয়টি ছেলে ঠাকুরের আশেপাশে এসে সমবেত হয়েছিলেন কোন সন্দেহ নাই তাঁরা নির্বিচারে ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়েছিলেন। আর আমি তো প্রথম থেকেই বলছি নীলাচলের ঠাকুর ছিলেন আত্মসমাহিত গম্ভীরাত্মা। আসামে ও বাংলায় প্রাচীন শিষ্য-ভক্তরা ঠাকুরকে কেমন দেখেছেন আমি জানি না। কিন্তু দুর্গাচরণদারা ঠাকুরকে যখন দেখলেন তখনকার ঠাকুরের পরিচয় বোধহয় শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের শ্রুতিস্মৃতি গ্রন্থের ভূমিকাতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে—

"যতকাল তাঁহার সাহচর্য করিয়াছি তাহার মধ্যে কখনও তাঁহাকে কটু অশ্লীল বা অনার্য ভাষা বা বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনি নাই। * * * তিনি উদার সমদর্শী বিনয়ী হ্রীমান্ জীবজগৎ ও সর্বসাধারণের শুভঙ্কর ভক্তিপরবশ শরণাগতপালক ভক্তের সুহৃদ, অনুরক্ত ভক্ত ও সাধুগণের আশ্রয়স্বরূপ ও করুণার অবতার ছিলেন। * * * তাঁহার রুচি প্রকৃতি আচরণ ব্যবহার ভাব ভাষা অঙ্গভঙ্গী গতিবিধি সকলই আদর্শস্থানীয়

অনুকরণযোগ্য এবং হিতকর। তাঁহার শান্তশিষ্ট গুরুগম্ভীর মধুর স্বভাবে ও অমিয় সুধাবর্ষী বচনামৃত শ্রবণে অত্যধিক লালসাযুক্ত ছিলাম···।"

আমার মনে হয় নীলাচলের ভক্তরা ঠাকুরকে ঠিক এমনিই দেখেছিলেন। আর শেষের ছত্রটি যেন তাঁদেরই প্রাণের কথা। এই সব তরুণ ভক্তেরা ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্র। ঠাকুরের জ্ঞানগরিমা কি মহিমা কতটুকুই বা তাঁরা বুঝতেন? কিন্তু ঠাকুরকে তাঁদের সব মিলিয়ে বড় ভাল লাগত। নইলে কিসের টানে তাঁরা প্রতিদিন দু'বেলা সুযোগ পেলেই এসে বসতেন ঠাকুরের কাছে? আমার কাছে ওইসব ছোট খাট কথা শুনতেই বা তাঁদের অত আগ্রহ ছিল কেন?

একদিন কিন্তু একটা সত্যিকারের নতুন খবর দিয়েছিলাম, 'জানেন লক্ষ্মীধরদা, নৃপালদা, বাবা আজ রান্না করতে গিয়েছিলেন। হাঁ, আজ বাংলা থেকে গঙ্গাগোপালদা না কে যেন তরকারীর পার্সেল পাঠিয়েছিলেন। অনেক সব নতুন তরকারী ছিল যা এখানকার বাজারে মেলে না। বাবা তাই দেখে মায়েদের বললেন 'তোমরা যা যোগাড় করেছ করগে। আমি চচ্চড়ি রাঁধব আজ'।" লক্ষ্মীধরদার মুখে হাসি ধরে না—ঝুঁকে পড়ে সোৎসাহে বলেন, 'তারপর?' নৃপালদার যেন বাক্য হরে গেছে, এত আশ্চর্য হয়েছেন এই অভাবনীয় সংবাদে। বড় বড় চোখ করে শুধু চেয়ে আছেন। আমি হাত পা নেড়ে বলি—'সে যা কাণ্ড। যে পিঁড়িতে বসে জল খাবার খান সেই বড় পিঁড়িটা পেতে দেওয়া হল দক্ষিণের বারান্দায়। বাবা চশমা চোখে দিয়ে আসন করে বসলেন পিঁড়িতে, বসে উপুড় হয়ে তরকারী কুটতে লাগলেন। আবার বাঁ দিকে হুঁকাটা রয়েছে—এক এক বার বঁটি ফেলে তাড়াতাড়ি নলে কয়েকটা টান দিচ্ছেন।' বলতে বলতে আমার হাসি পেয়ে গেল।

লক্ষ্মীধরদাও হাসছেন। নৃপালদা মুচকি হেসে বললেন 'বাবা তরকারী সবটা কুটলেন ?' হাসি থামিয়ে বলি 'হ্যাঁ সুন্দর কুটলেন। আবার দিদিকে (সরযূ-মা) মেয়েকে (ডাক্তার মা) ডেকে দেখালেন কত অল্প করে ফেলেছেন তরকারীর খোসা। ওরা কেন বেশি করে খোসা ফেলে ?* রান্নাটা আজ আর হল না—বেলা বেশি হয়ে যাবে বলে মায়েরা দিলেন না। কাল সকাল সকাল সব ব্যবস্থা করে রান্না করতে দেবেন বাবাকে।'

নীলাচল কুটির থেকে প্রতিদিন বৈকালে ঠাকুর সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেন। পূর্বমুখে flag staff পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে ঘণ্টা খানেক স্বর্গদ্বারে বসতেন। মনে পড়ে ওই সময় একেক দিন লক্ষ্মীধরদা বা নৃপালদা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে কত কি জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। দুর্গাচরণদা এ সময়ে বেশির ভাগ সময় নির্বাক এবং তটস্থ থাকতেন। নিজে বড় কিছু প্রশ্ন করতেন না, কেবল দেখতেন আর শুনতেন। নৃপালদা ও গোবিন্দদাই ছিলেন অগ্রণী। আর আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে অগ্রসর হয়েছিলেন লক্ষ্মীধরদা; সেই সঙ্গে নৃপালদাও ছিলেন। সেদিন কে জানত স্বল্পভাষী মুখচোরা সেই দুর্গাচরণদা কালে নীলাচল সারস্বত সংঘের অধিনায়ক হয়ে দাঁড়াবেন ?

* সযূর-মা'র মুখে শুনেছিলাম তিনি কুটিরে আসার অল্পদিন পরে একদিন সকালে বসে কাঁচকলা কুটছেন। পূর্ববঙ্গের মানুষ খুব পরিষ্কার করে তরকারী কোটে। কোন তরকারীতে এতটুকু খোসার দাগও থাকবে না এই তাঁদের লক্ষ্য। ঠাকুর দক্ষিণের বারান্দায় বসে মুখ ধুচ্ছিলেন। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রান্নাঘরের সামনে উপবিষ্ট সরযূ-মাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন—'সেরেছে— এ-মেয়ে আমাকে ফকির করবে।' সরযূ-মা তো লজ্জায় ভয়ে কাঠ। কি হল রে বাবা ? তখন সদয় হয়ে বললেন 'অত পুরু করে কাঁচকলার খোসা ফেলেছ কেন ? আরও কম করে ফেলবে।'

যেদিন ঠাকুর বেড়াতে যেতেন না সেদিন আমাদের বড় মজা। বিকালে মুখ হাত ধুয়ে তামাক খেয়ে উত্তরের বারান্দায় চেয়ার দিতে বলতেন ঠাকুর। ওড়িয়া ছেলেদের ডাক পড়ত। ঠাকুর এসে চেয়ারে বসে শুরু করতেন গল্প। জিজ্ঞাসু কেউ থাকলে গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা কিছু হত হয়তো। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই উপদেশও দিতেন গল্পচ্ছলে।—সে যে কী উপভোগ্য! এই রকম সব আসরেই আমি ঠাকুরের মুখে তাঁর জীবনের নানা ঘটনা শুনেছি, শুনেছি নতুন নতুন গল্প। বিশেষ বিশেষ দর্শনার্থী এলে বেড়াতে যাবার আগে বা বেড়িয়ে ফিরে এসেও ঠাকুর এককেদিন বাইরের বারান্দায় বসতেন। কিন্তু সেসব দিনের চেয়ে যেদিন ওড়িশার ছেলেদের নিয়ে ঘরোয়া বৈঠক বসত সেইদিনই আসর জমত বেশি। এমনি এক বিশেষ দিনের কথা বলছি।

দুর্গাচরণদার পরিবারে প্রায় সকলে ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তাঁকে দেখেছেন, দীক্ষা নিয়েছেন। ওড়িশায় সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়েছেন এরকম ভাগ্যবান শিষ্য কয়েকটি আছে। কিন্তু বাবা মা কাকীমা এবং কাকা সকলেই ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য—এক দুর্গাচরণদার বাড়িতে ছাড়া আর কোন বাড়িতে এমনটি হয়নি।

১৯৩১ সালের ৫ই জুলাই সেদিন, নীলাচল-বাণীতে দেখছি। বাংলা '৩৮ সালের শ্রাবণ মাস। সেদিন দুর্গাচরণদা তাঁর বাবা, কাকা লক্ষ্মীধরদা নৃপালদা গোবিন্দদা বাঞ্ছানিধিভাই গণেশ্বরভাই সকলেই উপস্থিত হয়েছেন। কে কে ছিলেন আমার এতকাল পরে তা মনে থাকার কথা নয়। তবে উত্তরের বারান্দাভরা লোক, বাবার সঙ্গে গোবিন্দদা কথা বলছেন এইটা মনে পড়ে। হঠাৎ কি হল জানি না—কথা থেমে গেল বাবার। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সজোরে কেঁদে উঠে বিহ্বলের

মত তাঁর কোলের কাছে আছড়িয়ে পড়লেন গোবিন্দদা। মূর্ছা হয়ে গেছে তাঁর। ঠাকুর চেয়ার থেকে ঝুঁকে পড়ে গোবিন্দদার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'এর নাম গোবিন্দ না ?' 'হ্যাঁ ঠাকুর', হরেনদা সায় দিয়ে আস্তে আস্তে গোবিন্দদাকে টেনে তুললেন। তাঁকে বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ব্যাপারটা চোখ মেলে দেখলাম। কি যে হল বুঝলাম না কিছুই। পরে নৃপালদাদের কাছে শুনলাম, গোবিন্দদা ঠাকুরের জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করে মূর্ছিত হয়ে যান।

অনেকদিন পরে হাতে 'নীলাচলবাণী' পড়ল। পড়তে পড়তে সেই ঘটনাটা খুঁজে পেলাম। গোবিন্দদা প্রশ্ন করছেন—'ঠাকুর, সদ্‌গুরুকে পূজা না করে অন্য দেবদেবীর পূজা করব কেন ?' ঠাকুর মৃদু হেসে বললেন, 'তোমার গুরু যে সদ্‌গুরু একথা জানবে কি করে ?' প্রশ্নটার সোজা উত্তর না দিয়ে গোবিন্দদা বললেন, 'যে তার গুরুকে সদ্‌গুরু বলে জেনেছে তার পক্ষে কি ব্যবস্থা ঠাকুর ?' ঠাকুর উত্তর করলেন 'নিজের গুরুকে যে সদ্‌গুরু বলে চিনতে পারে, আমি জানি সে খুব বড় আধার। তার অন্য দেবদেবী পূজা করার কোন প্রয়োজন নাই। অন্যের কথা জানি না, আমি নিজের কথা বলছি। গুরু খুঁজতে গিয়ে আমি যে কি রকম বিড়ম্বনা ভোগ করেছিলাম তার কিছুটা যোগীগুরুতে প্রকাশ করেছি। যতদিন পর্যন্ত সদ্‌গুরু লাভ হয়নি ততদিনই বিড়ম্বনা। যখন সদ্‌গুরু পেয়ে তাঁকে নির্ভর করলাম তখন জানলাম ভগবানকে পাওয়ার এর চেয়ে সহজ পথ আর কিছু নাই। গরুর পিছনে রাখাল যেমন ছোটে তেমনি আমার সমস্ত বিপদে আপদে তিনি অলক্ষ্যে থেকে প্রতিপদে আমাকে রক্ষা করেছেন।

'তাই আমি জানি গুরুতে নির্ভর করতে পারলে ভগবান পাওয়া অতি সহজ। দেখ বিদ্যার্জন করে ধন-উপার্জনে বুদ্ধি প্রতিভা চাই। ব্যবসায়ে

মূলধন চাই। কিন্তু গুরুনির্ভরশীল ব্যক্তির বুদ্ধি প্রতিভা বা দৈহিক শক্তি কিছু না থাকলেও সে ভগবানকে পেতে পারে।

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গুরু ও ভগবানের তত্ত্ব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। নির্ভরতা সম্পর্কে যেখানে গুরু তাঁর লক্ষ্য সেখানে তিনি "অহং" শব্দ ব্যবহার করেছেন। আর যেখানে ভগবান্ লক্ষ্য সেখানে ব্যবহার করেছেন "তৎ"। ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলছেন " তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্।" আর তাঁকে যদি নির্ভর করতে না পার তবে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥'

দুর্গাচরণদা লিখছেন, এই শ্লোকটি বলেই ঠাকুর যেন গুরুভাবে তন্ময় হয়ে গেলেন। গোবিন্দভাই তাঁকে জ্যোতির্ময়মণ্ডলমধ্যে পদ্মাসনে সাক্ষাৎ গুরুমূর্তিতে অধিষ্ঠিত দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

আমি সংশয়ী একথা অকপটে স্বীকার করব। অলৌকিক দর্শন শ্রবণকে এক কথায় কোনদিন আমল দিইনি। কিন্তু এ ঘটনাটার আমি প্রত্যক্ষদর্শী। ঠাকুর যে কথা বলতে বলতে অন্তর্মুখ হয়ে যেতেন এ তো বহুবার দেখেছি। সেদিন ঐ গীতাবাক্যে তাঁর স্বরূপের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি এবং দিতে গিয়ে ভাবান্তর হয়েছিল ঠাকুরের এ-ও মিথ্যা নয়। সেদিনের সেই হঠাৎ নেমে আসা ভাবগর্ভ স্তব্ধতা আজও মনে পড়ে। গোবিন্দদা সুকৃতিশালী। ঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত আত্মপরিচয় তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল সেই শুভক্ষণে। শ্লোকের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা চকিতে উপলব্ধি করে আনন্দে তিনি আত্মহারা হয়েছিলেন।

ঠাকুরকে সে সময়ের ওড়িশার ভক্তরা কি ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এ ঘটনাটিতে তার একটা সঙ্কেত রয়েছে। নীলাচল সারস্বত সংঘের বীজভাব ছিল এইটাই।

"৩৮ সালের ঝুলনপূর্ণিমাতেই দুর্গাচরণদারা প্রথম ঠাকুরের জন্মোৎসবে উপস্থিত থেকে পূজাবন্দনা ও প্রসাদসেবার সৌভাগ্য লাভ করলেন। অনেক ফুল এনেছিলেন তাঁরা—দুর্গাচরণদা উল্লেখ করছেন নীলাচল-বাণীতে। ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুরকে দেওয়া, ফুল দিয়ে তাঁর প্রতিমূর্তি সাজানো ওড়িশা সংঘের একটা বিশেষ সেবা। সেইবারই তার সূত্রপাত। আর সেই সূত্রে আমার মনে পড়ছে একাদশীদাকে। মুখে কথা ছিল না তাঁর। কিন্তু চোখে মুখে ভক্তির আশ্চর্য লাবণ্য ছিল। তিনি উৎসবের দিনে এসেই মালাগাঁথায় বসে যেতেন। ওড়িশায় মালা গাঁথতে অল্পবিস্তর সকলেই জানে। তারই মধ্যে কারও-কারও আবার বিশেষ দক্ষতা ওই মাল্যগ্রন্থনশিল্পে। একাদশীদা তেমনি একজন। অন্য সকলে রাশি রাশি ফুল যোগাড় করে এনেছেন, হরেনদার ফরমাস তামিল করছেন, তারই ফাঁকে ফাঁকে ঠাকুরপ্রসঙ্গ চলেছে। আর এক কোণে বসে গভীর মনোযোগে একাদশীদা নানা ছাঁদে মালা গেঁথে চলেছেন—তাঁর কথা ভাবতে গেলেই সবার আগে এই ছবিটা মনে পড়ে।

দুর্গাচরণদাদের আমার সবচেয়ে বেশি মনে আছে ওই বছরের শ্রীপঞ্চমীর দিন থেকে। আমার পড়াশোনার তদারক করতে-করতে বাবাই একদিন বলে রেখেছিলেন 'এবার তোমার বিদ্যারম্ভ শ্রীপঞ্চমী হতে'। কথাটা নীলাচল কুটিরের সবারই মনে ছিল, একা আমার নয়। ৭ই জানুয়ারী অর্থাৎ সম্মিলনী সেরে পৌষের শেষে ঠাকুর আবার পুরীতে ফিরে এলেন। মায়েদের উৎসাহে আমি সরস্বতী পূজার আয়োজনে লেগে গেলাম। হরেনদাকে বলে খুব সুন্দর একখানি সরস্বতীর ফটো আনালাম। পুরীতে আমার দু'একটি বন্ধু ও বান্ধবী ছিল। তাদের বলে রাখলাম—আমাদের বাড়িতে সরস্বতী পুজো হবে তোদের নিমন্ত্রণ। ঠিক হল ঘর দুয়ার সাজানো পূজার সাজ-সজ্জা সব আমি করব আমার

সঙ্গী সাথীদের নিয়ে। আমাদের অঞ্জলি দেওয়াবেন বাবা নিজে অর্থাৎ তিনিই হবেন পুরোহিত। দুর্গাচরণদারা যথারীতি রোজ বিকালে আসতেন। স্কুল ছুটি থাকলে সকালেও হাজিরা দিতেন একেক সময়। ১১ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সে-বছর শ্রীপঞ্চমী পড়েছিল।* পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় সমবেত ওড়িয়া ছাত্রদের বাবা নিজে নিমন্ত্রণ করলেন—'কাল মনুর বিদ্যারম্ভ। ও সরস্বতী পূজা করবে। তোমরা সবাই এস—এখানে প্রসাদ পাবে।' আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম বাবার চেয়ারের পাশে। নৃপালদা লক্ষ্মীধরদা একাদশীদা সকলেই হাসিমুখে একবার এই খুদে বিদ্যার্থীকে দেখে নিলেন। আমি সবিনয় লজ্জায় অধোবদন। সকলেই যে মনে মনে হাসছেন সেটা কেউ না বললেও বুঝতে বাকী ছিল না। আমি এক মানুষ, তার আবার সরস্বতীপূজা!

দুর্গাচরণদারা কিন্তু আমার সরস্বতীপূজাকে বদলে দিলেন। তাঁরা হরেনদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সকালবেলাই ফুল, মালা, ধূপ ইত্যাদি এনে হাজির করলেন। আমি আমার ঘরে কাঠের একটা বাক্সকে বেদি বানিয়ে ফটো বসিয়ে কাগজের শিকলি গাঁদা ফুল পাতাবাহারের পাতা দিয়ে বেশ সাজিয়েছি। আমের মুকুল দোয়াতভরা দুধ খাগের কলম বই সব রাখা হয়েছে। বন্ধুরা স্কুলে পড়ে বয়সে বড় আমার চেয়ে। সেই যাদের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে দেরী করে ফেরায় ঠাকুর আমায় কুটিরে ঢুকতে নিষেধ করেছিলেন, সেই বাড়ির ছেলে মেয়ে সব।† তারা সরস্বতী-

*এইসব তারিখ নীলাচলবাণী হতে সংগৃহীত। আমার এত মনে থাকার কথা নয়। এগুলির জন্য ওড়িশার ভাইদের কাছে আমি ঋণী।

† এদের মেজদিদি শ্রীযুক্তা অভয়া মৈত্র ঠাকুরের দীক্ষিতা শিষ্যা।

পূজায় কি লাগে না লাগে সব জানে। আর ভোগ নৈবেদ্য সাজানোর ভার তো মায়েদের আছেই। সকাল থেকে উপোস করে আছি, অঞ্জলি দিয়ে তবে খাব মায়েরা বলেছেন। স্নান করেছি সকাল সকাল—উদ্যোগ-পর্বও শেষ। বাবাকে তাড়া দিতে গেলাম 'কই, এস পূজা করবে না আমার সরস্বতীকে ?' গিয়ে দেখি বারান্দাভরা ছেলেরা। ফুলের মালা পায়ের কাছে রেখে জনে জনে প্রণাম করছেন ঠাকুরকে—নৃপালদা গোবিন্দদা দুর্গাচরণদা একাদশীদা প্রত্যেকে, সকলকে চিনিও না। মনে পড়ে, থমকে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। মনে হল তাই তো, আজ সবাই যাঁকে এত প্রণাম করছে তিনি আমার পুরোহিত হবেন এটা কিরকম ? আর বলতে পারলাম না কিছু। দুর্গাচরণদাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে ওদের বাইরের ঘরে বসতে আদেশ করে ঠাকুর স্নানে গেলেন। স্নানান্তে আবারও ছেলেদের ডাক পড়ল। আমি আর কিছু বলছি না—চালাক হয়ে গেছি। 'চল, দেখি লীলার সরস্বতীপূজা কেমন হল'—বলে বাবা এবার তাকালেন আমার দিকে 'সব হয়ে গেছে তো ?' নীচু গলায় বলি 'অঞ্জলি দেওয়া হয়নি। আর সব হয়েছে।' 'কেন বিমল আছে না ? ভট্টাচার্য বামুন, সে জানেনা অঞ্জলি দেওয়ার মন্ত্র ?' বলে হাসিমুখে পায়ে খড়ম গলালেন ঠাকুর। তাঁর খড়মের আওয়াজ হতেই মায়েরা ফল দুধ চিড়া মিষ্টি এনে ছোট একটা থালায় সাজিয়ে দিলেন আমার সরস্বতীর সামনে। আসন একখানা পাতাই ছিল। ঠাকুর বসলেন তার উপর। —চারদিক দেখে বললেন 'অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই কিছু। এত আমিও জানি না বাপু। কে যোগাড় করলে এসব বিমল আমরা বুঝি ?' এরাই আমার বন্ধু বান্ধবী—তারা সগর্বে হাসিমুখে মাথা হেলায়, 'হ্যাঁ'। সরস্বতীকে একটি রাঙা জবা দিয়ে ফুলের থালা থেকে আমাদের তিন চার জনকে ফুল নিতে বললেন বাবা। উত্তরের বারান্দার দরজার কাছে

ভিড় করে দাঁড়িয়ে দুর্গাচরণদারা দেখছেন মন্থুর সরস্বতীপূজা। উদাত্ত-কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হল—

সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ
বেদবেদান্ত-বেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ সরস্বত্যৈ নমঃ॥

সরস্বতীর উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে প্রণাম করে আমরা ছোটরা ঠাকুরকেও প্রণাম করলাম। 'কাল থেকে মন দিয়ে পড়তে আরম্ভ করবে কেমন?' বলে আসন ত্যাগ করে আবার বাইরের বারান্দায় গিয়ে বসলেন ঠাকুর। নিম্নস্বরে হরেনদাকে কি বলে কয়ে দুর্গাচরণদারা বীরাসনে বসে গেলেন সারি সারি। স্তোত্রবন্দনা শুরু হয়ে গেল—

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং
কেবলং জ্ঞানমূর্তিম্।

আমিও গুটি গুটি গিয়ে এক পাশে বসে গলা মেলালাম। সরস্বতী-পূজা যে আসলে ঠাকুরেরই পূজা দুর্গাচরণদাদের ক্রিয়াকলাপে সেটা আর বুঝতে বাকী রইল না। স্তোত্রবন্দনার পর আসল উৎসবটা হল কিন্তু। পূজার অন্য সব আয়োজন সরিয়ে ফেলে ঘরখানা পরিষ্কার করে সেখানে ছোট বড় আমাদের সকলকে বসিয়ে দিয়ে ঠাকুর নিজেও বসলেন মাঝ-খানে। তারপর সবাইকে খাওয়ালেন সরস্বতীপূজার ফলার—চিড়া দই দুধ মিষ্টি ফল। কুটিরে প্রসাদ আরও পেয়েছেন দুর্গাচরণদারা। কিন্তু ঠাকুর নিজে সকলকে নিয়ে আনন্দ করে খাবেন এমনটি হয়নি কোনদিন। সেদিনের আনন্দ-স্মৃতি নীলাচল কুটিরের ইতিহাসে তাই অভিনব।

সন্ধ্যায় ঠাকুরের নির্দেশমত আমি পাঠ করলাম সরস্বতীস্তোত্র। মঠের নিত্য-নৈমিত্তিক স্তোত্রবন্দনাগুলি তখন আমায় মুখস্থ করানো আরম্ভ হয়ে গেছে আগেই বলেছি। এমনি করে সুদূর শৈশবেই আমি

কিন্তু শিখেছিলাম গুরু ও সব দেব-দেবী অভেদ। এটি সারস্বত মঠের ধারা। গোঁড়া গুরুবাদী হয়ে সব দেব-দেবী নাকচ করে দেওয়াটা মঠে ছিল না। মঠের ভাব 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' পরমদেবতা একজন, আর সকলে তাঁরই বি-ভূতি। এটি বৈদিক ভাব—এর মধ্যে অনুদারতা বা সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন নাই। মায়ের কাছে শুনেছি আসাম মঠে ঠাকুরকে কেন্দ্রে রেখেই বার মাসে তের পার্বণ হত। শিবরাত্রিতে আসনঘরেই পাঠ হত শিবস্তোত্র। অন্নপূর্ণাপূজার দিন অন্নপূর্ণাস্তোত্র পাঠের বিধি ছিল, কালীপূজায় কালীস্তোত্র। এর ফলে নিজের গুরুকে ব্যক্তিবিশেষ না ভেবে গুরুব্রহ্ম ভাবার দিকটাই অনুশীলিত হত। তাতে সম্প্রদায়সৃষ্টির ভয়টা কম থাকে—মানুষটিকে ছাপিয়ে সত্যতত্ত্ব বড় হয়ে ওঠে। মূলে এই মনোভাব নিয়েই ঠাকুর মঠে এ সব প্রথা চালু করেছিলেন তাতে ভুল নাই।

সম্মিলনী থেকে ফিরে আসার পরই বাবা একদিন চিল্কা ভ্রমণের কথা তুলেছিলেন। এত বছর পুরীতে থাকলে কি হবে—পুরীর আশে-পাশে যেসব দর্শনীয় তার কিছুই ঠাকুর দেখেননি। ভুবনেশ্বর কণারক সাক্ষীগোপাল ও চিল্কা—আজকাল পুরী গেলেই মানুষ এগুলি দেখে আসে। তখন যাওয়াটা এত সহজ ছিল না। তার কারণ পথের দুর্গমতা। কোন দিকেই বাস বা মোটরের রাস্তা হয়নি ভালমত। পরিব্রাজক অবস্থায় ঠাকুর ভুবনেশ্বর ও কণারক ওড়িশার দুই বিশ্ববিখ্যাত তীর্থ দর্শন করেছিলেন কি-না আমরা সঠিক জানি না। মনে হয় করেছিলেন, এজন্যই হয়তো ওর কোনটা দেখার নাম না করে তিনি চাইলেন চিল্কায় বেড়াতে। উৎসাহিত হয়ে ওঠেন দুর্গাচরণদারা। হরেনদার

সঙ্গে শলাপরামর্শ চলে। শ্রীপঞ্চমীর দিন-পনের পরে একদিন হঠাৎ শুনলাম আমাদের চিল্কা বেড়াতে যাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। দুপুর বেলা ট্রেনে রওনা হওয়া হবে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিয়ে যাবে বালুগাঁয়ে। এক রাত্রি সেখানে থেকে নিজেরা ব্যবস্থা করে পরদিন নৌকায় চিল্কা বেড়ানো হবে। ডাকবাংলো-জাতীয় বাড়ী আছে ওখানে—তারই কোথাও থেকে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রির ট্রেনে পুরী ফেরা। এক বেলা না থাকলে নাকি ভাল করে চিল্কা হ্রদে বেড়ানো হবে না।

আগেই বলেছি '৩৭ সালের শেষ দিকে কালনার সচ্চিদানন্দ সাহা একবার পুরী এসেছিলেন। ছোটবেলায় পুরীতে ঠাকুরের যে কয়টি গৃহী ভক্তকে দেখেছি তার মধ্যে এই সচ্চিদানন্দদা পশুপতিদা ও নীহারদাকে (নন্দী) আমার মনে আছে। নীলাচলবাণীতে দেখছি ওই সময় হরপ্রসাদ রায়ও এসেছিলেন। রথের সময় চিদানন্দ মহারাজও ঘুরে গিয়েছিলেন। আরও অনেকে মাঝে মাঝে আসতেন বৈকি! অথচ আমার কাউকে মনে নাই। এর কারণ হয়তো এই যে সচ্চিদানন্দদা ও পশুপতিদা একবার নয় অনেকবারই এসেছেন নীলাচল কুটিরে। নীহাররঞ্জন নন্দীকে কেন মনে আছে সে কথা পরে বলব।

১৩৩৮ সালের মাঘেই সম্ভবত সচ্চিদানন্দদা এসে নীলাচল কুটিরের পাশে ছোট জ্যোতিনিবাস ভাড়া করে পুরী বাস করতে লাগলেন। চিল্কাযাত্রায় তিনিও সঙ্গী হয়েছিলেন। এছাড়া হরেনদার সঙ্গে নৃপাল, দুর্গাচরণ, একাদশী, গোবিন্দ এঁরা তো যাবেনই। এই ছেলেদের ভরসাতেই হরেনদা ঠাকুরকে আর মায়েদের নিয়ে চলেছেন অজানা জায়গায়।

সন্ধ্যায় ষ্টেশনে নেমে চিল্কার তীর পর্যন্ত হাঁটতে হল। ছোট ষ্টেশন তেমনি ছোট্ট একখানি গ্রাম—বেশির ভাগ লোকই বোধ হয় তারা

মৎস্যজীবী। আজকাল ভুবনেশ্বর হতে চিল্কা পর্যন্ত যে সুন্দর পথ হয়েছে তখন তার অস্তিত্ব মাত্রও ছিল স্বপ্ন। পুকুর খানা ডোবার পাশ দিয়ে একটি গ্রাম্য রাস্তা চিল্কা পর্যন্ত চলে গেছে। ঐটি বোধহয় সে অঞ্চলের রাজপথ। পথের পাশে একখানা ছোট্ট বাড়ি দেখালেন দুর্গাচরণদারা। ডাকবাংলো না যাত্রীনিবাস কি আজ আর মনে নাই। রাত্রে ঠাকুর ওইখানে সদলবলে বিশ্রাম করবেন। পরদিন স্নান, পাক ইত্যাদির ব্যবস্থাও ওখানে হবে শোনা গেল। রাতটা কাটিয়ে সোৎসাহে সকালবেলা সবাই মিলে হেঁটে গিয়ে একখানা বড় নৌকা ভাড়া করে চিল্কার বুকে ভেসে পড়া গেল। একটা জিনিস খুব মনে আছে—তীরের কাছেই বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মত ঘন সবুজ শেওলা জমে ছিল চিল্কায়। সেগুলি মাড়িয়ে নৌকায় উঠতে আমাদের সকলেরই ভারি খারাপ লাগল। বছর আঠার আগে আবার চিল্কা গিয়েছিলাম। সেবার কিন্তু এ শেওলা দেখিনি। বোধহয় এখন সরকারের পক্ষ থেকে ওসব বছর বছর পরিষ্কার করা হয়।

নৌকার উপরে ছই বলে কিছু নাই—রোদও বেশ চড়া। একটু পরেই রীতিমত মাথা গরম হয়ে উঠল সকলের। তবু ঠাকুরের কি আনন্দ! চিল্কার দৃশ্য অতি সুন্দর। চারিদিকে নীল জল—তার বুক থেকে ছোট বড় পাহাড় মাথা তুলেছে, আকাশের গায়ে যেন এক একটি দেউল। গাংচিলের সারি উড়ে চলেছে জলের বুকে—দূরে তাল, নারকেলের সবুজ তটরেখা। সব মিলিয়ে দেবশিল্পীর আঁকা একখানি অপরূপ নিসর্গদৃশ্য। হাসিমুখে চারিদিক দেখতে দেখতে চলেছেন ঠাকুর। কতদূর যাওয়া হবে? নৃপালদারা একজন প্রশ্ন করতে তিনি প্রসন্ন মুখে বললেন, 'চলনা দেখি কতদূর যাওয়া যায়।' উৎসাহ পেয়ে পরস্পরে আলাপ করে একদশীদারা ঠিক করলেন কোন এক দ্বীপে একটি

কালীমন্দির আছে, সেই পর্যন্ত ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়া হবে। নৌকা তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য একাদশীদা এক সময় হাল ধরে বসলেন নিজে। তাঁকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বললেন 'একাদশী আজ আমার কর্ণধার হয়েছে।' সলজ্জ আনন্দে একগাল হাসেন একাদশীদা। রহস্যোক্তিটা যে সকলেই বুঝেছিলেন আজ তা আর আমার বুঝতে বাকী নাই। ওড়িশাতেও যাত্রা-কথকতার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বাংলা দেশে যাত্রায় গুহক চণ্ডালের যে গান শোনা যায়—

যেজন করে ভবসিন্ধু পার
আমি আজকে তারে নিচ্ছি পারে হয়ে কর্ণধার।—

সেরকম গান কি আর ওড়িশাতেও নাই? নিশ্চয়ই ছিল এবং একাদশীর সৌভাগ্য দেখে তাঁর সতীর্থরা সানন্দে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। তা নইলে তাঁদের দিনলিপিতে এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর উল্লেখ থাকত না। মনে হয় যেন পরে ঠাকুরের ওই কথা কয়টি শুনে লক্ষ্মীধরদা বলেছিলেন 'একাদশীর আর ভাবনা কি? ও তো দিন কিনে নিয়েছে।'

যাক, খুব আনন্দ করে সেই ছোট্ট দ্বীপে যাওয়া হল। জনমানব-হীন দ্বীপে কারা কবে এক কালীমন্দির গড়ে কালী প্রতিষ্ঠা করেছিল কে জানে? চিল্কার জেলেরা মুরগী বলি দেয় সেখানে। তার চেয়েও আরেকটা দেখার জিনিস ছিল, বাবাই সেটা আবিষ্কার করলেন। এই দ্বীপের একদিকে চিল্কার নিস্তরঙ্গ নিথর হ্রদজল, অন্যদিকে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। ওইখানে চিল্কার একাংশ এসে মিলেছে সমুদ্রের সঙ্গে। দৃশ্য খুবই সুন্দর। কিন্তু বিপত্তি হল কি—ততক্ষণে রোদ চড়া হওয়ায় সবারই জলপিপাসা পেয়েছে। সেইসঙ্গে ক্ষুধাও আছে। আশা করা গিয়েছিল দ্বীপে আর কিছু না হ'ক খাওয়ার জল মিলবে। কোথায় কি? 'বেড়াবার জন্য এমন জলশূন্য দ্বীপ নির্বাচন করা হল কেন'—এই

বলে সচ্চিদানন্দদা ও হরেনদা, নৃপালদাদের* বকতে আরম্ভ করলেন। সকলেই ছেলেমানুষ—উৎসাহের চোটে এদিকটা কারও খেয়াল হয়নি। 'থাক, এবার তো ফিরেই যাচ্ছি' বলে শেষ পর্যন্ত বাবাই বাঁচিয়ে দিলেন তাঁদের। কিন্তু ফেরার সময় প্রত্যেকেরই বড় কষ্ট হতে লাগল। দ্বীপে পৌঁছাতে যে এত সময় লাগবে, এত বেলা হবে অথচ পানাহার কিছুরই সুবিধা হবে না এটা বোঝা যায়নি। ঠাকুরের ঠাকুরালিটা অর্থাৎ তাঁর নিপুণ সেবাযত্নটা সকলেই দেখেছেন। এমনি সব সংকটে তিনি যে কি ধীরভাবে সমস্ত কষ্ট সহ্য করতেন—একটা মুখের কথাতেও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করতেন না তার সাক্ষী আছি কেবল আমরা। পরে ভারত-ভ্রমণের সময় তাঁর এই সহ্যশক্তি আমি আরও দেখেছি।

দুর্ভোগের সেখানেই শেষ নয়। বারটা নাগাদ নির্দিষ্ট বাসায় এসে দেখা গেল সেখানেও স্নানাহারের কোনও ব্যবস্থা নাই। দুর্গাচরণদারা যাঁকে এসবের ভার দিয়েছিলেন তিনি মোটেই নির্ভরযোগ্য নন। ফলে তাঁরা আরও খানিক হরেনদাদের বকুনি খেয়ে হরেনদার সঙ্গেই ছুটাছুটি করে কাজে লেগে পড়লেন। সমবেত চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই চাল ডাল তরকারীপত্র কোথা হতে সব যোগাড় হয়ে গেল। কাছের এক পুকুর থেকে জল তুলে এনে ঠাকুরের স্নানের ব্যবস্থা হল। আমাদেরও একটা পুকুর থেকে স্নানের এবং পানের জল এল। অন্যরা পুকুরে স্নান করে এলেন। বেলা তিনটা নাগাদ খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হল ঠাকুরকে। বেলা-শেষে খিচুড়ী খেয়ে প্রাণ ফিরে পেলাম সকলে—ক্ষুধার কষ্ট কাকে বলে

* 'পরমপুরুষ আস হে ফেরি' পুস্তিকায় নৃপালদা চিল্কা ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সঙ্গে কিছু মুড়ি ও সামান্য পানীয় জল থাকলেও প্রয়োজনের পক্ষে তা পর্যাপ্ত ছিল না।

জীবনে সেই প্রথম আমি জানলাম। এর পর যে যেখানে পারে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য গড়িয়ে পড়া হল। সন্ধ্যার পরে ট্রেন। রাত্রি বোধহয় আটটা কি নয়টায় নীলাচল কুটিরে পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা গেল। কুটিরে মণিদা ও ডাক্তার-মা রাত্রের খাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। হাত-পা ধুয়ে ভোগের ঘরে এসে যথারীতি গল্প করতে করতেই খেলেন ঠাকুর। সে গল্প আর কিছু নয় তাঁর পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা। কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে, পায়ে হাঁটতে হয়েছে মাইলের পর মাইল। সেদিন সারাদিনের দারুণ দুর্ভোগের পরও তাঁর মুখে প্রসন্ন হাসি দেখে কুটিরের বাসিন্দারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন কষ্ট সহ্য করার অভ্যাস এ-মানুষটির সত্যই আছে।

১৩৩৯ সাল—

১৩৩৯ সালের প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা নীলাচল কুটিরের পরিকর সহ ঠাকুর মহারাজের আসাম যাত্রা। তখন মঠের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ। মাঝখানে মঠের উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে আগেই বলেছি। নতুন অধ্যক্ষ মঠের অনেক কিছু উন্নতি ঘটিয়েছেন। শোনা গেল পুরানো আমলের মাটির ঘর ভেঙে পাকা করেছেন তিনি। সেই জন্য আসনঘরে নতুন করে শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরুর আসন প্রতিষ্ঠা হবে, ঠাকুরের মঠে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। কি মনে হল তাঁর কে জানে— বলে বসলেন, 'তোমরাও চল একবার।' হরেনদা রইলেন নীলাচল কুটিরের ভার নিয়ে। মণিদা (মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী) সরযূ-মা মা আর আমি চললাম ঠাকুরের সঙ্গে। গুরুধাম ঠাকুরই দেখিয়েছিলেন। সারস্বত মঠ দেখাও আমার পক্ষে তাঁরই কৃপায় সম্ভব হল। তা নইলে এ-জীবনে আর হত কি ?

পুরী থেকে হাওড়ায় ফণীবাবুদের বাড়িতে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরে পার্বতীপুর না কোথায় যেন ট্রেন বদল করতে হল—এতকাল পরে সেসব আর মনে পড়ে না। তারপর আমিনগাঁও আর পাণ্ডুঘাটের মাঝখানে অল্প একটুক্ষণের জন্য ব্রহ্মপুত্রের বুকে ষ্টীমারে চড়া। আবার ট্রেনযাত্রা। এত দীর্ঘ সময় ট্রেনে থাকা সেই প্রথম। তার উপর কেমন একটু ভয় ভয় করছে মঠে যেতে। ভয়ের হেতু হল যাত্রার আগের দিন বাবা আমায় ডেকে গম্ভীরমুখে বলেছিলেন 'যেখানে যাচ্ছ সে কিন্তু মঠ। এখানকার মত বাড়ি নয়। আশ্রমের নিয়ম মেনে চলতে পারবে তো ?' তৎক্ষণাৎ ঘাড় নেড়ে সুবোধ বালিকার মত সম্মতি দিয়েছি। তিনি আবার আরও সতর্ক করে দিয়ে বললেন 'এখানে যেমন দিনরাত আমার পিছনে ফেউয়ের মত লেগে

আছ সেখানে এমন কর না যেন। মায়ের কাছে থাকবে। আমার কাছে সেখানে আশ্রমের ছেলেরা থাকবে—সব সময় তারাই কথাবার্তা বলবে। তোমার গালগল্পের আসর বসানো চলবে না।' বলতে কি, মন মেজাজ একেবারে খারাপ হয়ে গেল এরপর। কি জানি সে কেমন জায়গা, কি সেখানকার নিয়ম-কানুন! খাওয়া খেলা হাসি গল্প সবই কি নিষেধ মঠে? আশ্রমের নিয়ম কি ধরনের তা না জানলেও সে যে বেশ কড়া শাসনের জায়গা এ-রকম একটা ধারণা হয়েছিল সাধারণ জ্ঞান থেকে। বাবার উপদেশে একেবারে কুঁকড়ে গেলাম। নিজস্ব ধরণে বুঝলাম মঠের ঠাকুর আর পুরীতে যাঁকে 'বাবা' বলি, দুজনে দুস্তর প্রভেদ। প্রভেদ যে আছে তা দীক্ষাদানকালে বা ভক্তসঙ্গে তাঁকে দেখে শিশু-বুদ্ধিতেই বুঝতাম। এখন ধারণা হল মঠে বাবা সব সময় ওই রকম ঠাকুর সেজেই থাকবেন। হা হতোঽস্মি!

তিন দিনের ট্রেনযাত্রায় বিকল শরীর এবং ততোঽধিক বিকল মনে একদিন সকালে এক মাঠের ধারে নামা হল। তারপর গরুর গাড়িতে যাত্রা। ভাল লাগছে না, কিছুই আমার ভাল লাগছে না মনে মনে বলছি। সারা পথ ট্রেনে বাবার দেখা মেলেনি। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এখনও তাঁকে অন্য এক গাড়িতে নিয়ে চললেন গেরুয়া-ধারীরা। আমরা তিনজন আরেক গাড়িতে। মঠের উপর ভক্তি আমার ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আর, এমন কিছু চোখেও পড়ছে না, যাতে নতুন দেশ বলে ভাল লাগে। বেলা বোধহয় দশটা নাগাদ এসে এক জায়গায় পৌছলাম। দিদির (সরযূ-মা) কথায় বুঝলাম এইটাই মঠ। আমি যেন কেমন জবু থবু হয়ে গেছি তখন। যত খিদে পেয়েছে আমার, তত বিরক্তি লাগছে। দার্জিলিঙে যাওয়া বা মস্ ব্যাঙ্কে পৌছানোর নিখুঁত বিবরণ দেওয়া যেমন আমার পক্ষে অসাধ্য, মঠের প্রথম দর্শনও তেমনি

অস্পষ্ট। শুধু মনে আছে মোটঘাট সহ মায়েদের সঙ্গে কোন এক গাছ-তলায় ভূতের মত বসে আছি। মনে ধারণা, ক্ষিদে পেলেও কখন যে খাবার জুটবে তার নিশ্চয়তা নাই। কারণ বাবা বলেছেন এটা আশ্রম—এখানকার নিয়ম-কানুন আলাদা। প্রায় কাঁদ কাঁদ অবস্থা আমার। এমন সময় মা আর দিদি কাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। মুখ তুলে দেখলাম লালপাড় গেরুয়া শাড়ী পরনে কে একজন প্রবীণা এসে দাঁড়িয়েছেন। সিঁথিতে সিঁদুর নাই তাঁর, কপালে মস্তবড় সিঁদুরের ফোঁটা। আমিও উঠে দাঁড়ালাম মায়েদের দেখাদেখি। তাঁদের সঙ্গে তাঁকে প্রণামও করলাম। মা নীচুগলায় বললেন, 'ইনি তোমার বড়মা'। পুরীতেই বড়মার কথা শুনেছিলাম। নীলাচল কুটিরে তাঁর একখানা ফটো ছিল। মায়েদের প্রণাম করতে দেখে অনুমান করেছিলাম ইনি কে। বড়মা আমার মুখ দেখেই বুঝলেন অবস্থা ভাল নয়। 'সকালে কি খেয়েছ?' মায়েরা কি যেন উত্তর দিলেন, আমি চুপ। বড়মা আবারও আমাকেই প্রশ্ন করলেন 'ক্ষিদে পেয়েছে, না? কিছু খাবে?' আমার কানে পিতাঠাকুরের সাবধান-বাণী বাজছে—আশ্রমের নিয়ম মেনে থাকতে পারবে তো? সভয়ে বলি 'স্নান করে ভাত খাব।' বড়মা বললেন 'এখানে ভাত খায়না প্রসাদ পায়। সুর, ওকে স্নান করিয়ে দে তাড়াতাড়ি। ওর ভারি ক্ষিদে পেয়েছে মুখ দেখেই বুঝতে পারছি।'

সারস্বত সংঘের সংঘজননীর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। ভাত নয় প্রসাদ খাবে শুনে প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছিলাম তাঁকে, মিথ্যা বলব না। আশ্রমের সবই তখনও বিভীষিকা। কিন্তু সেদিন খেতে বসেই বড়মাকে আমার চেনা হয়ে গেল। মাতৃস্নেহের অমন ব্যাকুল প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। শুনেছি এক সময় যোগমায়া দেবীকে সাক্ষাৎ জগদীশ্বরীজ্ঞানে পূজা করতেন অন্তেবাসীরা। ঠাকুর মহারাজ স্বয়ং

তাঁদের বলেছিলেন 'যোগমায়ার কৃপা পেলে তোমাদের অন্য কোন সাধন-ভজনের প্রয়োজন নাই।' সেকালে মঠে তিনি রাজরাজেশ্বরীর মহিমায় বিরাজ করতেন। সকল কাজে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মতামত নিতেন। কিন্তু এই মহিমময়ীর অন্তরে যে বাৎসল্যের এমন বুভুক্ষা ছিল তা কি কেউ জানতেন? কথাটা আমার নয়। বড়মা যেভাবে আমায় দুহাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলেন তা দেখে ঠাকুরই একদিন বলেছিলেন। মা (সুরবালা দেবী) কিন্তু এতে আশ্চর্য হননি। যোগমায়া দেবী কেন আমায় অমন পরমাদরে গ্রহণ করেছিলেন তার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পরে আমি মায়ের কাছেই পেয়েছি। যোগমায়া দেবীকে বুঝতে হলে এখানে সেটুকু বলা দরকার।

গুরুতে আত্মসমর্পণ বলতে যা বোঝায় বড়মা ছিলেন তার মূর্ত প্রতিমা। তাঁর নিরলস ঠাকুরসেবার কথা আগেই বলেছি। গুরুবাক্যে কি গভীর বিশ্বাস ছিল তাঁর সে সম্বন্ধে একটা ঘটনা শুনেছি। ১৩১৭ সালে পুরী গিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ঠাকুর তাঁকে স্নান করতে বলেন। 'সমুদ্রে স্নান করব না ঠাকুর?' বড়মার প্রশ্নে তিনি রহস্য করে বললেন, 'এই তো সমুদ্র।' বড়মার আর সংশয় নাই। গিয়ে স্নান করে এলেন তখনই। 'কি? সমুদ্রে স্নানের সখ মিটল তো?' ঠাকুরের প্রশ্নে খুশী মনে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন বড়মা। 'এটা কি সমুদ্র নাকি? পুকুর দেখনি কখনও? আচ্ছা বোকা তো তুমি!' ঠাকুর এই বলে তর্জন করতে যোগমায়া দেবী সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'আপনি যে বললেন এটাই সমুদ্র? তাই আমি ভাবলাম সমুদ্র এই রকম।* মঠে প্রথম আসলে সন্ধ্যাবেলায় যোগমায়া দেবী নিজেই ঠাকুরের আরতি করতেন। মায়েরা তখন

* শ্রীমৎ নির্বাণানন্দজীর কাছে শোনা।

ছোট। তাঁদের মুখে শুনেছি সে আরতি দেখে ছোটদেরও চোখের পলক পড়ত না। আরতি করতে করতে বড়মা হারিয়ে ফেলতেন আপনাকে। কত দিন ধূপ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, প্রদীপ নিভে গেছে হয়তো। বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা যোগমায়া দেবী তখনও আরতি করে চলেছেন। সে তো আমাদের লোকদেখানো আরতি নয়, সত্যই দেবতার নীরাজনা। ইষ্টে স্বারসিকী রতি না হলে অমন আরত্রিক সম্ভব নয়।

ঠাকুরগতপ্রাণা যোগমায়া দেবীর কাছে ঠাকুর মহারাজের প্রিয়-পাত্র মাত্রেই আদরণীয় ছিলেন। চিদানন্দ মহারাজ ও শ্রদ্ধেয় রামানন্দজীকেও তিনি পরম স্নেহে সমাদর করতেন। অথচ সাধারণত অন্তেবাসী ছেলে-মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর বড় কড়া শাসন ছিল। আশ্রমের নিয়মভঙ্গ বিষয়ে এমনিতে সজাগ থাকলেও উপরে যাঁদের নাম করলাম তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর কোন নিয়মের কড়াকড়ি ছিল না। তার কারণ, তাঁরা ঠাকুরের অত্যন্ত প্রীতিপাত্র। বলা বাহুল্য আমাকে ব্যগ্র বাৎসল্যে বরণ করে নেওয়ার পিছনেও প্রচ্ছন্ন ছিল তাঁর গুরুনিষ্ঠা। যে-মমতায় পুরুষ হয়েও হরিদাসদা দিনরাত কোলে নিয়ে বেড়াতেন আমাকে, বড়মারও সেই মমতা। ঠাকুর তাঁদের প্রাণের অধিক আপন, তাই তাঁর যা-কিছু সে-ও তাঁদের অতি আপন। ভক্তি বল আর শ্রদ্ধা বল সবেরই পরমোৎকর্ষ প্রেমভক্তিতে। বৈষ্ণব বলেন প্রেমভক্তির চরম পরিপাকে মমত্ববুদ্ধির উদয়। মহাভাবস্বরূপা বলেন, আমি কৃষ্ণের এ তো আছেই, আসল কথা কৃষ্ণ আমার। এই মমতা না এলে আত্মীয়তা জন্মাল কই ? যোগমায়া দেবীর মনে ঠাকুর-সম্বন্ধে এ আত্মীয়তা জন্মেছিল। ঠাকুরের সবই যে তাঁর কী মধুর লাগত !

একটা কথা নিজের কানেই শুনেছিলাম। নতুন ঠাকুর-ঘর আসন-বারান্দা সব দেখছেন মায়েরা—বড়মা আছেন সঙ্গে। চারদিক ঘুরিয়ে

দেখাতে গিয়ে সঙ্কোচে বললেন, 'আমার এসব কিছুই ভাল লাগে না। যে-মাটির ঘর ছিল, তার কাদামাটি তার প্রতিটি বাঁধনে ঠাকুরের হাতের ছোঁয়া ছিল।. নিজের হাতে গড়েছিলেন সব, চোখে দেখেছি। সব ওরা ভেঙে ফেলল। কত নিষেধ করেছিলাম আমি। আমার কথা তো শোনেনা কেউ।'

বড়মার কাছে আদর পাওয়ার পরই মঠ সম্বন্ধে ভয় ও বিরাগ দূর হল। মনের বাধা কাটতেই চোখ সজাগ হয়ে উঠল। তখন মুগ্ধ হয়ে গেলাম আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ দেখে। যা দেখি তাই-ই আমার কাছে অভিনব। আমি সমুদ্র দেখেছি—মঠের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অমন ছোট্ট নদীটির মত নদী তো দেখিনি আর! পূবদিকের পুকুরের মত অমন টলটলে পুকুর কাছে গিয়ে কবে দেখছি? বালির দেশে বড় হয়েছি। সেখানে কোথায় এত ফুল-ফল? আমাদের থাকার জায়গা হল পঞ্চবটিতে। পরে দেখলাম ওরই এক কোণে আমলকীতলায় এসে বসেছিলাম প্রথমে। পঞ্চবটির বেলতলা, সাদা লাল গেরুয়া নীল রং-বেরঙের জবার বেড়া, ঘরের পাশের বকুলগাছি, আর পিছনের ফলে ভরা জামরুল গাছ—সবই আমার কাছে অপূর্ব! আমি এমন আর দেখিনি। জবা এত রঙের হয়? বকুল এমন ঝরে পড়ে আর সাতদিনেও শুকায় না? একটু দূরেই একটা লিচু গাছ—ফলের ভারে ভেঙে পড়বে যেন। গেছি বৈশাখ মাসে—আম জাম লিচু কাঁঠালের সময় সেটা। বড়মা ঝুড়িভরা ফল ধরে দিয়ে বলেন 'লীলু তোকে এই সবগুলো খেতে হবে।' একটু দূরে চেয়ারে বসে হুঁকার নল হাতে ঠাকুর আমার বিব্রত ভাব দেখে মুচকি হাসছেন। 'ঠাকুর আপনি হাসছেন? ও আমার কথায় খাবে না। আপনি বলুন খেতে।' অপ্রস্তুত হয়ে দু'চারটা লিচু একটা আম তুলে নিয়ে পালাবার পথ খুঁজি। খাব কি? বড়মার হাতে পড়ে

ক্ষিদের বালাই গেছে। যেমন করে থলিতে ময়দা ঠাসে, ভদ্রমহিলা তেমনি করে চারবেলা ঠুসে খাওয়াতে চান। একা আমায় নয় ঠাকুরকেও। প্রতিদিন খাওয়ার সময় তাঁর আক্ষেপোক্তি শুনি, 'কিছুই তো খেলেনা ঠাকুর? রান্না ভাল হয়নি, না? আমাকে তোমরা রাঁধতে দেবে না। নলিনী কি আর পারে এত? তোমার খাওয়া হল না। সব যে পড়ে রইল! আর একটু খাও ডালনাটা?' বলেই সম্মতির অপেক্ষা না রেখে পাতে ঢেলে দেওয়া। নিজের বিপদ ভুলে যাই ঠাকুরের বিপন্ন মুখ দেখে। ভারি মজা লাগে আমার। কেমন জব্দ! বড়মার কাছে আর মুখে কথা নাই ভদ্রলোকের। আবার চারটি ভাত টেনে নিয়েছেন বাধ্য ছেলের মত। বড়মার তখন শরীর ভেঙে এসেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ। ঠাকুর মঠ ছেড়ে বাইরে থাকেন বার মাস, সে তাঁর কত কষ্ট। দুদিনের জন্য মঠে এসেছেন, তিনি রেঁধে খাওয়াতে পারেন না আর সেবা করতে পারেন না আগের মত। সে-ও যে তাঁর কি কষ্ট অন্তর্যামী জানেন। আজ বুঝি, তাই যোগমায়ার অনুরোধ পারতপক্ষে ঠাকুর ঠেলতে চাইতেন না। আমায় আড়ালে বলেছেন, 'তোর বড়মা খাওয়াতে ভালবাসে। একটু বেশি করে খাবি বুঝলি? কেবল আমায় বলে, লীলুকে বল খেতে।' তা তো বুঝলাম। কিন্তু বড়মাকে খুশী করা মানে আমার উদরাময়, সেটা কাকে বোঝাই?

ঘুরে ঘুরে দেখি মঠের বাগান। এই নাগেশ্বর ফুল? আঃ কি সুন্দর গন্ধ! ঠাকুরঘরের পাশে গোলাপবাগান। অমন আর দেখিনি আমি। নীল ঝুমকাই (Passion flower) বা আর কবে দেখেছি? কাঁঠালী-চাঁপা? শিববাড়ির মাধবী-বিতান? অগণিত সুগন্ধি ফুলের মিশ্র সৌরভে মনে হয় বুঝি মর্ত্যে নাই আমি। এই-ই আমার নন্দন-কানন। একদিন পামবাড়িও দেখিয়ে এনেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ। ওমা,

কাঁঠাল বুঝি এত নীচে এমনি করে গাছের গায়ে ফলে ? কে জানত বাপু ? মঠে গিয়ে পড়ার বালাই তুলে দিয়েছি। দিনরাত আমি ঘুরে বেড়াই আগানে-বাগানে। সঙ্গীও জুটে গেছে—শচীনদা। আমার চেয়ে বছর তিন-চারের বড়ই হবে, সে মঠের বিদ্যার্থী। তার গেরুয়া কাপড় ছাঁটা চুল দেখে আমার ঋষির তপোবন মনে পড়ে যায়। কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ তখন পড়া হয়ে গেছে। শচীনদা মঠে আছে অনেকদিন। কোথায় কি দ্রষ্টব্য আছে তার জানা। আমার বিমুগ্ধ বিস্ময় দেখে তার মজা লাগে খুব। সুপারী গাছ দেখেছ ? ওই দেখ। এটা কি বল তো ? এক ফোঁটা একটা কচি ডাব দেখে আহ্লাদে বাক্যহারা আমি। বড় বড় ডাবের বাচ্চাগুলো এত মিষ্টি ! অমূল্য-নিধির মত সঞ্চয় করি সেটি। কদিন পরে দেখি শুকিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় মায়ের কাছে বসে মহোৎসাহে বলি কি কি দেখলাম সারাদিন। মা কিন্তু তেমন উৎসাহ দেখান না, তাঁর চোখে মুখে ফোটে ক্ষুব্ধ বেদনার ছায়া। তিনি দিদি আর আমার কাছে গল্প করেন মঠ কি ছিল। যা দেখছি তা নাকি সেই মঠের কঙ্কাল মাত্র। ঠাকুর নিজের হাতে স্থান নির্বাচন করে চারা বসাতেন ফুল-ফলের—নিজে পরিকল্পনা করতেন কোথায় হবে লতা-তোরণ, কোন্‌খানে হবে কিসের বাগান। নিজে কাঁচি ধরে গাছ ছাঁটতেন। বাংলা চুঁড়ে যেখানে যেটি ভাল ফুল-ফলের গাছ পেতেন, এনে বসাতেন মঠে। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যায় 'উৎসবদর্শনে' নামের প্রবন্ধটিতে সেই প্রাচীন মঠের কিছুটা রূপবর্ণনা আছে। তারও ৫।৬ বছর আগে ঠাকুর মঠ ছেড়ে পুরীবাসী হয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মঠের পূর্ব সৌন্দর্যের কিছুটা হানি ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নাই। তবু যা ছিল তা-ও গত চার পাঁচ বছরে নষ্ট হয়ে গেছে। মা আক্ষেপ করে বলেন, 'এই নাকি গোলাপ-বাগান ? এর চেয়ে আরও কত বড়

ছিল সে বাগান। কী রঙের বাহার আর কত ধরনের গোলাপ যে ফুটত! পথে পথে ফুলের সে তোরণ কই? নাগেশ্বর-বীথিকে চিরে যে-সব রাস্তা গৌরাঙ্গঘর কি ফুলবাগান বা সবজীবাগে গেছে তার প্রত্যেকটিতে তরুলতা অপরাজিতা কি যুঁই-মালতীর তোরণ ছিল জায়গামত। কী ফুল ফুটত—রঙে আলো হয়ে থাকত চার দিক। এ তো দেখছি অর্ধেক ফুলগাছ অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে।'

শুনে আমারও কষ্ট হয় একটু। সেই সঙ্গে মনে হয় এর চেয়েও সুন্দর আবার কি রকম কি জানি! আমি যা দেখছি তা-ই যে সুন্দর। ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার ঝাঁকড়া গাছ মঠেই দেখলাম। প্রথম তার ফুল ফুটল আমরা মঠে থাকতে থাকতেই। ফুলটির বাংলা নাম বাবার মুখেই শুনলাম—হিমচম্পক। তুষারশুভ্র শঙ্খের মত ফুলটি ফুটল যেদিন গন্ধে আমোদ হয়ে গেল মঠের আঙিনা। ফোটা ফুলটি এনে রাখা হল ঠাকুরঘরের টেবিলে, যেখানে অন্নপূর্ণার একখানি ফটো বসানো ছিল। একদিন এই অন্নপূর্ণার ফটো নিয়ে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল।

গোলাপবাগানের একান্তে বড় একটা স্থলপদ্মের গাছ ছিল মনে পড়ছে। ফ্যাকাশে ফুলগুলো বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপী হতে হতে গাঢ় গোলাপী হয়ে যেত ক্রমে, সে কী মজা দেখতে! প্রতিদিন স্নান করে এসে হয় স্থলপদ্ম নয় তো গোলাপ বা বাগানের কোনও সেরা ফুলের গুটিকয়েক নিয়ে ওই অন্নপূর্ণাকে দিতেন ঠাকুর। আসনঘরে পূজা করতেন যিনি তিনিই বোধহয় বাছাই করা কয়েকটি ফুল বাটিতে করে টেবিলের উপর রেখে যেতেন। সেদিনও বুঝি গোটাদুই স্থলপদ্ম ছিল বাটিতে। মণিদা ঘর ঝাড়তে এসে সেই ফুলদুটি অন্নপূর্ণার পায়ে দিয়ে বাটি নিয়ে চলে গেলেন। ঠাকুর গেছেন স্নান করতে। ফিরে এসে টেবিলের ধারে বসতে গিয়ে খড়ম পায়ে বেরিয়ে এলেন। খড়মের সেই

রুদ্র খটাখট্ ধ্বনি আর তাঁর রুষ্ট প্রশ্নে বিপদ গণে সবাই, 'অন্নপূর্ণাকে ফুল দিল কে ?' 'আমি ঠাকুর'—মণিদা উত্তর দিতেই ফিরে গিয়ে ফটোখানা উল্টিয়ে রেখে দিলেন ঠাকুর। আর ফুল দেননি সে-ফটোতে। কি এর অর্থ; ঠাকুরাণী কি সেইদিন মঠ ছেড়ে গেলেন ? নিত্য যিনি ঠাকুরের পূজা পেতেন, তিনি সেদিন অন্যের পূজা নিলেন কেন ? এই অঘটনের মূলে তাঁরই চাতুরী। আর তিনি ঠাকুরের দেওয়া ফুল গ্রহণ করবেন না এমনি কোন ইঙ্গিতই বোধহয় ঠাকুর পেয়েছিলেন।

মঠের কথা বলতে গেলে হয় তো ফুরাবে না। ছিলাম তিনমাস কিন্তু যা দেখেছিলাম তিন বছরেও অত দর্শনীয় বস্তু মেলে না। বিশেষদিনের কথাই এবার বলে যাব।

সকালে ঘরে বসে পড়াশোনা আর কারও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে তার সঙ্গে নিভৃতালাপ—মঠে এই দেখলাম ঠাকুরের দৈনিক কৃত্য। স্নান খাওয়া বিশ্রাম পুরীর নিয়মেই চলছে। বিকালে গিয়ে হয়তো পুকুরপাড়ে ঘুরে এলেন একটু, নয়তো গৌরাঙ্গঘরের সামনে বসলেন। সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তনের পর আসন-বারান্দায় বসে অন্তেবাসী-দের সঙ্গে আলাপ। কোন-কোনদিন গল্প বা নিজের জীবনকথা বলতেন। প্রায়ই সে আসরের এক কোণে আমি থাকতাম। কারণ সন্ধ্যার পর ঝোপঝাড়ে ভরা অন্ধকার মঠ দেখে ভয় করত আমার। এই সব সন্ধ্যার উল্লেখযোগ্য আলোচনাগুলি সত্যদারা শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপাদেশামৃতে সঙ্কলন করেছেন দেখেছি।

আমার বিশেষ করে মনে আছে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের কথা। ঠাকুরকে দীক্ষা দিতে দেখেছি পুরীতে। কিন্তু পূজকের ভূমিকায় দেখিনি কোনদিন। শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃততে দেখছি বৈশাখের শেষে সেবার

অক্ষয়তৃতীয়া পড়েছিল। তিনদিন ধরে খুব উৎসব চলল মঠে। উৎসবের প্রথম দিনই এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখলাম।

যতদূর মনে পড়ে তখন আসন-ঘরে সত্যদাই প্রতিদিন পূজা করতেন। শচীনের কাছে তাঁর তখনকার নাম শুনেছি, 'অবনীদা'। উৎসবের দিনও আসন-ঘরে তাঁকেই দেখলাম ঋত্বিক্। আসনবারান্দাভরা মানুষ—সবাইকে চিনি না। নলিনীদা প্রজ্ঞানন্দ ও শুদ্ধানন্দ মহারাজ ঈশ্বরদা খগেশ্বরদা আর শিলঘাটের সুরেশদা—এই কজন চেনা ছিল মনে হচ্ছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আমিও পূজা দেখছি। ঠাকুরঘর হতে আসন-বারান্দায় আসবার যে-দরজা, ওইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম। বাবা ঘরে ছিলেন, গম্ভীর সমাহিত-মূর্তি। পরে শুনেছি দেবীগীতা পড়ছিলেন একমনে। হঠাৎ বেরিয়ে এসে আমার কাছে দাঁড়াতেই মুখ তুলে চাইলাম তাঁর দিকে। আমার ডান হাতের কাছেই—বোধহয় দেয়ালের গায়ে—চামর ঝুলছিল একটি। আমি চাইতেই ইশারায় অনুজ্ঞা করলেন পিতাঠাকুর—চামর ঢুলাও। ভারি আনন্দ হল মনে। মিথ্যা বলব না, একটু অহংকারও হল। আসন-ঘরের বিশেষ পূজানুষ্ঠানে আমিও একটু অংশ নিতে পারলাম এ যেন কতই ভাগ্যের কথা। চামর নিয়ে বাজনার তালে তালে দোলাতে লাগলাম গম্ভীরমুখে। এখনও নিজের ভাবখানা মনে পড়ে হাসি পায়। কয়েক মিনিট পরেই কিন্তু হাত ব্যথা করতে লাগল। মস্ত চামর—এখন-কার মত হালকা খেলো জিনিস নয়। সেকালের ভারি জিনিস। বেশিক্ষণ হাত ঢুলিয়ে তালে তালে চামর বীজন করি এত শক্তি কোথায়?

দেবি! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণতলে
অনেক অর্ঘ্য আনি,
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি।

তুমি জানো মোর মনের বাসনা
যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না
তবু বহিয়াছি কঠিন কামনা দিবস নিশি।

হাত টন্ টন্ করলেও চামর রেখে দিতে পারি না। ঠাকুর নিজে বলেছেন চামর দোলাতে। ভয়ে লজ্জায় সত্যই এ অভাগ্যের 'নয়নজলে' ভাসবার অবস্থা। এমন সময় টান পড়ল চামরে। আমার পাশে দাঁড়িয়েই আরতি দেখছিলেন ঠাকুর—আরও দু'পা এগিয়ে দাঁড়ালেন এবার। আমার হাত থেকে চামর নিয়ে স্বয়ং দোলাতে লাগলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি অবাক্ হয়ে সে-দৃশ্য দেখতে লাগলাম। সেই উন্নত বিশাল শরীর—সামনে দুপাশে আর পিঠে জটা দুলছে, ভাবগাম্ভীর্যে সাক্ষাৎ কৈলাসপতি সদাশিব। তিনি আবার কাকে চামর বীজন করছেন তদ্‌গতচিত্তে? এর অনেকদিন পরে মহাজনপদাবলীতে পেলাম বৈষ্ণব বলছেন, 'গুরুরূপা সখী বামে নিত্য বৃন্দাবনধামে চামরের বাতাস করিব' পড়ে চমক লাগল। বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে গুরুমহারাজ নিত্যধামের সখী? আমাদের গুরু কিন্তু পরিচয় দিতেন 'মনে কর আমি সেই নিত্যলোকের পুরুষ'। তবে? মঠের সেই ছবি ফুটে উঠল চোখের সামনে। তখন তো বুঝিনি। এখন যে মনে হচ্ছে সচ্চিদানন্দ পুরুষ নয়, আমি সেদিন তাঁকে ওই সেবাপরায়ণা সখীর ভূমিকাতেই দেখেছিলাম। আর, এ কিছু অকাণ্ড নয়, মহাভাবেরই প্রকাশ। ভাবগুলি পৃথক পৃথক। কিন্তু মহাভাবের উদয়ে পিতা মাতা দাসী সখা দয়িত সর্বভাবের মিশ্রণে এক অনির্বাচ্য রসসিন্ধুর কল্লোলে আত্মহারা হওয়াই স্বাভাবিক।

দেখতে দেখতে চামর যেন খসে পড়ল হাত থেকে। চামর রেখে ঠাকুর আসনঘরের দরজার সামনে বসে পড়লেন। বসলেন আমাদের মত বীরাসনে—অর্থাৎ পা মুড়ে। হাত দুখানি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে গেল আপনিই।

একদৃষ্টে আসনবেদির দিকে চেয়ে কি দেখতে লাগলেন জানি না। জল-ভরা শ্রাবণের মেঘের মত ভাব মুখে—পূবালী হাওয়া লাগলেই বুঝি গলে পড়বে। ছলছলে চোখদুটি হতে কয়েক ফোঁটা বর্ষণও বুঝি হয়েছিল ঠিক মনে নাই। আমার মনে আছে সেই বাষ্পস্তম্ভিত ভাবাকুল মুখচ্ছবি। পুরীর সমুদ্র দেখেছি। তীরে তরঙ্গভঙ্গের অন্ত নাই। কিন্তু সিন্ধুর অন্তর্হৃদয়ে? সেখানে অগাধ ঘন-কৃষ্ণ জল কেবল দুলছে টলছে, লহরী-চাঞ্চল্যে ভেঙে পড়ছে না কলোচ্ছ্বাসে। ঠাকুরকে সেদিন তেমনই দেখেছিলাম। 'ভাবে ভরল হিয়া'—কিন্তু বহিঃপ্রকাশ শুদ্ধ। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘের মত অন্তরীক্ষে তা পুঞ্জে পুঞ্জে ঘনিয়ে এলেও 'মা চাপলয়' মন্ত্রে ঈশান মহাশক্তিতে নিরুদ্ধ করেছিলেন তার তাণ্ডব। সে এক দুর্লভ দর্শন আমার। সেদিন 'ভক্তপদারবিন্দভিক্ষু দীন নিগমানন্দ'কে দেখেছিলাম ঠাকুর নিগমানন্দের পরিবর্তে। এ-ও তাঁর অন্যতম পরিচয়।

তারপরই মনে পড়ছে আসনবারান্দায় বসে শংকরাচার্য নাটক শোনা। এককালে মঠে প্রায়ই অভিনয় হত। গিরিশ ঘোষের নাটক অত্যন্ত প্রিয় ছিল ঠাকুরের। আমার কাছে যে কয়খণ্ড গিরিশগ্রন্থাবলী আছে, আজও তার নাটকীয় চরিত্রগুলির পাশে পাশে ঠাকুরের নিজের হাতে লেখা ভূমিকালিপি রয়েছে কোন-কোনটিতে। হর-গৌরী নাটকে নন্দী-ভৃঙ্গির পাশে রাজচন্দ্র চণ্ডী, অন্যান্য নাটকেও কোথাও বা যোগেন প্রিয়নাথ বরদা সারদার নাম, নারীচরিত্রে সুশীলা শৈল শান্তি লেখা। সেবার অক্ষয় তৃতীয়ায় তারই শেষ পুনরাবৃত্তি দেখলাম। মঠের ব্রহ্মচারীদের অন্যান্য নানা ভূমিকা দিয়ে ঠাকুর নিজে নিলেন শংকরাচার্যের ভূমিকা। সাজ-পোষাক নাই—আসনে বসেই যে যার ভূমিকা পাঠ করে যাচ্ছেন। শুদ্ধানন্দ মহারাজ হয়েছিলেন বিশিষ্টা—শংকরের জননী, আর সত্যদার ছিল পদ্মপাদের ভূমিকা, এটুকু মনে পড়ে।

শুদ্ধানন্দ মহারাজ এখন মঠাশ্রমের অন্তেবাসী নন, সারস্বত সংঘের নব আগন্তুকরা তাঁকে চোখে দেখেননি। আমি কিন্তু তাঁকে ভুলিনি। মঠে গিয়ে কিছুদিন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করার পরই বিপত্তি ঘটল। আমি লেখাপড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছি দেখে পিতাঠাকুর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ফলে শুদ্ধানন্দ মহারাজ আমায় পড়াতে আরম্ভ করলেন সকাল বেলায়। প্রথম কয়দিন বেশ ভয় করত—তিনি যা পড়া দিতেন ভাল ছাত্রীর মত তা করে রাখতাম। কিন্তু অল্পদিন পরেই সে ভয় ভেঙে গেল। আজও শুদ্ধানন্দ মহারাজের শান্ত সস্নেহ দৃষ্টি আমার মনে পড়ে। মানুষটি নিতান্তই নিরীহ গোবেচারী ধরনের—এটুকু বুঝতে আমার বেশি দেরী হল না। তারপরই শুরু করলাম উৎপাত—শ্রুতিলিপি (dictation) নিতে বললে হাত ব্যথা করে। বেশিক্ষণ বসে থাকলে পিঠ কন্‌কন্ করে, নানা বায়না আমার। কে জানে শুদ্ধানন্দদা এগুলো বিশ্বাস করতেন কি-না। কিন্তু একদিনও ধমক খাইনি তাঁর, মার খাওয়া তো দূরের কথা। অথচ শচীনদার মুখে শুনেছিলাম উনি বেজায় বদ্‌রাগী। হতেও পারে—স্বভাবে শান্ত মানুষ একটুতেই দপ্‌ করে জ্বলে ওঠে আবার একটু পরেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মায়ের কাছে গল্প শুনেছি মঠ-জীবনের আদিতে তাঁর ওই সরল নিরীহ স্বভাবের জন্যই ঠাকুর শুদ্ধানন্দজীকে বড় ভালবাসতেন। রাগটি ঠাকুরেরও বিলক্ষণ ছিল বারবারই বলেছি। সামান্য কারণেই অগ্নিশর্মা হয়ে কটুকাটব্য করতেন—সে সময়ের মঠবাসী অনেকে তার সাক্ষী ছিলেন। পরে অবশ্য ঠাকুরের এভাব বদলিয়ে গিয়েছিল। যাই হ'ক একবার এই রকম কোনও কারণে রেগে গিয়ে ঠাকুর শুদ্ধানন্দজীকে খুব বকলেন। বকাবকি করে নিজের ঘরে গিয়ে বসেছেন। তাঁর উগ্র মূর্তি দেখে মঠের ভৈরবী মাও কাছে যেতে সাহস করেননি তখন। এমন সময় ঘরের দরজা একটুখানি খুলে গেল। মনে মনে একটু আশ্চর্য হয়ে

ঠাকুর সেদিকে তাকান। কার এত সাহস যে, খানিকক্ষণ আগেই তাঁর রুষ্ট গর্জন শুনেও এখনই আসছে তাঁর কাছে? চেয়ে দেখেন দরজার ফাঁকে শুদ্ধানন্দ মহারাজের নির্বিকার প্রসন্ন মুখখানা উঁকি মারছে। চোখা-চোখি হতেই প্রশ্ন করলেন, 'বাবা, এখন কি যোরহাট যাব?' রাগ ভুলে হাসি পেয়ে যায় ঠাকুরের। লোকটা কি? এই না এত গালাগালি খেল? আবার এখনই ডাকছে 'বাবা' বলে। প্রকাশ্যে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললেন 'তোর লজ্জা করে না আমার সামনে আসতে? বেরিয়ে যা ঘর থেকে।' দরজাটি টেনে দিয়ে তেমনি নিঃশব্দে সরে যান শুদ্ধানন্দ মহারাজ, যেন কিছুই হয়নি। তাঁর এই অক্রোধ প্রশান্ত ভাবটি ঠাকুরের এত ভাল লেগেছিল যে পরে নিজেই মায়েদের কাছে এ গল্প করেছিলেন।

এখানে সত্যদার কথাটাও বলি। অন্তেবাসীদের মধ্যে প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ আমার পূর্বপরিচিত। নতুনদের মধ্যে যে দুজনের স্মৃতি বিশেষ করে মনে আছে তাঁদের একজন শুদ্ধানন্দদা, দ্বিতীয় জন সত্যদা। এখন-কার স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী মহারাজ সেসময় মঠের সত্যচৈতন্য ব্রহ্মচারী। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, 'মঠের ছেলেদের মধ্যে অবনী বড় বৈদান্তিক' (জীবনী ও বাণী দ্রষ্টব্য)। আমি তাঁকে বৈদান্তিকের ভূমিকাতেই দেখেছি বটে। একে তো চুলদাড়িসমাচ্ছন্ন মূর্তি, তার উপর সবসময় এত গম্ভীর হয়ে থাকতেন তিনি যে আমার তাঁকে দেখলেই পালাতে ইচ্ছা করত। বাবা তাঁকে অবনী বলে ডাকেন প্রথমদিনই শুনেছিলাম আসনবারান্দায় বসে। শচীনদার মুখেও ওই নামটাই শুনলাম। অবনীদার হাতে ঝুড়িভরা মঠের সেরা ফুল—ফুলের সাজি হাতে আসনঘরে ঢুকে তিনি রাঙা জবা দিয়ে আসন সাজাচ্ছেন, তাঁর নামের সঙ্গে এই স্মৃতিটা জড়ানো। ওই রাশি রাশি ফুলের দুটি একটি ভাল ফুল যদি পেতাম! কিন্তু যে গোমড়া মুখ করে থাকেন অবনীদা—

বাবা, কে চাইবে! সর্বদা গম্ভীর হয়ে থাকা যদি বৈদান্তিকের লক্ষণ হয় তাহলে সেটা তাঁর তখনই আয়ত্ত হয়েছিল এতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় আমার তাতে শ্রদ্ধা বাড়েনি তাঁর উপর। একটু কম বৈদান্তিক হলে দু'চারটা ফুল চাইতে পারতাম।

কিন্তু একদিন রাত্রে একটুখানি শ্রদ্ধা হল সত্যই। রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা হবে। আধঘণ্টারও বেশি হবে সমস্ত মঠ নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঠাকুর শুতে চলে গেছেন। মায়েরা খাওয়া সেরে পঞ্চবটিতে এসে কথা বলছেন আমার বিছানার পাশে বসে। আধ ঘুমে আধ তন্দ্রার ঘোরে ঢুলছি আমি। হঠাৎ ঘুম ছেড়ে গেল চোখের—কে গান গাইছে রে?

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ
আমি পাই না তোমারে॥

পূবদিকের পুকুর পাড় হতে ভেসে আসছে সুর। স্তব্ধ নিশীথে কোনও সুরেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই গানের অর্ঘ্য মঠের আকাশবাতাসকে সামধ্বনিপরিপূরিত তপোবনের মহিমায় উন্নীত করে ওপারে যে পৌঁছে-ছিল তাতে ভুল নাই।

পরদিন সকালে সোনালী রোদে ঝলমল করছে মঠায়তন। বর্চ্চঃকুটির হতে ফিরে মাজন হাতে চৌকিতে বসেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাত্রে কে গান গাইছিল রে শচীন?' 'অবনীদা'—তিনি উত্তর দিলেন। 'বাঃ অবনী তো রবিঠাকুরের গান বেশ গায়'—বলে দাঁত মাজতে লাগলেন ঠাকুর।

সারস্বত মঠের সঙ্গে প্রাচীন সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের অধিকাংশেরই অধ্যাত্মজীবনে প্রথম পদার্পণের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। প্রজ্ঞানন্দদার মুখে তাঁর ঠাকুরদর্শনের বিবরণী শুনেছি। তাঁর লেখা শ্রুতিস্মৃতিতে তিনি মোটামুটি সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। যেটুকু করেননি তা বলি। প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ কুমার ব্রহ্মচারী নন। সংসারাশ্রমে দীর্ঘদিন কাটিয়ে পরিণত বয়সে তিনি বানপ্রস্থী হন। এ অবস্থায় প্রথমদিকে তাঁর মনে সমাজ ও সংসারের প্রচলিত ধারণাগুলি বদ্ধমূল থাকা স্বাভাবিক। দৈবের নির্বন্ধে পুরীতে যখন তিনি ঠাকুরকে দেখেছিলেন ঠাকুর সেসময় শ্রদ্ধেয় গুরুভাই ৺অশ্বিনীকুমার দাশগুপ্তের পরিবারবর্গ-বেষ্টিত। আগেই বলেছি ওই পরিবারটির সঙ্গে ঠাকুরের কি ধরণের অন্তরঙ্গতা ছিল। ঠাকুরের বই পড়ে তাঁকে ভাল লাগলেও সমুদ্রতীরে কিশোরী-পরিকর-সঙ্গে স্বামী নিগমানন্দকে তিনি বিনা দ্বিধায় সদ্‌গুরু বলে বরণ করতে পারলেন না। কিন্তু আলাপ করতে গিয়ে ঠাকুরের কথাবার্তা তাঁর খুব ভাল লাগল বলে তখন আবার সন্ন্যাস নিতে চাইলেন তাঁর কাছে। প্রজ্ঞানন্দদা বলতেন "আমার দ্বিধা-সংশয় নিশ্চয়ই প্রভুর অগোচর ছিল না। তিনি তখনই আমায় গ্রহণ না করে বললেন, 'মঠে যাও। সেখানে পৌষ মাসে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আগে ব্রহ্মচর্য দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসের যোগ্যতা অর্জন কর'।" তাঁর আদেশ অনুযায়ী প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ পৌষমাসে মঠে এলেন। সারস্বত মঠের শান্তরসাস্পদ পরিমণ্ডল তাঁর ভারী ভাল লাগল। কিন্তু ভৈরবীমাকে দেখে আবার ধাক্কা খেলেন মনে। কয়েকদিন বেশ লক্ষ্য করে দেখলেন ঠাকুরের সেবা-পরিচর্যা ভৈরবীমা-ই করেন। ঠাকুরের সদাসন্নিহিতা সেবিকা তিনি। প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের মনটা বড় দমে গেল। ইনি কি সত্যই মহাপুরুষ? কাম-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ বলেই কি নারীকে নরকের দ্বার বলে

সরিয়ে রাখার প্রয়োজন এঁর ফুরিয়েছে? অথবা প্রচ্ছন্ন বামাচারী? মনের সংশয়ে অত্যন্ত অশান্তি পান প্রজ্ঞানন্দদা, গুরুলাভের বাসনা তাঁর আন্তরিক। কিন্তু সদ্‌গুরুভ্রমে অসদাচারীর হাতে পড়ে জীবন পণ্ড না হয় সে আশংকাও তীব্র। শোকের তাড়নায় সংসার ছেড়েছিলেন, চিত্ত সদাই সন্তপ্ত। তার উপর গুরু-বরণ করতে গিয়ে এই ঘোর সংশয় তাঁকে একেবারে ব্যাকুল করে তুলল। কাকে বলবেন একথা—কে তাঁর দ্বন্দ্ব নিরসন করবে? প্রজ্ঞানন্দদার মুখে শুনেছি, সেদিন সূর্য অস্ত যায়-যায়; পরদিন তাঁর ব্রহ্মচর্যদীক্ষা হওয়ার কথা। অথচ গুরুকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করতে চিত্ত প্রস্তুত নয়। অশান্ত মনে ঘর ছেড়ে পূবের পুকুরপাড়ে যাওয়ার রাস্তার এক পাশে এক নির্জন নাগকেশর-তলে ছায়ানিবিড় কয়েকটি ফুলগাছের আড়ালে এসে বসলেন। ভাবতে ভাবতে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই একমাত্র পথ মনে হল। আসন করে বসেছিলেন প্রজ্ঞানন্দদা। সেই অবস্থাতেই উপুড় হয়ে মাটিতে মাথা রেখে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন তিনি। মনে মনে বলছেন, 'ভগবান তুমি আমায় পথ দেখাও। বল ইনিই কি আমার গুরু? আমাকে এমন কোন প্রমাণ দাও যেন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারি তোমার আসনে এঁকে বসাতে পারব। আমার গুরু ও ভগবান অভেদ। আজকের মধ্যে এর মীমাংসা না হলে কাল সকালে আমি পালাব।'

একেবারে বিভোর হয়ে একান্ত মনে প্রার্থনা করছেন প্রজ্ঞানন্দদা। ভুক্তভোগী নিশ্চয় জানেন, একধরণের প্রার্থনা আছে তা এতই আন্তরিক যে অন্তরেই আশ্বাস মেলে আমার এ প্রার্থনা বিফল হবে না। প্রজ্ঞানন্দদার মনও প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে এল। মন যেন বলল আমার প্রার্থনা ভগবান শুনেছেন। আস্তে আস্তে মাথা তুলতে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মাথায় ঠিক ব্রহ্মতালুটিতে কি যেন লাগল

সজোরে। প্রায় সেই সঙ্গেই পরিচিত কণ্ঠে শুনলেন 'ইস্ কে রে এখানে? একি তুমি?' প্রজ্ঞানন্দদা মাথা তুলে দেখলেন তাঁর সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

প্রতিদিনের মত সেদিন বিকালেও চারিদিক দেখতে দেখতে ঠাকুর বেড়াতে বেরিয়েছেন। পুকুরপাড়েই যাচ্ছেন—পায়ে জুতা, হাতে লাঠি। পথের ধারে গাছের আড়ালে প্রজ্ঞানন্দদা যে এভাবে মাটিতে মাথা রেখে পড়ে আছেন তিনি ভাবতেও পারেননি। নাগকেশর গাছটির দিকে কি কারণে পা বাড়িয়েছিলেন কে জানে? কোনও ফুলগাছের দিকে দৃষ্টি পড়েছিল হয়তো। রাস্তা থেকে একটু সরে এসে পা ফেলতেই তাঁর জুতাসুদ্ধ পা পড়ল মহারাজের ব্রহ্মতালুতে। কারণ তিনি ঠিক তখনই মাথা তুলতে গেছেন। অপ্রস্তুত হয়ে থেমে পড়েছেন ঠাকুর—জিজ্ঞাসা করছেন 'এখানে এভাবে কেন? লাগেনি তো?' ইত্যাদি। প্রজ্ঞানন্দদা বলতেন, 'লাগবে কি, আমার মন তখন আনন্দে ভরে উঠেছে। আমার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি সেই মুহূর্তে। একাগ্রমনে আন্তরিকভাবে ভগবানকে ডাকছিলাম। ঠিক তখনই আমার মাথায় যিনি দৈবপ্রেরিত হয়ে পা তুলে দিয়েছেন তিনিই আমায় গুরু। স্পষ্ট বুঝলাম এ ভগবানের নির্দেশ। আমি সৎগৃহস্থ ব্রাহ্মণ এই অভিমানে আমার গুরুভগবানের সমালোচনা করেছি মনে মনে, তাই ওই পদাঘাত। ঠিক যেন বলির মাথায় পা তুলে দেওয়া নারায়ণের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের দম্ভরূপী কালিয়নাগের শিরে পদাঘাত করে তার অহংকার দমন করা।' বলতে বলতে চোখে জল এসে যেত প্রজ্ঞানন্দদার। জলভরা চোখে হেসে বলতেন, "তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে বললাম 'একটুও লাগেনি ঠাকুর'। কেন ওখানে ছিলাম

ওইভাবে তা আর কিছু বললাম না। তিনিও আর কোন প্রশ্ন না করে বেড়াতে চললেন। সঙ্গী সেবকের সঙ্গে আমিও চললাম তাঁর পিছু-পিছু। পরদিন তাঁর কাছে ব্রহ্মচর্য্যদীক্ষা পেয়ে জীবন সার্থক জ্ঞান করলাম।”

পঞ্চবটির বেলতলায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। রোজ সন্ধ্যায় প্রণাম করতে আদিষ্ট হয়েছিলাম। একদিন যেমনি মাথা নুইয়েছি দুম্ করে ঠিক পাশেই একখানি বেল পড়ল। সে কী বুক ঢিপঢিপানি আমার! মায়েদের কিন্তু পঞ্চবটির বেলতলা দেখলেই চিদানন্দ মহারাজকে মনে পড়ত। ঠাকুরের সব কাজ এবং মঠের অন্যান্য কর্তব্য নির্বাহের ফাঁকে অবসর পেলেই নাকি চিদানন্দজী ওই বেলতলায় পদ্মাসন করে চোখ বুজে বসে থাকতেন। কখনও বা মাথা দুলিয়ে আধবোজা চোখে হাতে তালি দিয়ে গাইতেন—

ওঁ শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ বোলা।
জয় জয় বোলা শিব কাশীনাথ বোলা॥

তিনি শ্রীহট্টিয়া, তাই ‘ভোলা’ উচ্চারণ হত না, ‘বোলা’। উচ্চারণের এই ত্রুটি কণ্ঠমাধুর্যে পুষিয়ে যেত। মঠের প্রাক্তন এক অন্তেবাসীর (ব্র. নৃসিংহচৈতন্য) মুখে শুনেছি চিদানন্দজীর ধমকও তাঁদের মিষ্টি লাগত ওই মজার উচ্চারণের জন্য—‘একানে আস্‌না রে বেডা, অকানে বসে বসে কি করছিস্?’ আমি একদা পুরীর বাড়িতে চিদানন্দজীর মুখে শুনেছিলাম, ‘টাকুর! টাকুর! কি যে তুমি কর টাকুর!’ তাঁর মুখে ‘টাকুর’ ডাকটি কি মধুর যে লেগেছিল! বক্তার শিশুসুলভ ঋজুতা ও শরণাগতির ধ্বনি মিশেছিল ওতে, সেইজন্যই নিশ্চয়। দেখলাম নীলাচল কুটিরের ঠাকুর-ঘরে ঢুকতে গিয়ে মাথার পাগড়ি খুলে বাইরের বারান্দায় ফেলে রেখে অনাবৃত মস্তকে তিনি প্রবেশ করলেন ভিতরে। গুরুর সম্মুখে সবিনয়ে

দীনবেশে উপস্থিত হওয়ার এ-সদাচারও আমি প্রথম তাঁকেই পালন করতে দেখেছিলাম।

যোগানন্দজী ও নৃপেনদার লেখায় চিদানন্দ মহারাজের অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা অনেক পড়েছি, মায়েদের কাছেও কত শুনেছি। তাঁরা বলতেন, 'চিদানন্দজীকে মনে হত সাক্ষাৎ নন্দিকেশ্বর!' শ্রীহট্টের মৌলভীবাজার মহকুমার বালাগঞ্জ থানায় কোনও এক গ্রামে তাঁর বাস ছিল—অতিসন্ধানী শক্তিদা তাঁর পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে এর বেশী আর কিছু যোগাড় করে উঠতে পারেননি। কারও কাছে কোনও দিন চিদানন্দজী নিজেও তার কোন হদিশ দেননি। প্রথম ঠাকুরদর্শনের কথা বলতে গিয়ে একবার শুধু এইটুকু প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর গ্রাম হতে কুলাউড়া স্টেশন এক দিনের পথ। (খড়কুশমা আর্যদর্পণ, ১৩৬১ বৈশাখ) পনের বছর বয়সে ঠাকুরের টানে ঘর ছেড়ে সবার আগে তিনিই শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করেছিলেন। আসাম মঠের সর্বত্র তাঁর স্মৃতি জড়ানো। 'ঠাকুরমাহাত্ম্যে'র লেখক শ্রীবিহারী শর্মা মঠান্তেবাসী চিদানন্দজীর কথা বড় সুন্দর করে বলেছেন। সেই সঙ্গে আমার ভাল লেগেছে শক্তিদার 'স্মৃতি-তর্পণ'। মঠায়তনে প্রথম তিনি কি ভাবে চিদানন্দ মহারাজকে দেখেছিলেন ওতে তার অপূর্ব আলেখ্য ফুটেছে। তার কিছুটা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না।

"১৩২৭ সাল কার্তিক মাস। সময় পূর্বাহ্ণ, স্থান আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্য-সাধন পাঠ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সাধনোদ্দেশ্যে সংসারের মায়া-মমতা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি সুদূর প্রান্ত হইতে মঠান্তেবাসী হইবার জন্য। *** গৌরাঙ্গঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় দেখি আসন-মন্দিরের পূজা সমাপনান্তে মঠাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া জনৈক গৈরিকধারী সৌম্যমূর্তি পুষ্পপাত্র

ও ধূপদানী হাতে লইয়া চলিয়াছেন শিববাটি অভিমুখে পূজা নিবেদনের জন্য আপন মনে, কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া। দীর্ঘ কেশকলাপ, শ্মশ্রুগুম্ফবিমণ্ডিত প্রসন্ন আনন, অর্ধনিমীলিত ভাব-ঢলঢল নয়নযুগল, মধুর কণ্ঠে নিঃসৃত হইতেছে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের অমর গীতঝঙ্কার 'তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।' সেই মূর্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। শ্রদ্ধায় চিত্ত ভরিয়া উঠিল। ইনি কে? মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিবামাত্র একজন বলিলেন, 'ইনি কুমার চিদানন্দ।' * * *

পরক্ষণেই দেখি, সেই অন্তর্লীন ভাব-তন্ময় সন্ন্যাসী পূজারীর বেশ ত্যাগ করিয়া কর্মীবেশে কোদাল হাতে লইয়া চলিয়াছেন পুকুরপাড়ের কৃষিক্ষেত্রে। * * মনের আবেগে দুর্বার বেগে 'জয়গুরু' বলিয়া মাটি কোপাইয়া চলিয়াছেন অবিশ্রান্তভাবে। * * *

প্রসাদ গ্রহণান্তে বিশ্রাম? বিশ্রাম তাঁহার নাই। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম, তিনি 'গ্রন্থসাহেব' লইয়া বসিয়াছেন এবং কয়েকজনকে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেছেন। তখন দেখিলাম তিনি পূজারী নহেন, কর্মী নহেন, উদাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক শিখ (শিষ্য)।

অপরাহ্ণে দেখিলাম জনৈক শিক্ষুকে তিনি যৌগিক প্রক্রিয়া—আসন মুদ্রা প্রাণায়াম শিক্ষা দিতেছেন—তখন দেখিলাম তাঁহার যোগীরাজ-মূর্তি।

সন্ধ্যারতি অন্তে তামাক সাজাইয়া আনিলেন ঠাকুরের, তাঁহার শ্রীচরণোপান্তে বসিয়া করিতে লাগিলেন তাঁহার পদসংবাহন। তখন তাঁহাকে দেখিলাম ঠাকুরের পার্ষদ-সেবকরূপে।"

(আর্য্যদর্পণ, ১৩৭০ মাঘ)

পুরাতন মঠবাসীরা বস্তুতই চিদানন্দজীকে এই এতগুলি ভূমিকায় অহোরাত্র ব্যাপৃত দেখতেন। আবার তারই মধ্যে সময় পেলেই তিনি

বেলতলায় পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়তেন। অন্তর্মুখ ভাবটি তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। ১৩৩৩ সালে গুরুধামে একদা তিনি ঠাকুরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে বাতাস করছিলেন। শ্রীশশধর চক্রবর্তী লিখছেন, 'দাদা চোখ বুজে একভাবে ঠাকুরকে বাতাস করে যাচ্ছেন। মাঝে-মাঝে একেকবার যখন চোখ টান করে একটু চাইছেন, দেখছি অন্তর্নিহিত আনন্দে চোখ রক্তবর্ণ, যেন ভিতরমুখী কি একটা টানে তারাছুটি উর্ধ্বমুখ।'

সারস্বত মঠ বলতে তো কেবল কতগুলি ঘর-বাড়ি নয়। এই সব গুরুগতপ্রাণ আত্মস্থ সন্ন্যাসীদের ভাবমূর্তিই যে সারস্বত মঠের চিৎস্বরূপ! আমরা আর বেশী কি বলব—মঠাধীশ শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং তাঁর এই ত্যাগী ছেলেদের প্রশস্তি উচ্চারণ করে বলেছেন—

'আমি যখন এই মঠ তৈরি করি তখন এস্থান ছিল তারাজঙ্গলে পরিপূর্ণ···। মাত্র ছয়জন সেবক নিয়ে আমি একে নন্দনকাননে পরিণত করি। তখনকার সেবকরা কি যে প্রাণপাতী পরিশ্রম করেছে এই মঠ গড়ে তুলতে—তা আর কি বলব? দিনরাত খেটেছে শুধু কলমীশাক-সিদ্ধ আর ভাত খেয়ে। কোন কোন দিন ডাল এমন হ'ত যে হলুদ-লবণগোলা জলের মত। (ডাল ভেবে হাতধোয়া জল দিয়ে ভাত খাওয়াও হয়েছে।) তারা এইভাবে থাকত, **কাজের উঁচু-নীচু বিচার করত না**। চিদানন্দ তামাক সাজত, প্রেমানন্দ ইত্যাদি এরা কাঠ চেলা করত। তখন আবার খড়ির অভাব। নৌকা বেয়ে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র হতে বড় বড় ভাসান কাঠ ধরে বয়ে আনতে হ'ত।··· যোগানন্দ বোধানন্দ এরা সব বিদ্বান্ ছিল, বড়লোকেরও ছেলে, কিন্তু কত ছোট ছোট কাজ করত! অনভ্যাস বলে ছাড়ত না, খুব উদ্যম নিয়ে করত।···আমার পানে তাকিয়ে আনন্দের উন্মাদনায় তারা দিনরাত কাজ করে গিয়েছে।······উঃ, সে কি পরিশ্রম! তারা পণ করে কাজ

ত। তারাই এই মঠকে সোনার পুরী করে দিয়ে গিয়েছে।…সে যুগের সাক্ষীর মধ্যে আছে শুধু চিদানন্দ আর প্রেমানন্দ। আত্মানন্দও কিছু কিছু জানে।'
(জীবনী ও বাণী, পৃঃ ১৫২-৫৩)

মঠের বর্তমান মোহন্ত আত্মানন্দ মহারাজের প্রথম অভিজ্ঞতাটি কিছু মজার। তিনিও আসামে এসেই ঠাকুরকে ধরেছিলেন। আমি তাঁর মুখেই সে কাহিনী শুনেছি—

"তখন স্কুলের ছাত্র। মামাবাড়ি থেকে পড়াশোনা করতাম, এনট্রান্স দেব। স্বদেশী করতাম, সেবাকার্যের ঝোঁক ছিল। সেই সঙ্গে ছিল আসন-প্রাণায়ামাদির সখ। মামারা দু'জন ছিলেন উকিল—অবস্থাপন্ন। ওই সব জানলে বাধা দেবেন বলে লুকিয়ে করতাম। কিন্তু পাশের বাড়ির একটা ছেলের কাছে একদিন ধরা পড়ে গেলাম। হাতে রাখার জন্যে সদলবলে তাকে টাকাদশেকের মিঠাই খাওয়াতে হল। সেই ছেলেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমায় ব্রহ্মচর্য্য-সাধন ও যোগীগুরুর সন্ধান এনে দেয়!

"প্রথমটা আমার কেমন ধারণা হয় লেখক মৃত। পরে একদিন ভুল ভাঙল, না ইনি এখনও বর্তমান। অমনি কোকিলামুখের ঠিকানায় চিঠি দিলাম যে সাধন-ভজন করতে চাই, মঠে থাকব। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার আগে চিঠিটা দিলাম। উত্তর কিন্তু তাড়াতাড়ি এল না। মনে ভয় নিয়েই ছুটিতে বাড়ি গেলাম—যদি চিঠি মামার হাতে পড়ে! মজা দেখ, চিঠির উত্তরটা মামার হাতেই এল বটে কিন্তু তিনি না পড়ে ক্যাশ-বাক্সে রেখে দিলেন। আমি আসার পর আমায় দিলেন।

"মঠ থেকে ঠাকুর লিখছেন, 'যদি বাবা-মায়ের অমত না থাকে আসতে পার।' আমি আবার লিখলাম, 'বাপ-মা কি মত দেন? বিশেষ আমি

বড় ছেলে, অনেক আশার মূল। আপনার বাপ-মা কি আপনাকে ঘর-ছাড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন ?”

“এর পর উত্তর এল, ‘তুমি আসতে পার’। যাওয়ার ফিকির-ফন্দী করতে করতে পূজার ছুটি এসে পড়ল। ‘বাড়ি যাচ্ছি’ মামাকে এই বুঝিয়ে পড়ার বই বিক্রী করে সেই টাকা নিয়ে পালালাম।”

১৩১৯ সাল, ২৮শে আশ্বিন। আলিপুরদুয়ার হতে চার সন্ন্যাসী শিষ্য নিয়ে ঠাকুর এসে নেমেছেন যোরহাট স্টেশনে। দৈবের নির্বন্ধ, আমাদের আত্মানন্দজীও সেই দিনই যোরহাট এসে পৌছালেন। সন-তারিখটি পেয়েছি স্বরূপানন্দজীর দিনলিপিতে।

“টিকিট-কালেকৃটরের কাছে খোঁজ নিচ্ছি কোকিলামুখ আশ্রমে যাব কেমন করে, আর দেখছি জনাকয়েক গেরুয়াপরা লোক একদিকে মালপত্র টানাটানি করছে। টিকেট-কালেকৃটার হাত দিয়ে দেখাল ‘ওই ওঁরাই কোকিলামুখ আশ্রমের সন্ন্যাসী।’ আমি তো অবাক্! সাধু-সন্ন্যাসী বলতে ভেবেছি কৌপীনপরা ছাইমাথা— মাথায় জটা থাকবে। এ কেমন সাধু ?

“যাই হ’ক কাছে গেলাম। ঠাকুর একটা বিছানার বাণ্ডিলের উপর লাঠিতে চিবুক রেখে বসেছিলেন। তাঁর নাম করতেই যোগানন্দজী তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। গিয়ে প্রণাম করতে ঠাকুর বললেন ‘আপনি কে ? কি চান ?’ বললাম ‘চিঠি পেয়ে আসছি’……ইত্যাদি। ‘ও, তুমি ? এত দেরি হল আসতে ?’ বললাম, ‘ঘর ছাড়া সহজ নাকি ? এত দেরি না বলে বলুন, ছয় মাসে যে আসতে পারলাম এই না কত!’ ঠাকুর আর কিছু বললেন না।”

আমার অনুমান ছেলেটির কাঠখোট্টা জবাবে সমজদার ঠাকুর খুশী হয়েছিলেন। হাঁ, ‘বাপকি বেটা সিপাহিকি ঘোড়া। কুছ নেহি তো

থোড়া থোড়া ॥' নিজের চেলাদের কথা বলতে গিয়ে কখনো-কখনো ঠাকুর এ-বচনটি আওড়াতেন, আমি শুনেছি।

"দেখি বোধানন্দ সারদানন্দেরা মালপত্র সব তুলতে পারছে না, কষ্ট হচ্ছে। গিয়ে ধরলাম একটা বাক্স। আমার গায়ে তখন অসুরের বল। ওঁরা ২।৩ জন যা নিতে হিম্‌সিম্ খাচ্ছেন আমি একাই তা নিতে পারি। তবু আমি হাত লাগাতেই ওঁরা কে যেন বললেন,'না, না, আপনি কেন ?' সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'আরে, দাও ওকে। **ও আমারই লোক**।'

"মালপত্র গোছগাছ করে আমায় পাহারায় রেখে ঠাকুরকে নিয়ে চিদানন্দেরা স্নানাহারের ব্যবস্থায় গেলেন। আর ফেরেন না। খুব দেরী হচ্ছে। তখন মনে ভারী ভয় হল, সর্বনাশ ! এরা ডাকাত নয় তো ? চোরাই মাল কি বোমা টোমা ফেলে পালাল নাকি ? এবার তো পুলিশ এসে আমাকেই ধরবে। কি করি এখন ? যাই হোক শেষ অবধি দেখি সবাই ফিরছেন। ঠাকুর এসে বললেন 'এবার তুমি যাও। ওখানে (ভোগদৈ নদীর ঘাটে) চিদানন্দ আছে। গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি স্নান করে খেয়ে এস—হাঁড়িতে তোমার জন্য মিষ্টি আছে।'

"স্নানান্তে খেতে গিয়ে প্রচুর মিষ্টি রয়েছে দেখে একখানা পাতায় যা পারি তুলে নিয়ে খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে হাঁড়িটা নিয়ে ফিরলাম। আমার হাতে মিষ্টির পাত্রটা দেখে ঠাকুর বলছেন—'আরও রয়েছে মিঠাই ? তবে থাক্, আশ্রমে আমার ছেলেমেয়েরা খাবে।' মনে মনে আবার একটা ধাক্কা খাই। একে তো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা সাধু, তায় আবার ছেলে-পুলেও আছে ? কেমন সাধু বাবা ! এ কার জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে এলাম ?

"মঠে গিয়ে নরসিং ইত্যাদির সঙ্গে কথাবার্তা কইতে কইতে কৌশলে জানার চেষ্টা পাই কে ওদের বাপ। শেষে জানলাম, 'ডাক্তার-দা' ওদের বাবা, এরা তাঁরই ছেলে-মেয়ে। কিন্তু ভৈরবী মা? তাঁকে প্রথমটা ঠাকুরের সহধর্মিণীই ভেবেছিলাম। পরে ভুলটা ভাঙল।"

ভাবুকতা জিনিসটা আত্মানন্দজীর ধাতে কোনদিন ছিল না। তিনি চিরদিন কাজের মানুষ—খাঁটি কর্মযোগী। এজন্য পাকাপাকি রকম অন্তেবাসী হওয়ার অল্পদিন পরেই পাহাড়-জঙ্গলভরা এক টিলায় নতুন একটা আশ্রম পত্তনের দুরূহ কাজে ঠাকুর তাঁকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এত শীঘ্র আশ্রমাধ্যক্ষপদে আর কেউ বৃত হয়েছেন বলে জানি না। সে কথায় পরে আসছি।

প্রথম দফায় কিছুদিন মঠে থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আত্মানন্দজীকে আদেশ করলেন 'এখন বাড়ি গিয়ে এনট্রান্স পাশ করে ডাক্তারীটা পড়। তার পর আসবে।' অতএব, স্বরূপানন্দজী দিনলিপিতে লিখছেন '৬ই পৌষ কামিনী বাড়ি গেল।'

আত্মানন্দজী বলে যান—"আমার খোঁজ না পেয়ে বাড়িতে কান্না-কাটি পড়েছিল। সন্ধান আনতে পারলে পুলিশ পুরস্কার পাবে থানায় এমনও বলা হয়। গিয়ে পড়ায় সবাই খুশী—কেউ আর বিশেষ কিছু বললেন না। এনট্রান্স পাশ করলেই চাকরি পাইয়ে দেবেন—মামা লোভ দেখান। তখনকার দিনে শ'দেড়েক টাকা মিলবে এমন চাকরিই করে দিতে পারতেন। মন চাইল না।

"এনট্রান্স পাশ করে ঢাকা এলাম মেডিকেল স্কুলে পড়তে। তখন বরদাও ঢাকায় পড়ছে। বাড়ি থেকে ভাল খাবার যা আসত ওকে ভাগ দিতাম। বড় খুশী হত।...চার-পাঁচ বছর পরে মঠে ফিরলাম।

"আবার ছেলেদের মাস্টারী করি, কোদাল মারি, কাঠ কাটি, বোঝা বই। প্রেসের দায় খুব, একেকবার ভাবি এখানেই একটা প্রেস করি…শেষ পর্যন্ত মঠেই প্রেস এল।……ঠাকুরের অলৌকিকত্ব কি রকম দেখেছি, জান? মনে দু'চারটা প্রশ্ন উঠল হয়তো, ভাবছি জিজ্ঞাসা করি। তারপরই কোন এক সময় কথাপ্রসঙ্গে এমন আলাপ জুড়লেন ঠাকুর যে সেসব শুনতে শুনতেই ঠিক আমার মনোগত প্রশ্নগুলির উত্তর পেয়ে গেলাম। বুঝতেই পার, এতে কি রকম আকর্ষণ হয়!

"…অবসর পেলেই কিন্তু আসন-প্রাণায়ামাদি চালাই। কিন্তু আমি যে ঘরটায় থাকতাম তার মধ্য দিয়ে ছেলেদের যাতায়াতের পথ। স্থির হয়ে কাজকর্ম করার তাতে বড় বিঘ্ন হত। একদিন ঠাকুরকে কথাটা বললাম, 'ঠাকুর, মঠের এক প্রান্তে একটা চালা তুলব? কাজকর্ম সারা হলে সময় যেটুকু পাই সেখানে বসে একটু সাধন করব।'

" 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তোল না'—ঠাকুর উৎসাহই দিলেন। কিছুদিন পরে তিনি ভ্রমণে বার হলেন। আমি অবসরমত মাটি ছেনে কাদা চটকিয়ে কোদাল-কুড়াল মেরে পুবের পুকুরপাড়ে ওঠার যে রাস্তা তারই এক পাশে একখানা ঘর বানালাম। বেশ হল ঘরখানা।……ঠাকুর ফিরে আসছেন। গরুর গাড়ি নিয়ে তাঁকে আনতে গেলাম। এসে নামতেই দেখাচ্ছি 'ঠাকুর, এই যে এই ঘরটা করেছি।' 'বাঃ বেশ, বেশ—ভাল হয়েছে তো'—মুখে খুশীর ভাবই দেখালেন। মনের ভাব কিন্তু তা নয়।

"কয়েকদিন পরই আমার ডাক পড়ল। বললেন 'দেখ, কুমিল্ল -ময়নামতীতে একটা জায়গা পেয়েছিলাম। তা চিদানন্দ ও নীলমণি (শ্রীহট্টের একটি ছেলে) ওখানে কিছু করে উঠতে পারছে না, বিক্রী করতে বলছি, তাও বোধহয় ও দুটোর দ্বারা হবে না। তুমি একবার ওখানে যাও, দেখ কি করতে পার। পারলে একটা আশ্রম গড়, নয়তো বিক্রী করেই

দাও।' বললাম 'তা নাহয় হল। কিন্তু আপনার আসল ইচ্ছাটা কি? আশ্রম গড়া না জায়গা বিক্রী?' বলতেই বলে উঠলেন, 'আরে, ওই ভিটাটা আমার পূর্বজন্মের সাধনস্থলী ছিল। ইচ্ছা তো ছিল, ওখানে কিছু একটা হ'ক। কই আর হচ্ছে?'

"বুঝলাম ভাবটা। বললাম 'তবে দেখি একবার চেষ্টা করে। কিন্তু ওখানে তো কিছুই নাই। গিয়ে খাব কি? আপনি টাকা দেবেন?' ঠাকুর জবাব দিলেন 'স্কুলের ছেলের মত তোমায় আমি টাকা পাঠাব তবে তুমি খাবে—তা-ই যদি হল তো তোমায় পাঠাই কেন? নরসিংকে পাঠালেও তো হয়!'

"না, আমার কিন্তু শুনে রাগ হয়নি। মনে হল এ যেন একটা চ্যালেঞ্জ। গাড়িভাড়ার উপর আর মাত্র আট আনা পয়সা দিয়ে ঠাকুর মঠ হতে আমায় বিদায় করলেন। ঘর রইল পড়ে, হল আমার সাধন-ভজন!

"এর পর কুমিল্লা আশ্রম গড়ার ইতিহাস। সে অন্য কথা।"

মোহান্ত মহারাজ যা বলেছিলেন স্মৃতি হতে তার সারোদ্ধার করেছি। সামান্য দু'একটা তথ্যগত ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু মূল কথাগুলি সংক্ষেপে সবই বললাম। সাল-তারিখ তিনি সঠিক বলতে পারেননি, আমিও যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি কেবল সেটুকু দিলাম।

বিন্দুমাত্র রস-কষ না দিয়ে ঠাকুরের কথা তিনি আমায় যা শোনালেন তার মধ্যেও সন্ন্যাসাশ্রমী নিরলস এক সেবাব্রতীর চরিত্রবৈশিষ্ট্য বর্তমান। ঠাকুরসম্বন্ধে ভাবালুতা না-ই থাক, তবু আজীবন যে তিনি ঠাকুরের মঠাশ্রমের জন্য প্রাণপাত করে খেটে গেছেন তাতেই তো ধরা পড়ে ঠাকুরকে চিনতে তাঁর ভুল হয়নি। আমি তাঁর কথায় কিন্তু খুব

রস পেয়েছি। আমার কাছে গুরু-শিষ্যের সদালাপগুলি একেবারে অনবদ্য। 'যেমন গুরু তেমনি চেলা' এছাড়া অন্য কোনও মন্তব্য করা চলে না এক্ষেত্রে।

ভুবন ও হরিদাসদার কথা আগেই বলেছি। তাঁরা মঠেই পেয়েছিলেন তাঁদের ঠাকুরকে। সত্যদাও ঠাকুরকে ওই মঠেই প্রথম দেখেন। ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছ গ্রামে 'অন্নপূর্ণার বাড়ি'র ছেলে তিনি। ছোটবেলা হতেই গুরুজনদের মুখে সতী অন্নপূর্ণার কথা শুনেছেন—

পিতামহী অন্নপূর্ণা পিতামহ রামমোহন,
১২৩৫ বাংলাতে সাধ্বীব্রতে সহমরণ।
জ্বলন্ত চিতায় জ্বলে মুখে হরি হরি বলে,
দেখে ভাবে মুগ্ধ হল শুব্ধ আত্মহারা জনগণ॥

ছোট থেকেই সত্যদা এজন্য মাতৃ-উপাসক ছিলেন। যেখানে সহমৃতা হয়েছিলেন অন্নপূর্ণা, ঠিক সেই জায়গাটিতে সঙ্গীতরচয়িতা মাতৃসাধক ৺বসন্তকুমার (সত্যদার জেঠা মহাশয়) কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একবার এক অমাবস্যা রাত্রে সেখানে জ্যোতি দর্শন করে সত্যদার অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতি বিশ্বাস ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ধর্মগ্রন্থপাঠে রুচি, ধ্যানধারণায় ঝোঁক স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছিল। কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজে আই, এ, পড়বার সময় দৈববশে তাঁর হাতে একখানা আর্যদর্পণ পড়ে। পত্রিকাখানা পড়ে খুব ভাল লাগল। রাত্রে স্বপ্নে যেন কে বলে দিলেন 'ওখানে যাও'। হাতে বই কেনার জন্য টাকা ছিল কিছু। সেই পাথেয় নিয়েই এসে উপস্থিত হলেন আসাম মঠে। ১২ই ডিসেম্বর সেদিন, মঠে পঙ্কোৎসব চলছে। মঠের আঙিনায় কাদা-মাখা পায়ে ঠাকুর বসে আছেন। তাঁর পায়ে কাদা দিয়ে প্রণাম করে মাতা-

মাতি করছেন অন্তেবাসীরা। সত্যদাও নেমে পড়লেন সেই খেলায়। সবই যেন কত চেনা—মঠায়তন যেন কত দিনের পরিচিত। আর ঠাকুর? তাঁকেও আপনজন বলেই সত্যদার মনে হল। তিনিও বোধহয় ছেলেটিকে দেখেই চিনেছিলেন। তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষকে ডেকে বলেছিলেন, 'এ ছেলেটাকে একটু দেখিস্ তো!'

তারপর গুরুশক্তির খেলায় সত্যদার জীবন ওলটপালট হয়ে গেল। তাঁর বাবা এলেন ছেলেকে ফিরিয়ে নিতে। সত্যদাও ভাবলেন ঘরে থেকে সাধন-ভজন করব আর সেই সঙ্গে কলেজের পড়াশোনাও চলবে। কিন্তু বাড়ি এসে কি যে হল! টিকতে পারেন না ঘরে, কিছুই আর ভাল লাগে না। বুঝতে পারেন এতে তাঁর হাত নাই, যিনি টানছেন এ তাঁরই কারসাজি। চলে আসার আগে ঠাকুর বলেছিলেন, 'বাড়িতে গিয়ে যদি ভাল না লাগে আমায় চিঠি লিখ।' পুরীর ঠিকানাও দিয়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর বুঝি জানতেন?—

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহকাজে।
নিশি দিশি কাঁদি কিন্তু হাসি লোকলাজে॥

কোনমতেই মনকে বোঝাতে না পেরে হার মানলেন সত্যদা। নীলাচলকুটিরে চিঠি লিখতেই ত্বরিতে উত্তর এল, এল ঘরছাড়ার ডাক। জনমের মত কূল ছেড়ে সত্যদা অকূলে ভেসে গেলেন।

আগে যে অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের কথা বলেছি ওই দিনটির সঙ্গেও সত্যদার জীবনের একটা বিশেষ স্মৃতি জড়িত রয়েছে। সেবার নতুন করে আসনপ্রতিষ্ঠা হবে। সে অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবে কে? অন্তেবাসীদের মনে ধারণা তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ মহারাজই করবেন। তিনি কেবল অধ্যক্ষ নন, বৈদিক সন্ন্যাস পেয়েছেন ঠাকুরের কাছে। তাঁর অধিকারই সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু সকলকে অবাক্ করে দিয়ে ঠাকুর মহারাজ

ডেকে পাঠালেন 'অবনী'কে। সত্যদার কাছে এই দিনের ঘটনা শুনে ঠাকুরের আরেকটা পরিচয় পেয়েছি যা উল্লেখযোগ্য।

তাঁর আহ্বানে সত্যদা অসংশয়িতচিত্তে ঘরে এসে ঢুকেছেন—মনে ধারণা—আর্যদর্পণ পত্রিকা বা ওই ধরণের কোন পঠনপাঠন বিষয়েই আলোচনা করবেন ঠাকুর। তখনই আর্যদর্পণের সম্পাদক তিনি—পত্রিকা-সংক্রান্ত আদেশ-নির্দেশের জন্তই ঠাকুরের কাছে তাঁর সময় সময় ডাক পড়ত। কিন্তু সেদিন ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর প্রশ্ন করলেন 'তুই আসন-প্রতিষ্ঠা করতে পারবি না? জানিস তো এসব?'

সত্যদা যজনযাজনশীল ব্রাহ্মণপরিবারের ছেলে নন। আনুষ্ঠানিক পূজাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় ছিল না। তিনি বুঝতেন স্বাধ্যায়—প্রাক্তন মঠাধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত নির্বাণানন্দজীর প্রিয় ছাত্র তিনি। তাছাড়া তাঁকে আসনপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এ সম্ভাবনা সুদূর কল্পনাতেও তাঁর মনে জাগেনি। হতচকিত হয়ে সভয়-সংশয়ে অকপটে নিবেদন করেন নিজের অক্ষমতা—'আমি তো এসব কিছুই জানি না ঠাকুর। কি করে করব আসনপ্রতিষ্ঠা?'

এই যে সরল ভাষায় নিজের অযোগ্যতা জ্ঞাপন—বুঝি এই যোগ্যতাতেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন সত্যদা। এসে প্রণাম করে ঠাকুরের পায়ের কাছেই বসেছিলেন। নীচু হয়ে তাঁর মাথায় ডান হাতখানা রেখে ঠাকুর যেন মৃদু একটা ঝাঁকানি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কি যে হয়ে গেল! সত্যদার মনে হয় যেন বিদ্যুচ্চমকে চকিত হয়ে উঠল সর্বসত্তা—ওলট পালট হয়ে গেল প্রাকৃত চেতনা। শক্তিসঞ্চার করতে না পারলে গুরু হওয়া যায় না। কত অনায়াসে যে ঠাকুর সেটি করতে পারতেন সেদিন তিনি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে গেলেন। এর আগে

ঠাকুর সম্বন্ধে এ নিয়ে তাঁর মনে একটা প্রশ্ন ছিল বৈকি! গুরুভাইদের কতজনের কত কিছু হয়েছে বহুবার শুনেছেন। কিন্তু তাঁর ভাগ্যে এপর্য্যন্ত সেরকম কিছু পাওয়া ঘটেনি। স্থতরাং ব্যক্তিগত ভাবে ঠাকুরের শক্তি-মত্তায় ঈষৎ সংশয় নিতান্ত স্বাভাবিক। অন্তর্যামী হয়তো-বা মন বুঝেই ঠিক সময়টিতে সে সংশয় ঘুচিয়ে দিলেন। লগ্ন ছিল অনুকূল। সত্যদা সেদিন সেই মুহূর্তে প্রপন্ন ভক্তের মতই ব্যাকুল হয়ে বলতে পেরেছিলেন, 'আমি যে কিছু জানি না ঠাকুর।' অমনি নেপথ্য হতে নেমে এল গুরু-কৃপার অলকানন্দা—শক্তিপাত।

'যাও এবার আসনপ্রতিষ্ঠা কর গিয়ে' গুরুমুখে এই নির্দেশ পেয়ে যন্ত্রচালিতের মত উঠে গিয়ে সত্যদা আসনঘরে ঢুকলেন। শুনেছি সেদিন সারাক্ষণ কি এক ভাবে বিভোর হয়ে যন্ত্রচালিতের মত আসনপূজার করণীয়-গুলি সত্যদা করে গিয়েছিলেন। কি করছেন কেন করছেন ভাবার মত অবস্থা ছিল না—অন্তরে শুধু কি এক অব্যক্ত আনন্দ আর আবেশের অনুভব! কে যেন রাশ ঠেলে দিচ্ছে ভিতর হতে। সব অনুষ্ঠান শেষে তেমনি আবিষ্ট অবস্থাতেই ঠাকুরের কাছে তিনি আবেদন করেছিলেন 'এবার স্থূলে আমার পূজা নাও তুমি।' তাঁর আন্তরিক যাচ্ঞা ঠাকুর সেদিন ফেরাতে পারলেন না। জগদ্গুরুর আসনের উপরে এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। সেই ঠাকুর—একটু আগেই সত্যদা যাঁকে দেখেছিলেন ভাবাকুল ভক্তের ভূমিকায়—তখন তাঁকে দর্শন করলেন 'মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরু'রূপে। মানুষ সেই একই কিন্তু ভাব-কান্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি!' আসনঘরের ভিতরের দিকের দরজায় বড়মা যোগমায়া দেবী দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নাকি সেই মুহূর্তে সত্যদাকে উদ্দেশ করে বলে উঠেছিলেন—'দেখে নাও বাবা, বিশ্বরূপ দেখে নাও।'



সুরেশদা, সত্যদা, অন্নদাভাই, চিদানন্দজী, শরৎদা, আত্মানন্দজী, শক্তিদা, অনন্তদা।

সত্যদার হাতে ভর দিয়েঠাকুর মহারাজ যে সেদিন গুরুভাবে আবিষ্ট হয়ে গুরুব্রহ্মের আসনে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন—অন্তেবাসীরা অনেকেই তার সাক্ষী ছিলেন। আমি শরৎদার মুখে ঘটনাটা শুনেছিলাম।

শরৎদাকেও মনে পড়ছে আজ। তাঁকে মঠে সেবার আমি দেখেছিলাম। কিন্তু বারবার না দেখায় তিনি এমন কিছু স্মরণীয় হয়ে নাই। শুধু একটা কথা মনে পড়ে। অক্ষয়তৃতীয়া উৎসবের মধ্যে—প্রথম দিন অথবা শংকরাচার্যের আবির্ভাবতিথিতে তা বলতে পারব না—সকলকে নিয়ে আসনবারান্দায় ঠাকুর খেতে বসেছিলেন। আমিও ছিলাম একপাশে। মাঝখানে তাঁর আসন আর তাঁর দক্ষিণে ও বামে সারি দিয়ে অন্তেবাসীদের পাতা পড়েছে। ছানার পোলাও হয়েছিল মনে আছে। জিনিসটা আমার অপরিচিত। বড় বড় লাল টুকরা দেখে ভাবলাম মাংস নাকি? কিন্তু মঠে তো মাংস রান্না হতে পারে না। মুখে দিয়ে দেখি ছানা। এইজন্যই বস্তুটা মনে আছে। আনন্দময় মূর্তিতে ঠাকুর তাঁর পাত থেকে বড় বড় ছানার টুকরা ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন এর ওর তার পাতে। যাঁরা দূরে বসেছেন তাঁর নির্দেশে তাঁরা এসে হাত পেতে প্রসাদ নিয়ে যাচ্ছিলেন। 'শরৎ আয়' বলে ডাকতেই একজন উঠে এলেন—এই আমার প্রথম দেখা শরৎদাকে। হাত পেতে প্রসাদ না নিয়ে শরৎদা পাতের কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসে প্রথমেই বললেন, 'সবই তো তুলে দিলেন ঠাকুর—অল্প করে দিন আমায়।' 'তোরা কি নিয়ে আমার ভাণ্ডার ফুরাতে পারবি?' রহস্যময় হাসি হেসে তাঁর হাত ভরে ছানার টুকরা আরও কি কি ছিল দিয়ে দিলেন ঠাকুর। অপ্রস্তুত অথচ উৎফুল্ল মুখে শরৎদা উঠে গেলেন। ঠাকুরের উত্তরটা সকলেরই কানে লেগেছিল। এক মুহূর্ত একটু নীরবতা, তারই মধ্যে যোগমায়া দেবীর নির্দেশে নলিনীদা

থালা ভরে নিয়ে এলেন নানা উপচার। হাতায় করে ঠাকুরের পাতে ঢেলে দিলেন পোলাও তরিতরকারির রাশি। আবার আনন্দ-কোলাহলে খাওয়া চলতে লাগল। কে একজন হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, 'শরৎদা কি ভেবেছিলে ঠাকুরের পাত্র খালি হয়ে যাবে তোমায় দিয়ে?' পোলাওয়ের গ্রাস মুখে তুলে শরৎদা নীচুগলায় বললেন, 'ভেবেছিলাম তো!' সেদিনের কথাগুলি কানে ধরা ছিল, অর্থ কিছুই বুঝিনি। পরে শরৎদার সঙ্গে পরিচয় হয়ে নতুন করে সব স্মরণ হয়েছে। শেষ উত্তরটিতে যে একটি স্পর্ধার ভাব ফুটেছে ওইটি শরৎদার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একে অহংকার বলে ভুল করা ঠিক নয়। এ হল ব্রহ্মচারীর বীর্য, হবেই হবে মনের এমনি জোর। শরৎদার মধ্যে এই বীর্য দেখেই ঠাকুর তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মুখে ঠাকুরের একটা পরিচয় পেয়েছিলাম। এখানে সেটুকুও বলি। মঠের স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে শরৎদার স্মৃতিতর্পণ না করলে কৃত্য অসম্পূর্ণ থাকবে আমার।

উদ্ধত বলে শরৎদার মঠে একটা দুর্নাম ছিল। একসঙ্গে দশ-পনের জন থাকলে পরস্পরে মনান্তর অনিবার্য। আর একেক জনের একেকটা বিশেষ দুর্নাম থাকাও বিচিত্র নয়। মানুষ তো দেবতা নয়—তাহলে আর তার সাধন-ভজনের প্রয়োজন কি ছিল? সে যাক, একবার একটা গুরুতর গোলযোগ হল শরৎদাকে নিয়ে। মঠাধ্যক্ষ নিজে নালিশ করলেন তাঁর নামে—ওই ঔদ্ধত্য-অবিনয়েরই নালিশ। ব্যাপারটা যে ঠাকুরের কানে উঠবে প্রথমটায় শরৎদা সে আশংকা করেননি। তাঁর মতে তিনি নির্দোষ। যাই হ'ক, ঠাকুরের কাছে ডাক পড়ায় কিন্তু ভয় পেয়ে গেলেন। মনে জানতেন তিনি বদ্‌রাগী—মঠের অনেকেই বিরক্ত তাঁর উপরে। এবার আবার মঠাধ্যক্ষ স্বয়ং বাদী। কে জানে কি আছে কপালে! ঘরে একা আছেন ঠাকুর—নির্জনে শুনবেন অপরাধীর

বক্তব্য, এইটুকু শুনেই তবু শরৎদা খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। লোকের সামনে মন খুলে ঠাকুরকে কিছু বলতে পারবেন না। কেবল ধমক খেয়ে হয়তো রাগ হয়ে যাবে—তখন অপরাধ আরও প্রমাণ হবে তাঁর। দরজাটা বন্ধ ছিল, ঘরে ঢুকে সেটা আবার টেনে দিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে শরৎদা মাথা তুলতেই গম্ভীরমুখে তিনি প্রশ্ন করলেন 'কি শুনছি তোমার নামে ? এ সব সত্য ?' শরৎদা বললেন, 'তার আগে আমার একটা কথা আছে। ঠাকুর, আপনাকে দেখেই আমি ঘর ছেড়েছি, অন্য কাউকে জানি না। যদি সত্যি কোনও অপরাধ করে থাকি, আপনার কাছে কি ক্ষমা পাব না ঠাকুর ?' ক্ষণপূর্বে যিনি ভ্রূকুটিবদ্ধ ললাটে তামাক খাচ্ছিলেন গম্ভীর মুখে, মুহূর্তে করুণাস্নিগ্ধ হল তাঁর মুখভাব। যেন মন্ত্রবলে উড়ে গেল বজ্রগর্ভ কাল মেঘ। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় পাবি। তোদের শত অপরাধ ক্ষমা করতে না পারি যদি তবে আর ঠাকুর কিসের ?'

শরৎদার মত 'কাঠখোট্টা' ব্রহ্মচারী মঠে খুব কমই ছিলেন। বিশেষণটা আমার নয় দাদামশাইয়ের (শ্রদ্ধেয় ফণীভূষণ মিত্র) দেওয়া। কিন্তু ওই কথা ক'টা বলতে গিয়ে গলা ধরে এসেছিল কাঠখোট্টা ব্রহ্মচারীটির, ছলছলিয়ে এসেছিল দুটি চোখ—নিজে দেখেছি। ওই অভয়মন্ত্রে তাঁর বুক বাঁধা ছিল।

পুরী সম্মিলনীতে সবার কাছে ধিকৃত হয়ে শরৎদা দ্রুতপায়ে ছুটে এসে নীলাচল কুটিরে দোতলায় ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের পাদুকার উপর উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সবাই দোষী সাব্যস্ত করলেও এক জায়গায় তাঁর অনন্ত ক্ষমা নিশ্চিত। শিষ্যের কাছে এই অপার ভালবাসার শক্তিতেই গুরুর যা-কিছু গুরুত্ব। সে শক্তি আমাদের ঠাকুরের ছিল। শরৎদা এই বিশ্বাস নিয়েই দেহ ছেড়েছেন।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার মঠে ঠাকুরকে দীক্ষাদাতার ভূমিকায় দেখলাম, দেখলাম হোম করতে। ওই দিন শচীনদার উপনয়ন হল, সরযূ-মা সন্ন্যাসদীক্ষা পেলেন,—আর দৈবনির্বন্ধে আমি পেলাম মহামন্ত্র। মঠেই দীক্ষা হল আমার।

মঠের আরেক আনন্দস্মৃতি ঠাকুরের সঙ্গে নৌকায় করে বেড়ানো। বিকালবেলা ছোট্ট অরুণায় (ওনা খাল) নৌকা ভাসিয়ে ব্রহ্মপুত্রের দিকে যাওয়া হল একদিন। আর একদিন যাওয়া হল তার বিপরীত দিকে। নৌকার পাটাতনের উপর আসন পেতে দেওয়া হয়েছে ঠাকুরকে —পাশে হুঁকা। তামাক খেতে খেতে ব্রহ্মচারীদের কাছে তিনি গল্প করতে লাগলেন, একবার এই ওনা খালেই নৌকাডুবি হয়েছিল।* তখন যোগানন্দ মহারাজ, শান্তি মা—এঁরা সব ছিলেন। হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাইছেন যোগানন্দ মহারাজ—খোল বাজাচ্ছেন কেউ, করতাল বাজছে। উৎসাহের আধিক্যে বালক-বিভাগের সভ্যসভ্যারা বোধহয় নাচানাচি করছিল। হঠাৎ নৌকা উল্টে সব একেবারে খালে। সেদিন শান্তিমা যোগানন্দ মহারাজ আর ঠাকুর নিজে সাঁতার দিয়ে বাকী সবাইকে টেনে তীরে তুলেছিলেন। একে রাত্রি তায় আসামের ঠাণ্ডা। কিন্তু মায়েদের মুখে শুনেছি ঠাকুর একটুও কাতর হননি সেই শীতে। স্বচ্ছন্দে সাঁতরাচ্ছিলেন জলে। ডুব দিয়ে দিয়ে ডুগি তবলা হারমোনিয়াম সব উদ্ধার করা হয়েছিল। ভৈরবীমা সাঁতার জানতেন না। নির্বিকার মুখে ডুবছেন ভাসছেন, একবার চেঁচিয়েও ওঠেননি। ঠাকুর নাম ধরে ধরে ডাকছেন একেকজনের, তারা সাড়া দিচ্ছে। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন 'যোগমায়া কই? সে তো সাঁতার জানে না!' তখন দেখা গেল হাবুডুবু

* ১১ বৈশাখ ১৩২০ সাল (স্বরূপানন্দজীর দিনলিপি)।

য় স্রোতে ভেসে চলেছেন বড়মা। তাড়াতাড়ি তাঁকে ধরে তোলার .র 'কেন চিৎকার করনি' প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, 'ঠাকুর তো আছেনই। জানি ঠিক টেনে তুলবেন।' ঠাকুরের উপর এতখানি ভরসা আমাদের কিন্তু হত না।

ঠাকুর গল্প করেন বিপদকালে মানুষের কিরকম বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সেই রাত্রে মঠে ছিলেন স্বরূপানন্দজী আর সারদানন্দজী। নৌকা ডুবে গেছে, প্রেমানন্দজী উর্ধ্বশ্বাসে এই সংবাদ দিয়ে বললেন 'একটা আলো আর গোটাকয়েক কলসী নিয়ে আপনারা শীগগীর আসুন।' সারদানন্দজী তাড়াতাড়ি একগোছা পাটকাঠিতে আগুন লাগিয়ে ছুটে আসতে যান নদীর ধারে। হাওয়া লেগে পাটকাঠি নিবে যায়। অর্ধেক পথ এসে তিনি আবার ফিরে যান। এমনি দুবার তিনবার। ঠাকুর বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন, 'সে যা দৃশ্য! চুলগুলো বাতাসে উড়ছে, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে আতঙ্কে। আমরা দেখছি, ও জ্বলন্ত পাটকাঠির বোঝা নিয়ে প্রাণপণে ছুটে আসছে আর দপ্ করে নিবে যাচ্ছে পাটকাঠি। আবার ছুটছে মঠের দিকে। ততক্ষণে আমরা সবাইকে টেনে তুলেছি। ওর এ বুদ্ধি হচ্ছে না যে দেশলাইটা নিয়ে নদীর ধারে আসে।' দৃশ্যটা কল্পনায় দেখে নৌকাশুদ্ধ সবাই হেসে ওঠেন। ঠাকুর বলেন, 'ওদিকে স্বরূপানন্দ কলসী খুঁজে পাচ্ছে না। ব্রহ্মপুত্র হতে ভাল জল আনা হত। কলসী সব জলে ভরা—কোথায় পায় কলসী! এ বুদ্ধি হয় না যে জল ফেলে কলসী নিয়ে যাই।' আবার হেসে উঠি আমরা। ঠাকুর স্মিতমুখে বলেন 'জলটা অনেক দূর থেকে আনা হয় তাই ফেলতে মন চায়নি ওর। কিন্তু এটা কেন মনে হল না যে মানুষগুলি ডুবে মরলে জল খাবে কে?'

সঙ্কীর্ণ নদীর দুধারে ঝোপঝাড়—নদীতে শালুক আর কলমীর দল ভাসছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে ধীরে ধীরে আর ঠাকুর গল্প বলছেন। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আরও অনেকদূর চলুক নৌকা এখনই যেন না ফেরে। এমন সময় কে একজন বললেন, 'এবার ফেরা যাক। সন্ধ্যায় এসব অঞ্চলে বুনো জন্তু বার হয়।' বলতেই ঠাকুর বললেন, 'বাঘ বার হওয়াও বিচিত্র নয়। আর যে ছোট নদী, এসে নৌকায় উঠতে একটুও কষ্ট হবে না।' ছেলেরা হেসে ওঠেন সকৌতুকে। আমি সাতঙ্কে গা ঘেঁষে বসি পিতাঠাকুরের। নৌকা-বিহার মাথায় থাক আমার, এখন ফিরলে বাঁচি।

দ্বিতীয়দিন বেড়াতে গিয়ে হাতীর ডাক শোনা গেল দূরে। অরণ্যচর মাতঙ্গের বৃংহতি যে না শুনেছে সে বুঝবে না কেমন সেই ডাক। অনেকটা জলভরা মেঘের গুড়্ গুড়্ আওয়াজের সঙ্গে মিল আছে—অথচ তারই মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ। সেদিন ঠাকুরই নৌকা ফিরাতে বললেন তৎক্ষণাৎ। বোধহয় সেই দিনই ব্রহ্মপুত্রের দিকে যাওয়া হয়েছিল। দুইপাশে ঘন বন ছায়ান্ধকার। পুরীতে হাতী দেখেছি, তার লম্বা শুঁড় আছে বেশ জানি। নদীর কিনারে এসেই যে শুঁড় বাড়িয়ে টেনে নিতে পারে নৌকা, না বললেও বুঝলাম। একা আমি নই, সবাই ভয় পেয়েছিলেন সেদিন। নিঃশব্দে যত তাড়াতাড়ি হয় নৌকা বাইতে লাগলেন অন্তেবাসীরা। খগেনদা ছিলেন, বোধহয় ঈশ্বরদা গোপালদাও ছিলেন কর্ণধার হয়ে। শরৎদাও হাত লাগিয়েছিলেন সম্ভবত। ঠিক মনে নাই।

নৌকায় বেড়াতে ভাল লাগত সকলেরই। পর পর কয়দিন যেন যাওয়া হয়েছিল বেড়াতে। শেষ দিন প্রচণ্ড বর্ষা নামল মাঝপথে। ভিজে চপচপে হয়ে গেলাম প্রত্যেকে—ঠাকুরও। ফিরে এসেই মা জরে

পড়লেন। সে জ্বর আর ছাড়ে না। বোঝা গেল আসামের ম্যালেরিয়া অথবা কালাজ্বর ধরে বসেছে। মঠ ছাড়ার ব্যবস্থা হতে লাগল এবার। সেটা আষাঢ় মাসের শেষ হবে কিংবা শ্রাবণের প্রথম।

মঠ ছাড়তে রীতিমত কষ্ট হয়েছিল। আরও কষ্ট হল বড়মার কান্না দেখে। আগের দিন হতেই গোপনে চোখ মুছছিলেন। হাসি ছিল না মুখে, বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে ছিলেন। যাবার সময় যত এগিয়ে এল ততই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন তিনি। ঠাকুর জুতা জামা পরে ছড়ি হাতে নিতেই বড়মা প্রায় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। একেবারে হাউ হাউ করে কান্না যাকে বলে। 'কেঁদ না। আবার আসব যত তাড়াতাড়ি পারি'— ঠাকুর সস্নেহ সান্ত্বনায় এইটুকু বলতেই ভাঙা গলায় বড়মা বলে উঠলেন, 'আমায় ভোলাচ্ছ ঠাকুর, আর তুমি মঠে আসবে না। আর কি দেখা পাব তোমার ?'

মাঠ ভেঙে চলেছে গরুর গাড়ী। মাঠ এখন বিল, কোথাও কোমর-সমান কোথাও তার চেয়েও বেশি জল। গরুর গাড়ির পাটাতনটি শুধু জেগে আছে —তারই উপর আমরা বসে আছি। পিছনে প্রাণপণে জল সাঁতরিয়ে আসছে মঠের দুটি কুকুর। ঠাকুর বলতেন মঠের কুকুর-বিড়ালগুলিও ঠিক সাধারণ প্রাণীর মত নয়। মায়ের কাছে অনেক গল্প শুনেছি মঠের কুকুর-বিড়ালদের সম্পর্কে। অন্তেবাসীরাও সেসব জানেন। আমি চোখে দেখলাম একটি প্রসাদভোজী বিড়ালকে। ঠাকুরভোগ না হওয়া পর্যন্ত সে খেত না। বাইরে কোথায় ঘুরত কে জানে? ঠাকুর খেয়ে উঠলেই দেখা যেত দরজার বাইরে সে বসে আছে একপাশে। তিনি খেয়ে উঠে ওকে একদলা ডাল বা তরকারীমাখা ভাত দিতেন

প্রতিদিন। একদিন তাঁর চিবানো ডাঁটার ছিবড়া খেতে দেখলাম ওকে। বিড়ালের ডাঁটা খাওয়াটা আর কোথাও দেখিনি এর আগে। চলে যাওয়ার দিন দেখলাম কুকুরদুটির কাণ্ড। কি কষ্ট করে যে বিল ভেঙে সাঁতরাচ্ছে ওরা! বিলে লম্বা লম্বা আগাছা। তার গায়ে শুঁয়া-পোকার মত একরকম পোকা—ওদের গায়ে, নাকে, চোখে লাগছে সেই পোকা। তবু থামে না। অর্ধেক পথ আসার পর ঠাকুর হাত নেড়ে বললেন, 'যাও ফিরে যাও এবার, আর এস না।' অমনি থেমে গিয়ে মুখ তুলে করুণ আর্তনাদ করে উঠল দুজনে,—আঁ—ও। তারপর আবার সাঁতরাতে লাগল গাড়ির পিছনে।

ক্রমে মঠের গাছপালা মিলিয়ে গেল আকাশের গায়ে। আমার মন কাঁদছে ওই ফুলফলে ঘেরা অপরূপ নন্দনবনের জন্য। কানে বাজছে বড়মার বুকফাটা কান্না—'তুমি আর আসবে না ঠাকুর, আর কি দেখতে পাব তোমায়?'

পিছনে ছপ্‌ ছপ্‌ করে জল ভেঙে দুই কুকুর ছুটছে। ট্রেন এসে গেল। সেবকরা ম্লানমুখে মালপত্রসহ তাঁদের ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে প্রণাম করে সরে দাঁড়ালেন। কুকুরদুটি বসে আছে রেল লাইনের ধারে। ট্রেন ছাড়তেই আবার মুখ তুলে করুণ কান্নার সুরে ককিয়ে উঠল তারা। আড়চোখে চেয়ে দেখলাম আমার সদানন্দ ভোলানাথের মুখেও বিচ্ছেদবেদনার কালো ছায়া। মুখে হাসি নাই, স্তব্ধ গম্ভীর মুখভাব।

সেদিন জানতাম না আসাম মঠ হতে জন্মের মত বিদায় নিলাম। এজীবনে আর দেখব না সেই স্বপ্নপুরী।

*

* *

মঠ থেকে ফিরে হাওড়া ২০৩, পঞ্চাননতলায় দাদামশাইদের ওখানে ওঠা হল। মায়ের জ্বর ছাড়েনি। যদি ম্যালেরিয়াই হয় বিধিমত চিকিৎসা প্রয়োজন। এজন্য পুরী তখন-তখনই ফেরা হল না। কিন্তু হাওড়া আসার কয়েকদিন পরেই মায়ের জ্বর আপনা-আপনি ছেড়ে গেল। ঠাকুর এই সময় হাওড়া হতেই কাছাকাছি এখানে-ওখানে ঘুরে আসতে লাগলেন। পুরী যাওয়া আমাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রইল। তার কারণ কে বা কারা জানি না ঠাকুরকে স্পেশাল ট্রেনে ভারতভ্রমণের কথা শুনিয়েছিলেন। শোনামাত্র ঠাকুর মহারাজ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ভুবনদা ও আর কে কে সঙ্গে যাবে, নিত্য এ নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। গৃহস্থ ভক্তরা কেউ সঙ্গী হতে চান যদি তাহলে তাঁদের আগে থেকে জানিয়ে চিঠিপত্রে সব ব্যবস্থা করার ভারও সম্ভবত ভুবনদা নিয়েছিলেন। এত খুঁটিনাটি আমার মনে নাই। কেবল মনে আছে সেবার কার্তিক মাসের এক সন্ধ্যায় মা, দিদি (সরযূ-মা) ও আমি বাবার সঙ্গে মেহরা কোম্পানীর স্পেশাল ট্রেনে ভারতভ্রমণে রওনা হলাম। আমার মনে আনন্দের সীমা নাই। কত নতুন দেশ কত কি দেখব। কিন্তু মায়েদের দেখলাম একটু চিন্তিত। খাওয়া-দাওয়ার কি রকম ব্যবস্থা করবে ট্রেন-কোম্পানী, ঠাকুরের কষ্ট হবে কি-না এ নিয়ে তাঁদের মনে একটা দুর্ভাবনা ছিল। পরে দেখা গিয়েছিল দুর্ভাবনাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। * * * হাওড়ায় আমরা রাতের খাবার নিয়েই ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন প্রথমে যাবে পুরী, একদিন থাকা হবে সেখানে।

এই ভারতভ্রমণকালে ঠাকুরের কয়েকজন গৃহী ভক্ত সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ঠাকুর ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে।

আমার মনে আছে শুধু মেদিনীপুরের শ্রীঅন্নদা মাইতি ও তাঁর স্ত্রীকে। আর ভুবনদা যে প্রথম থেকেই ছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

পুরী এলাম আমরা প্রায় সাতমাস পরে। একদিন থেকেই রওনা হওয়া আবার। রাজমহেন্দ্রী হয়ে মাদ্রাজ যাবে স্পেশাল। কপালের কর্মভোগ—ট্যাক্সি-বিভ্রাটে পুরীতে আমরা ঠিক সময়ে গাড়ী ধরতে পারলাম না। আমাদের মোটরও ষ্টেশনে এল আর হুইসেল দিয়ে স্পেশালট্রেন প্লাটফরম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এতজন সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও ঠাকুর যে এসে পৌছাননি রেলকর্তৃপক্ষকে বলে কিছুক্ষণ হয়তো ট্রেন আটকানো যেতে পারে—কারও একথা মনে হয়নি। ফলে আর সকলেই রাজমহেন্দ্রীর পথে চললেন, পড়ে রইলাম কেবল আমরা তিনজন আর ঠাকুর। বলাবাহুল্য সঙ্গীদের এই অবিবেচনায় ঠাকুর মোটেই খুশী হননি। তাঁর জলদগম্ভীর কান্তি দেখে আমারই বুক শুকিয়ে যেতে লাগল, হরেনদার তো কথাই নাই। তাঁর চেনা ড্রাইভারকে গাড়ি আনতে বলে প্রথমেই তিনি অপরাধী হয়েছেন। ড্রাইভার ঠিক মত আসেননি। সেদিন ধমক বেশী খেতে হয়নি হরেনদাকে। কিন্তু ওই রুষ্ট অপ্রসন্ন মূর্তি আর ভ্রূকুটিই যথেষ্ট।—অপরাধ তো করেছেন সত্যই, কত কষ্ট হবে মায়েদের ও ঠাকুরের। যাই হ'ক, ছুটাছুটি করে একটু পরে হরেনদা খবর আনলেন সেইদিনই বেশী রাত্রে খুর্দা থেকে যে মাদ্রাজগামী ট্রেন আছে তা ধরে রওনা হলে মাঝপথে স্পেশাল ট্রেন কোন্ ষ্টেশনে যেন ধরা যাবে। অবশ্য রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরী নদী দেখা আর হয়ে উঠবে না।

ব্যাপারটা সুবিধার হল না মোটেই। ভাগ্য ভাল মালপত্র স্পেশালের কামরাতেই ছিল। ছোট সুটকেশ আর ওই রকম টুকিটাকি কিছু নিয়ে মাদ্রাজের পথে রওনা হওয়া গেল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ল বোধহয়

রাত নটা কি সাড়ে নয়টায়। আমরা ট্রেনে এসে খাব বলে বাড়ি থেকে খেয়ে আসিনি। বাবাও সামান্ত জলযোগ করেছিলেন বা তা-ও করেন নি। কিন্তু গাড়ী ফেল করার বিরক্তিতে আর কিছুই খেতে রাজী হলেন না। ধমক দেওয়ার চেয়ে এই নীরব বিরক্তি অনেক বেশী মর্মান্তিক। হরেনদার বিষণ্ণ ম্লান মুখ এখনও মনে পড়ে। একে তো ভারতভ্রমণের সঙ্গী হতে পারলেন না তিনি—সে-ভাগ্য হল ভুবনদার; তার উপর এই বিভ্রাট! 'আমি সঙ্গে গিয়ে আপনাদের স্পেশাল ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে ফিরে আসি'—তাঁর এই অনুনয়ও মঞ্জুর হল না। খুর্দা পর্যন্ত তিনি যাওয়ার অনুমতি পেয়েছিলেন কি-না তা-ও ঠিক বলতে পারব না। একেবারে 'বয়কট' আর কি! তারপর একটা রাত্রি এবং প্রায় পুরা একটি অহোরাত্র যত গরম আর ততই ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে মাদ্রাজের পথে ছোটা। কিন্তু আগেই বলেছি পথের কষ্টে ঠাকুর যে বিচলিত হতেন না চিল্কাতেই তার প্রমাণ পেয়েছিলাম। ভারতভ্রমণের গোড়াতে আবার সেই প্রমাণ পেলাম। মায়েরা সব সহ্য করবেন জানা কথা। বাবাও স্নান-খাওয়া বর্জন করে নির্বিকার গম্ভীরমুখে কেবল টাইমটেবল খুলে যাত্রাপথের হিসাব করছেন দেখে আমি চুপচাপ সব সয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বুঝলাম। প্রায় ছত্রিশঘণ্টা দুর্ভোগ ভুগে কি একটা বড় জংশনে আমাদের মাদ্রাজ মেল এসে দাঁড়াল স্পেশাল ট্রেনের কাছে। সময় হিসাব করে দুই ট্রেন কোথায় কখন মিলতে পারে পুরীতেই সে-সন্ধান ঠাকুর ভাল ভাবে জেনে নিয়েছিলেন। রাত্রি তখন মনে হয় দুটো কি তিনটা হবে। আমাদের নিয়ে ঠাকুর এসে খুঁজে-খুঁজে তাঁর নির্দিষ্ট কামরায় উঠলেন। গাড়ীর চাবি তাঁর কাছেই ছিল এই যা রক্ষা। নইলে অত রাত্রে ভুবনদাদের খোঁজ করতে হত।

মেহরা কোম্পানী প্রথমেই দাক্ষিণাত্য ঘুরিয়ে আনল। মাদ্রাজ কাঞ্জীভরম্ চিঙ্গলপুট (পক্ষীতীর্থ) চিদম্বরম্ কুম্ভকোণম্ তাঞ্জোর ত্রিচিনাপল্লী মাদুরা রামেশ্বরম্ ত্রিপুটী-বালাজী—দক্ষিণে এই সব জায়গার দ্রষ্টব্য আমরা মোটামুটি দেখেছিলাম। পরিব্রাজক অবস্থায় এর বেশির ভাগ তীর্থ ই ঠাকুরের দেখা—তিনি উদ্যোগী হয়ে যেখানে যা বিশেষ বস্তু তা সবই দেখিয়েছিলেন। কাবেরীতে আমরা স্নান করলাম তাঁর সঙ্গে। মাদুরায় বিখ্যাত মন্দির সবচেয়ে বেশী মনে আছে। সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীর গল্প করেছিলেন বাবা। রামেশ্বর থেকে রামঝরকা ও ধনুষ্কোটি দূরে পড়ে। শোনা গেল স্পেশাল ট্রেন অতদূর যাবে না। ধনুষ্কোটি দর্শনীয় স্থান বলে আমাদের অন্যান্য গুরুভাইদের এবং মা দিদি ও আমাকে নিয়ে ঠাকুর লোকাল ট্রেনে করে ধনুষ্কোটি ঘুরে এলেন। সেই পথটা খুব মনে আছে। দুপাশে সমুদ্রের জল জমে আছে—মাঝখান দিয়ে খেলাঘরের মত ছোট গাড়ি চলেছে ধনুষ্কোটিতে। কখনও বা ছোট ছোট ঢেউ খেলে যাচ্ছে দুপাশে। সমুদ্র কিছুটা দূরেই। কিন্তু জায়গাটা নীচু বেলাভূমির মত—অনবরত সাগরের ঢেউ খেলছে সেখানে। দেখতে ভয় করে ভালও লাগে। বেলা তিনটা নাগাদ ঠাকুর ভারত মহাসমুদ্রের কূলে এসে দাঁড়ালেন আমাদের নিয়ে।

সমুদ্রের সঙ্গে আবাল্য পরিচিত আমি। পুরীর সমুদ্র বড় সুন্দর। এমন লহরী-লীলা কোন সমুদ্রে নাই আমি অনেকের মুখে শুনেছি। ধনুষ্কোটির যেখান থেকে জাহাজ ছাড়ে সেখানকার সমুদ্র শান্ত খাড়ির মত। কিন্তু যেদিকে বালুকা-সৈকত সেদিকে সমুদ্রের মূর্তি ভয়ংকর। সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল। হু হু হাওয়ার সঙ্গে প্রকাণ্ড ঢেউ ভাঙছে—সমুদ্রের রং নীল নয় ঘোর কালো। তীরে ঝিনুক কড়ি নাই, প্রবাল

আর ফেনা—ঠিক যেন মানুষের পঞ্জরাস্থি। সব মিলিয়ে এক ভৈরব-ভয়াল পটভূমি। অন্তত আমার চোখে তাই-ই লেগেছিল। কিন্তু ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে বাবা যেরকম একদৃষ্টে এ-দৃশ্য উপভোগ করছিলেন—মনে হল শ্মশানেশ্বরের ভালই লাগছে এই রৌদ্র-সৌন্দর্য। সত্যই নাকি খুব আনন্দ পেয়েছিলেন তিনি। মহাসমুদ্রের কালিঢালা অতল অপার বিস্তার কি তাঁকে একার্ণবের ধ্যানে উদ্দীপিত করেছিল? লিখতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটা কথা না লিখে পারছি না। গিরিশ ঘোষের একটা গান শুনতাম তাঁর মুখে,—

মেদিনী মিশিল তরল সলিলে
তপন শুষিল বারি।
তপন নিভিল অনিল বহিল
বিপুল ব্যোমচারী।
নীরব রব শূন্য শরীরে
শূন্যে শূন্য মিশিল ধীরে,
নিবিড় তিমিরে চেতনা ঝলসে
মায়া-কায়া-অপহারী॥

কী গম্ভীর সুর এ-গানের! তার উপর গায়কের ভাবপ্রসাদে তাঁর কণ্ঠে এ-গান শুনলে বোদ্ধা শ্রোতার চিত্তে অবশ্যই লয়ের ও উপশমের ভাব জাগত। গাইতে গিয়ে ঠাকুরের যে স্পষ্টই ভাবান্তর হত সে তো সেবক-সেবিকাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

মহাপ্রলয়ের এ গান যাঁর প্রিয় ছিল, সেদিন বেলাশেষের সেই গর্জমান কালসিন্ধু তাঁর ভাল লাগাই স্বাভাবিক।

সাতবছরের মেয়ে আমি। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমার চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণাপথের প্রকাণ্ড গোপুরমগুলি

দেখে অবাক হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কিছুই বুঝিনি। ইতিহাসের ছাত্রী হয়ে পরে ওই কাঞ্চী শ্রীরঙ্গম্ চিদম্বরম্ মাদুরা রামেশ্বরের ছবি দেখে কত আপসোস হয়েছে। যাক, আমি নাই-ই দেখি, ঠাকুর মহারাজ কিন্তু বড় আনন্দ পেয়েছিলেন। পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে চারধাম ঘুরেছিলেন, শিল্প-সৌন্দর্য উপভোগের মন ছিল না। বয়েসও অনেক কম ছিল। আজ তিনি বার্ধক্যের দুয়ারে এসে পৌঁছেছেন। মন-বুদ্ধির পরিণতি অনেক বেশী সেদিনের চেয়ে—মানুষ-হিসাবে পূর্ণত্বলাভ করেছেন সব দিক থেকে। নিজেই বলতেন, বেশী দিন বেঁচে থাকা ভাল—কত কি শেখা যায়। তাঁর পড়াশোনা ছিল প্রচুর।—নানা বিষয়ে কৌতূহল ছিল, সাময়িক পত্র-পত্রিকা পড়ে জগতের জ্ঞান আহরণে আলস্য দেখিনি। এই মানুষ যে দক্ষিণের মন্দির-নগরীগুলি দেখে আনন্দে বিস্ময়ে বিভোর হবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। বরং তিনি যা দেখে এত অভিভূত হচ্ছেন তাঁর সঙ্গীরা যে সে-ভাবে এ সব বৈভব দেখে মুগ্ধ হচ্ছে না এই নিয়ে তাঁকে আক্ষেপ করতে শুনেছি। একদিন বলতে শুনেছিলাম, 'কোথায় এসেছিস্, কি যে দেখছিস্ তা-ও তোদের জ্ঞান নাই। তোরা মানুষ না জন্তু কিছু বুঝি না!' রসজ্ঞ এবং বোদ্ধা সঙ্গীর অভাবে ঠাকুরের ঠিক যতখানি উল্লাস হওয়ার কথা তা যেন হত না। একদিকে হিন্দুধর্ম অন্যদিকে তার শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্যপ্রতিভার সমন্বয় ঘটেছে দক্ষিণের প্রতিটি তীর্থে। যাওয়ার আগে ঠাকুর যেন নতুন করে সেই প্রাচীন ভারতকে আরেকবার দেখে যেতে এসেছিলেন। আমরা তো তখন জানতাম না '৩৯ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণে যিনি ভারতভ্রমণ করছেন '৪২ সালের অগ্রহায়ণে তিনি পাড়ি দেবেন লোকোত্তরের পথে!

রাণীগুঞ্জায় এসে ছোট লাইন ছেড়ে বড় লাইনের গাড়ীতে পশ্চিম ভারত রওনা হওয়া গেল। এর মধ্যে একটা কথা বলা হয়নি। দিন বেশ আনন্দেই কাটছিল নিত্য নতুন দেশ দেখে। ঠাকুরের আনন্দটা কী ধরনের তা বুঝি বা না বুঝি নতুনত্বের আনন্দ সবাই পেয়েছি। কিন্তু সে আনন্দ উবে যেত খেতে বসে। প্রতিদিন কাঁকরমেশানো মোটা চালের ভাত অসিদ্ধ অড়হর ডাল আর যত রাজ্যের ওঁচা তরকারী দিয়ে তৈরি একটা ঘ্যাঁট বা লাবড়া খেতে গিয়ে গলা দিয়ে আর গলতে চাইত না। বাবা তরকারীটা নেড়েচেড়ে বলতেন, 'রাঁধুনিরা যেখানে বসে রাঁধে সেখানটা আগে পরিষ্কার করে তবে তো উনুন খোঁড়ে? সেই ঘাস-পাতা জংলাগাছগুলোই দেয় এর মধ্যে। ওই সঙ্গে শুকনো "নরবর" (গোবর গরুর মল অতএব নরবর মানুষের—) পেলেও তা-ও মসলাহিসাবে দেয় হয়তো!' যাই হ'ক তিনি হাসিমুখে ওসব দিয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন আর মায়েরা করতেন হায় হায়! সব জায়গাতেই বাজার-হাট রয়েছে। একটা ষ্টোভ আনলে ঠাকুরকে তাঁরা এ কদন্ন খেতে দিতেন না। আমি যখনকার কথা বলছি তখন চাল ডাল তরকারী সবই ছিল উৎকৃষ্ট অথচ অসম্ভব রকম সস্তা। সেই বাজারে মেহরা কোম্পানী এত খারাপ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল যে তা অবিশ্বাস্য। অথচ মাথাপিছু আড়াইশ' টাকা মতন ছিল টিকিট। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী বলে রাত্রে আমরা একটা কুমড়ার তরকারী চাটনী ও লুচি পেতাম। রাত্রের খাওয়াটা কোন মতে বরদাস্ত করা যেত। তা-ও লুচিতে ময়ান এত কম থাকত যে একেকদিন টেনে ছেঁড়া শক্ত হত। আর তরকারী বলতে অধিকাংশ দিন আলু-কুমড়ার তরকারী। অথচ সময়টা ছিল কফি বেগুন মটরশুটির।

দক্ষিণে কোন একটা জায়গায় ঠাকুর তুঙ্গভদ্রা নদী দেখিয়েছিলেন।* মস্ত বড় বড় পাথরের খণ্ড নদীতে, একেকটা এত প্রকাণ্ড যে গণ্ডশৈল বললেও চলে। সেই সব প্রস্তরখণ্ডে ধাক্কা খেয়েও ঘোর গর্জনে ছুটেছে জলস্রোত। জল খুব বেশী নয় মনে হল কিন্তু দুরন্ত বেগ নদীর—তুঙ্গভদ্রা নামটি তার অন্বর্থ। তীরে দাঁড়িয়ে বাবা অনেকক্ষণ ওই দুর্দমনীয় স্রোতাবর্ত দেখেছিলেন। নাসিকের গোদাবরী ঠিক এর উল্টা—দুই পাড় বাঁধানো, স্বচ্ছ জলধারা বইছে তার মধ্য দিয়ে যেন বড় নালায় জল গড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে বাবা বললেন 'এই নাকি জনস্থান আর পঞ্চবটি? সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র যে গোদাবরীর পদ্মবনে খুঁজতে এসেছিলেন—

"গোদাবরীতীরে আছে কমলকানন।
সেথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ?"

এই নাকি তার নমুনা? বন তো নেই-ই, গোদাবরীকেও তো নদী বলে মনে হয় না রে!' ভুবনদারা কে যেন বললেন, 'রাজমহেন্দ্রীতে গোদাবরী কিন্তু মোটেই এমন শীর্ণকায়া ক্ষীণতোয়া নয়। এখানে উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি বলেই গোদাবরীর এ অবস্থা।' বাবা মন্তব্য করলেন, 'তা ঠিক। আর পদ্ম স্রোতস্বিনীতে হয় না, বদ্ধ জলে হয়। যা ক্ষীণধারা এখানে তাতে কয়েক হাজার বছর আগে এখানে পদ্মবন থাকা আশ্চর্য নয়।'

পুনা নাসিক ঘুরে আমরা বোম্বাই এলাম। বোম্বাইতে এসে আরেকটা দুর্ভোগ ভুগতে হল, এবার তার কথা।

* মাদ্রাজের বেল্লারী জেলায় হাম্পি ও কিস্কিন্ধ্যা বা পম্পাপুরের মাঝখানে তুঙ্গভদ্রার অবস্থিতি।

বোম্বাইতে এসে তৃতীয়বার সমুদ্রদর্শন হল। মাদ্রাজের সমুদ্রতীর খুব সুন্দর। ঝাউয়ের সারি দিয়ে আগাগোড়া তীরভূমি সাজানো। কিন্তু সমুদ্র দেখলে মনে হয় না যে এটা সমুদ্র। স্থির জল পড়ে রয়েছে চাদরের মত—ঢেউ কোথায়? কই সেই উত্তাল মহিমা? পুরীর সমুদ্র দেখে মাদ্রাজের সমুদ্র চোখে লাগে না। রামেশ্বরে গিয়ে ভারত মহাসাগর দেখে সমুদ্র মনে হয়েছিল। বোম্বাইতে আবার সেই মাদ্রাজের পুনরাবৃত্তি। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন জুহু বীচ মেরিন ড্রাইভ এসব ছিল কি-না মনে নাই। তবে সমুদ্রের ধার যে পুরীর মত নিরলঙ্কার বালুকাবিস্তার নয় তা স্মরণ আছে। সমুদ্র তো যেন খেলার সমুদ্র—ঢেউ নাই মাতামাতি নাই। বাবার কাছে শুনলাম মাদ্রাজ ও বোম্বে-উপকূলে সমুদ্র তীরের কাছেই বেশ গভীর, তাই ঢেউ নাই। পুরীতে যেমন মাঝ-সমুদ্রে ঢেউ থাকে না, এখানে সেই নিয়মেই তীরেও ঢেউ ভাঙছে না। এরকম গভীর বলেই মাদ্রাজ ও বোম্বেতে বন্দর হয়েছে, বড় বড় জাহাজ এসে নোঙর করে। অথচ পুরীতে যে সব জাহাজ ধান নিতে আসে তারা তীর থেকে অন্তত দু'মাইল দূরে দাঁড়ায়।

মুম্বা দেবীর মন্দির মালাবার হিল্স্ ভিক্টোরিয়া গার্ডেন হাইকোর্ট—এই দ্রষ্টব্যগুলি বাবার সঙ্গে মোটরে গিয়ে দেখা হয়েছে। দক্ষিণের মন্দিরগুলি আমার যেরকম মনে আছে সে-তুলনায় বোম্বের সবই অস্পষ্ট। বিশেষ কিছুই মনে নাই। অথচ এখনও চোখ বুজলে মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, সহস্র মণ্ডপ, চিদম্বরম্, কুম্ভকোণম্ ও তাঞ্জোরের বিশাল গোপুরম্ স্মৃতিপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। খুঁটিয়ে তার শিল্পসৌন্দর্য গঠনসৌষ্ঠব দেখবার বয়স হয়নি তখন—কিন্তু বিরাটের মহিমা আর গাম্ভীর্য বোধহয় মন টেনেছিল। বোম্বেতে এমন কিছু দেখিনি যা স্মরণীয়। বাবাও তাই বলছিলেন, কি এমন আর দেখলাম! বলতে বলতে ভুবনদার দিকে

ফিরলেন, 'ওরে এখান থেকে এলিফ্যাণ্টা দেখার কি ব্যবস্থা আছে খোঁজ নে তো। মাত্র ছয় মাইল দূরে অমন একটা জিনিস আছে, না দেখে চলে যাব?' ভুবনদা তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে খোঁজ নিতে ছুটলেন। কিছুক্ষণ পরেই এসে খবর দিলেন—'যাতায়াতের লঞ্চ পাওয়া যায়। সকাল আটটা সাড়ে আটটায় রওনা হলে বেলা বারটা একটা নাগাদ ফিরে আসা যাবে।' বোম্বের অন্যান্য দ্রষ্টব্য আমাদের দেখা হয়ে গেছে। তিনদিন বোম্বেতে থাকার কথা। বাবা তখনই ঠিক করে ফেললেন, কাল সকালে এলিফ্যাণ্টা বা হস্তীগুম্ফা দেখতে যাওয়া হবে লঞ্চ ভাড়া করে।

পরদিন সকাল নয়টা নাগাদ লঞ্চ ছাড়ল। মনে হয় একখানা পুরো লঞ্চই রিজার্ভ করা হয়েছিল। আমরা এবং গুরুভাইরাও অনেকে ছিলাম একসঙ্গে। যাবার সময় ভারি ভাল লাগল এই সমুদ্রযাত্রা। শান্ত সমুদ্র যতদূর দৃষ্টি চলে উজ্জ্বল সোনালী রোদে নীল জল ঝিক-মিক করছে। ছোট ছোট পালতোলা নৌকা আর গাংচিল ভাসছে জলে। দূরে বড় বড় জাহাজের মাস্তুল যেন আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। ক্রমে এলিফ্যাণ্টার দিকে এগিয়ে গেল লঞ্চ। ধূসর রঙের পাহাড়টা ঠিক যেন হাঁটু গেড়ে বসা হাতীর পিঠের মতই লাগছে। সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠা হস্তীগুম্ফা দেখে আমার রূপকথার গল্প মনে পড়ে গেল। ঠাকুরমার ঝুলিতে শীত-বসন্তের কথায় আছে ক্ষীরসাগরের জলে খেলা করছে মস্তবড় শাদা হাতী, তার মাথায় ঝলমল করছে গজমোতি। এ হাতীটা অবশ্য শ্বেতহস্তী নয়। কিন্তু ঠিক যেন সাগরজলে আধডোবা হয়ে স্নান করছে। আজ মনে হয় রূপকথার ওই হাতী আর গজমোতি—এলিফ্যাণ্টার অপরূপ শিল্পৈশ্বর্যেরই রূপক নয় তো? বাঙ্গালী যখন সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিত তখন তাদের মুখে মুখে এই হস্তীগুম্ফার বর্ণাঢ্য

বিবরণ ছড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। পল্লীবধূদের মুখে সেই মনোরম বর্ণনাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্ষীরসাগরের শ্বেত হস্তী, মাথায় তার সাত রাজার ধন এক মাণিক।

একটা মজার কথা হল—দার্জিলিঙের নিসর্গদৃশ্য আমায় যেমন নাড়া দিয়েছিল, মানুষের গড়া স্থাপত্য-ভাস্কর্য তেমনটি পারেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে প্রকৃতির শোভা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য—শিশুর চোখেও তার আবেদন আছে। কিন্তু মানুষের শিল্পসৃষ্টি বুঝতে হলে মন-বুদ্ধির পরিণতি চাই। সত্যি কথা বলব, দার্জিলিঙ যেমন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে, ভারতবিখ্যাত হস্তীগুম্ফা স্মৃতিতে তেমন করে ধরা নাই। সমুদ্র-সমতল হতে অনেকখানি উঁচুতে উঠতে হয় সিঁড়ি দিয়ে।—বিরাট তোরণ, বিশাল সব মূর্তি, যা মনে আছে তা এই। আর মনে আছে অধিকাংশ মূর্তিই ভাঙা অঙ্গহীন। কে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে সব তছনছ করে ফেলতে চেয়েছিল।

তারপর একসময় সকলে জগৎপ্রসিদ্ধ ত্রিমূর্তির সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখার মত করে দেখছিলেন ঠাকুর নিজে। তাঁর স্তব্ধ বিস্ময় আর বিমুগ্ধ দৃষ্টি দেখে অন্যরা কথা কইতেও সাহস পান না। ঠাকুর যেন আত্মহারা হয়ে প্রাচীন ভারতের সেই সব অসামান্য কীর্তি দেখছিলেন। আজ সে কথা মনে পড়ে আবার লোভ হয় হস্তীগুম্ফা দেখতে। তা ছাড়া এলিফ্যাণ্টার ত্রিমূর্তি যে সত্যই বিশ্বের বিস্ময়। নিবেদিতা তাঁর 'ফুট ফল্স্ অব ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রী'তে উচ্ছ্বসিত বন্দনা গেয়েছেন হস্তীগুম্ফার। ত্রিমূর্তির কথা বোধহয় আধুনিক ভারত প্রথম তাঁর মুখেই শুনেছে। এ-যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক সমারসেট মম্ তাঁর 'র‍্যাজারস্ এজ' উপন্যাসে এই ত্রিমূর্তিকেই অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি আরেকটি বিদেশিনীকে চিনি, প্রথম জীবনে যিনি নিজে ছিলেন

কলাবিদ্যার ছাত্রী। ভারতবর্ষে এসে হস্তীগুম্ফার ত্রিমূর্তি দেখেই নাকি তাঁর জীবনের মোড় ফিরে যায়। এখন তিনি শিবোপাসিকা এক সন্ন্যাসিনী। স্বীকার করতেই হবে এই ত্রিমূর্তি আমার দেখা হয়নি। কেবল যিনি এলিফ্যাণ্টার ত্রিমূর্তি হরপার্বতী লক্ষ্মীনারায়ণ—বিরাট বিরাট প্রাচীরচিত্র দেখে মূর্তির মত নিথর হয়ে যাচ্ছিলেন থেকে থেকে, তাঁকে দেখেছি। আমার কাছে হস্তীগুম্ফা ভাঙা মূর্তিতে ভরা একটা ছায়ান্ধকার গুহা শুধু।

সঙ্গীরা ফেরার জন্য উসখুস করছিলেন অনেকক্ষণ থেকে। কিন্তু ঠাকুরের ধ্যান ভাঙাবে কে? আমার ওদিকে খিদে পেয়েছে আর তেমনি জলপিপাসা। ভুবনদাকে চুপি চুপি সেকথা বলতে তিনি কয়েকটা চকোলেট আর বিস্কুট এনে দিলেন। ওখানে এ ছাড়া আর কিছু তখন মিলত না, দামও বেশি। কিন্তু জল? একটা ঝর্ণাজাতীয় কি যেন ছিল—চুইয়ে জল পড়ছে তা থেকে। ওখানকার লোক সে জল খেতে বারণ করল—বাবাও নিষেধ করলেন। সুতরাং দুটো চকোলেট মুখে পুরে চুপ করে থাকি। বিস্কুট খেতে সাহস হয় না। দারুণ রোদে এত পিপাসা পেয়েছে যে, জল না খেয়ে ও খেলে বিষম লাগবে। মায়েরা প্রত্যেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছেন এবং বোঝা গেল ঠাকুরও তাই। নিজেদের বোকামিতে নিজেরাই তখন ছি ছি করছেন প্রত্যেকে। চিল্কায় যা হয়েছিল এবারও তাই। কিছুটা খাবার এবং জল সঙ্গে আনা উচিত ছিল।

ফেরার সময় বেড়ানোর আনন্দ উপে গেল। খোলা লঞ্চ—ছাউনি নাই। দুপুরের রোদে তালু ফেটে যাচ্ছে। সঙ্গে এক ফোঁটা জলও যদি থাকতো! কিন্তু সেদিনও ঠাকুরের সহ্যশক্তি দেখলাম। মুখখানা রোদে আর কষ্টে কালো হয়ে গেছে, দরদর করে ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গে।

হলে কি হবে? সামান্ত কারণেই কখনও কখনও যাঁকে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতে দেখেছি, সেদিন তিনি ধীর-স্থিরভাবে সব কষ্ট সহ্য করলেন। সঙ্গে একটা ছাতা ছিল কার একজনের। তিনি সেটা ঠাকুরের মাথায় ধরতে চেয়েছিলেন। ঠাকুর আমায় দেখিয়ে দিলেন। 'ধরতে যদি হয় তো ওর মাথায় ধর—মেয়েটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে গরমে।' সত্যি, রোদে আর পিপাসায় সেদিন যে-কষ্ট পেয়েছিলাম, জীবনে তেমন আর কোনদিন পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। ঠাকুরের কথা আলাদা। বাড়ির বড় ছেলে আর মামাবাড়িতে বাবু-আদরে মানুষ হয়েও এক-দিন স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী হয়েছিলেন যিনি, তাঁর জীবনে অমন কষ্ট তো সেই নতুন নয়! সেদিন বোম্বের সমুদ্রবক্ষে তার আরেকবার প্রমাণ পেলাম। কষ্ট সওয়া এককালে অভ্যাস ছিল সত্যই। নইলে বেলা একটার সময় বোম্বে পৌছে সেখান থেকে ট্যাক্সি ডেকে স্টেশনে গিয়ে কোনমতে মাথা ধুয়ে দুটো নাগাদ নির্বিকারমুখে ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত আর তরকারী-নামে খানিকটা ঘাস-জঙ্গল খেতে পারতেন কি-না সন্দেহ। খেয়ে তামাক টানতে টানতে সহজ ভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগলেন। বেশ মনে আছে সেদিন মায়েরাও ঠাকুরের কষ্টসহিষ্ণুতা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কথাটা লিখতে গিয়ে সক্ষোভে একটা মন্তব্য না করে কিন্তু পারছি না। আমাদের তাহলে ধারণা 'ঠাকুর' হলেই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবেন, কোন কষ্ট সহ্য করা তাঁর ধাতে সইবে না? তাই তো বলি 'মাকে সং সাজালে বল কে শুনি?'

বোম্বে পর্ব এখানেই শেষ।

*

* *

বোম্বাই থেকে বরোদা ডাকোরজি আমেদাবাদ ভিরমগাঁও হয়ে জুনাগড় আসা গেল। এর মধ্যে কবে কোথায় মনে নাই—একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। স্পেশাল ট্রেন ব্রডগেজ মিটারগেজ অনুযায়ী বিভিন্ন ট্রেন ব্যবহার করত। প্রায় ৩।৪ বার আমাদের ট্রেন বদল করতে হয়েছে। সে সময়ে আমরা যে ট্রেনে ছিলাম তাতে প্রতি বগীতে লম্বা একটা করিডর আর তার গায়ে সারি সারি ছোট কামরা—এই রকম ছিল। ঠাকুর যে কামরায় থাকতেন তার পাশেই পড়েছিল এক হিন্দুস্থানী দম্পতীর কামরা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অল্পবয়সী, বোধহয় বিয়েও হয়েছে অল্পদিন। সন্তানাদি নাই। মেয়েটি বেশ সুন্দর দেখতে এবং আনন্দময়ী। স্বামী-স্ত্রীতে ভারি ভাব। ঠাকুর এই ছেলে-মেয়ে দুটিকে সস্নেহ কৌতুকে লক্ষ্য করতেন। তাঁর মুখ থেকেই এসব শোনা। আমার তখন এত বোঝার বয়স হয়নি। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সেই মেয়েটি ব্যাকুলভাবে 'পিতাজী''পিতাজী' বলে ঠাকুরের কাছে দৌড়ে এল। কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে, বেশবাস বিশৃঙ্খল। 'কি হয়েছে মায়ী?' তাড়াতাড়ি উঠে এলেন ঠাকুর। ট্রেন ছাড়ার আর ঘণ্টা-দেড়েক মাত্র দেরী। ওর স্বামী বিকালে বাজারে কি কিনতে গেছে তখনও ফেরেনি, কি হবে? বলে মেয়েটি আরও অস্থির হয়ে পড়ে। 'তোমার কোন ভাবনা নাই মা! বস, আমি লোক পাঠাচ্ছি। ট্রেন যাতে তাকে ফেলে না চলে যায় সে ব্যবস্থাও আমি করব'—বলে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিয়ে নিজে সঙ্গে করে ওকে ওর কামরায় রেখে এসে বাবা ভুবনদায় খোঁজে গেলেন। আগে গার্ডকে এ-বিষয়ে জানানো হল। মেয়েটি একা আর কেউ সঙ্গে নাই। সুতরাং ওর স্বামীকে ফেলে যাওয়া হবে না কিছুতেই—ট্রেনকর্তৃপক্ষ এ আশ্বাস দেওয়ার পর একজন ট্রেন-কর্মচারীকেই সেই ছেলেটির খোঁজে পাঠান হবে ঠিক হল। বাবা

নিজে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কি হল না হল খোঁজ নিচ্ছেন আর এক-একবার নিজে গিয়ে মেয়েটিকে সেসব জানিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন। চোখের জল মুছে স্থির হয়েছে মেয়েটি—একান্ত নির্ভরতায় ঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে শুনছে আর এক একবার তাঁর পায়ের ধূলা নিচ্ছে। এমন সময় ছেলেটি এসে পড়ল। ঠাকুর ভাঙা হিন্দীতে তার বিলম্বের জন্য একটু অনুযোগ দিতেই সে সলজ্জ হেসে বলল, 'কখন ট্রেন ছাড়বে আমি জানি। ও এই রকমই শুধু শুধু উতলা হয়। মিছামিছি আপনার কত তখ্‌লিফ্‌ হল।' 'কিছু তখ্‌লিফ্‌ হয় নি বাচ্চা। কিন্তু ওই লেড়কিকে তুমি বড় কাঁদিয়েছ। ওর কষ্ট দেখেই আমার কষ্ট হয়েছে। আর তুমি ওকে এভাবে কাঁদিও না। কি মায়ী এবার খুশী হয়েছ তো?'—মেয়েটির দিকে ফিরে একথা বলতেই সে তাড়াতাড়ি একটু হেসে আবার প্রণাম করল ঠাকুরকে। 'পিতাজী আপনার বড় দয়া—আজ আপনি না থাকলে আমি ভয়ে ভাবনায় মরে যেতাম'—বলে রাগের ভানে একবার স্বামীর দিকে চাইল। ছেলেটি অপ্রস্তুত হয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। সে এক মজার দৃশ্য। 'যাও ঘরে যাও তোমরা'—বলে প্রসন্নমুখে বাবাও এতক্ষণ পরে যেন হাঁপ ছেড়ে নিজের সিটে এসে বসলেন। তামাক দেওয়া হল তাড়াতাড়ি। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

স্পেশাল ট্রেনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নরেন্দ্রকিশোর মুখার্জীর পরিচয়। ইনি বালিগঞ্জে ৭।২ ইউ জামির লেনের বাসিন্দা ছিলেন। কি সূত্রে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের আলাপ হয় আমি জানি না। তবে শুনেছি তিনি খাসবাটির মুখোপাধ্যায় (চৈতন্য-পার্ষদ শ্রীনিবাস ঠাকুরের দৌহিত্রবংশ) শুনে ঠাকুর নাকি বলেছিলেন, 'পূর্বাশ্রমে ওই মুখোপাধ্যায়-পরিবারেই আমার বিবাহ হয়। ৺বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আমার শ্বশুর ছিলেন। হালিসহর খাসবাটিতেই তাঁদের

বাস ছিল।' নরেন্দ্রকিশোর মুখার্জী কলকাতার বিদ্বৎমণ্ডলীর অপরিচিত নন। ঠাকুর মহারাজ নাকি তাঁর সঙ্গে সাংখ্যদর্শন নিয়ে আলাপ করেছিলেন। নরেন্দ্র মুখার্জী আবার আমাদের গুরুভাই নারাণদার (শ্রীনারায়ণদাস নন্দী) বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনিই আমাকে এ-সংবাদ দিয়েছেন। বেশ কিছুদিন হল নরেন্দ্র মুখার্জী পরলোক গমন করেছেন। আমি তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর পুরাতন ডায়েরী দেখে জেনেছি তিনি মেহরা স্পেশালে সত্যই ঠাকুরের সহযাত্রী ছিলেন।

জুনাগড় থেকে জামনগরে এসে ঠাকুরের একটু জর হল। সেজন্য জামনগরে আমরা আর ট্রেন থেকে নামিনি। জামনগর হয়ে দ্বারকা ও ভেটদ্বারকা এবং প্রভাস যাওয়া হয়। তার পরে আবু পাহাড়। সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে ওঠা খুবই কষ্টকর শুনে এখানেও আমাদের কিছুই দেখা হয়নি। এরপর যাওয়া হল আজমীর ও পুষ্কর তীর্থে। ভুবনদা চেয়েছিলেন পুষ্করে সাবিত্রী পাহাড়ে উঠে সচ্চিদানন্দজীর আশ্রম দেখে আসবেন। কিন্তু সময়াভাবে তা হয়ে উঠেনি। বাবা বললেন, সাবিত্রীর মন্দিরে উঠতে হলেই মাইলখানেক পথ হেঁটে ৩৬০ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে যেতে হবে। সচ্চিদানন্দজীর আশ্রম সাবিত্রীর মন্দির ছাড়িয়েও অনেক দূর। অন্ততঃ পুরা একটা দিন ওখানে তাহলে থাকতে হবে। কিন্তু স্পেশাল ট্রেন মাত্র একদিনই থাকবে পুষ্করে।

এরপর চিতোরগড়, নাথদ্বারা। চিতোরদুর্গ রাণী পদ্মিনীর জহরব্রতের স্থান এখনও আবছা মনে পড়ে। নাথদ্বারায় শ্রীনাথজীর পোষাকের জাঁকজমক মনে পড়ে। মনে পড়ে উজ্জয়িনীর হতশ্রী ধূলাভরা চেহারা আর ক্ষীণকায়া শিপ্রানদী। কার কাছে কবে কালিদাসের উজ্জয়িনী আর শিপ্রার বর্ণনা শুনেছিলাম আজ আর মনে নাই। হয়তো পিতা-

ঠাকুরের কাছেই হবে। বাস্তবের সঙ্গে তার এত প্রভেদ যে উজ্জয়িনী ও শিপ্রাকে ভুলতে পারিনি।

এবার উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ দর্শনীয় স্থান আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন দিল্লী এবং অমৃতসর। এর প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তর মনে আছে। আগ্রার তাজমহল সত্যই আশ্চর্য লেগেছিল। মথুরা বৃন্দাবনের নাম অনেক ছোটবেলা থেকে শুনেছি। রাধা-কৃষ্ণের লীলাভূমি দুটি দেখে উজ্জয়িনী দেখার মতই হতাশ হলাম। যমুনায় দেখলাম প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কচ্ছপ। ভয়ে জলে নামা গেল না। আর কি চেহারা যমুনার—নদী তো নয় ছোট খাল একটা। মঠের ওনা খালের মত। আগ্রাদুর্গ ও দিল্লীদুর্গে অনেক কিছু দর্শনীয় দেখেছিলাম। তার মধ্যে কোনও দুর্গে একটি কামরা মোগলযুগের নকলে সাজানো ছিল, সে একটা দেখার জিনিস বটে। বোধহয় আগ্রাদুর্গেই দেখেছিলাম। আর মনে আছে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। একসঙ্গে অতখানি সোনার জৌলস আর কোথাও চোখে পড়েনি।

অমৃতসর হতে লাহোর। লাহোরে তখন ভীষণ বসন্ত দেখা দিয়েছে বলে স্পেশাল ট্রেন লাহোরে দু'এক ঘণ্টা থেকে একেবারে হরিদ্বার চলে গেল। ব্রহ্মকুণ্ড, নীলধারা কনখল আর গুরুকুল ঋষিকুল বিদ্যালয়ের কথা মনে আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের স্বচ্ছ জলে বিরাট আকারের শোল মাছ ভাসছে। তলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—দেখছি শাদা শাদা কত যে হাড় আর নরমুণ্ডের অবশেষ পড়ে আছে তার ঠিক নাই। নীলধারাও আমার ভারি সুন্দর লেগেছিল। প্রথম দিন এইসব দেখে কথা হল পরদিন লছমনঝোলা ঘুরে আসা হবে।

হরিদ্বারে বেশ শীত তখন। সময়টা অগ্রহায়ণের শেষ বা পৌষের প্রথম হবে। কাজেই শীতের প্রকোপ কেমন বোঝাই যায়। লছমনঝোলা

যাওয়ার দিন সকালে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে দেখা গেল। সেই অবস্থাতেই ঠাকুর সদলবলে বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে হাজির হলেন। হরিদ্বার থেকে লছমনঝোলা পর্যন্ত যে সব বাস যায় তারই একটা রিজার্ভ করা হবে ঠিক হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সব বাসই প্রায় ভর্তি—সম্পূর্ণ একখানা বাসে সশিষ্য ঠাকুর একসঙ্গে যাবেন এমন ব্যবস্থা করা শক্ত। আগের দিন সন্ধ্যাবেলাতেই এ-ব্যবস্থা করতে হত—সকালে দেরী হয়ে গেছে। বিরক্ত হয়ে ঠাকুর নিজে খোঁজ করে একখানা বাসে তিনটি সিট পেয়ে মা সরযু-মা ও আমাকে বাসের ভিতরে দিয়ে নিজে ড্রাইভারের পাশে বসলেন। আমাকে নিয়ে মায়েরা দুজন দুটি সিটে বসেছেন। ভিতরে আর কোন জায়গা নাই বলে ঠাকুর সামনেই উঠে পড়লেন। ভুবনদারাও এইভাবে যে যে-বাসে পারেন যাবেন শোনা গেল। যা হ'ক একটু পরেই আমাদের বাসখানা ছেড়ে দিল।

কপালে আমাদের সেদিন দুর্ভোগ লেখা ছিল। আধঘণ্টা পরেই প্রবল বৃষ্টি আর ঝড় আরম্ভ হল। অনভিজ্ঞতাবশে মায়েরা কেউ প্রচুর শীতবস্ত্র আনেননি। গায়ে একখানি মাত্র সুতীর চাদর তাঁদের। আমার গায়ে কেবল একটি ছোট গরম আলোয়ান। ঠাকুর অলেস্টার গায়ে দিয়ে এসেছিলেন বটে—কিন্তু তিনি তেমনি সামনে বসেছেন। হু হু করে হাওয়া লাগছে সেখানে, বৃষ্টির ছাটে ভিজে যাচ্ছেন। ভিতরে বরং চারদিকে পর্দা ফেলা ছিল। মোটকথা দুর্যোগের জন্য বেলা দশটার পরিবর্তে অতি ধীরে ধীরে চলে বাস বেলা বারটা নাগাত হৃষীকেশ পৌছাল। উঁচু পাহাড়ী রাস্তায় বাস থামল—প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাত নীচে দূরে লছমনঝোলার সেতু ও গ্রাম দেখা যাচ্ছে। সব যাত্রী তাদের ঝোলাঝুলি নিয়ে নীচে নেমে গেল। রইলাম কেবল আমরা চারজন।

সেই দুর্যোগে ওই পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে ঠাকুর নামতে পারবেন না শুনে মায়েরাও কেউ যেতে চাইলেন না। আমি তখন শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছি বলতে গেলে। কেবল বুকটা ছাড়া সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেছে। সরযূ-মা ও মা আমাকে তাঁদের দুজনের দেহের উত্তাপ দিয়ে গরম করতে চাইছেন কোলে চেপে রেখে। তবু কি শীত যায়? ওদিকে ঠাকুরের অবস্থাও তেমনি। অসহ্য ঠাণ্ডায় তাঁর রীতিমত শ্বাসকষ্ট হচ্ছে—চোখমুখ কালো হয়ে গেছে যেন। তবু তারই মধ্যে একবার বাস থেকে নেমে গিয়ে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধা গঙ্গাকে দর্শন করে আমাদের দেখতে ডাকলেন। দেখার জিনিস সত্যই। উঁচু রাস্তা থেকে ত্রিশ চল্লিশ হাত নীচের সে-নদীর ভয়ংকর গর্জন বাসে বসেই কানে আসছিল। চোখে দেখে মনে হল সাক্ষাৎ রুদ্রাণী। পাথর ঠেলে ঘন ঘন আবর্ত সৃষ্টি করে ভীমবেগে ছুটেছেন সুরধুনী। সেদিনের ঝড়ো আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হুঙ্কার তুলছেন গুম্ গুম্ গুম্ গুম্। শাদা ফেনায় ছাওয়া শৈলরাজসুতার বুক—স্রোত দেখে মনে হয় বুঝি কুটাটিও দুখান করে ফেলবে। কিছুক্ষণের জন্য শীতের কামড় ভুলে গেলাম ভীমা ভৈরবীর রূপ দেখে।

আমাদের ধারণা ছিল যাত্রীরা দর্শন করে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরে আসবে। বেলা দুটো বাজে তবু কারও দেখা নাই। তখন ড্রাইভারকে প্রশ্ন করে ঠাকুর যা শুনলেন তাতে মাথা ঘুরে ওঠার কথা। যাত্রীরা নাকি ওইখানে বিশ্রাম করবে। আবহাওয়া ভাল না হলে তারা আজ না-ও ফিরতে পারে। সেই সঙ্গে ড্রাইভার এমন আশংকাও প্রকাশ করল যে বৃষ্টিতে হঠাৎ যদি পথের কোন নদীতে ঢল নামে তবে বাস যাবে কি করে? সুতরাং আজ এখানে থাকার সম্ভাবনাই বেশী। সে অবস্থায় সে-ও নীচে গিয়ে খেয়ে আসবে।

আমাদের সংকল্প ছিল দুপুরে ফিরে আমরা ট্রেনেই খাওয়া দাওয়া করব। সেদিন রাত্রি দশটায় স্পেশাল ট্রেন হরিদ্বার ছাড়বে। কাজেই ফেরা হবে না এ-সংবাদ একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলিয়ে দিল। ড্রাইভারটি পাঞ্জাবী—সে প্রথম হতেই ঠাকুরকে গুরুজী বলে কথা বলছিল। পশ্চিমের লোক কি করে সাধু চেনে জানি না। পাঞ্জাবী-পায়জামা-পরা ঠাকুরকে সে কিন্তু সাধু হিসাবে মান্য করে কথা কইছিল। এখন ঠাকুর ব্যগ্র হয়ে আমাদের অবস্থা বুঝিয়ে বললে ড্রাইভার বিচলিতভাবে যাত্রীদের ফিরিয়ে আনতে চলল। প্রায় পাঁচটা নাগাদ যাত্রীরা ফিরছে দেখা গেল। আমরা তাদের সংকল্প জানতাম না এজন্য সারাদিন অনাহারে থাকতে হয়েছে বলে তারা সকলেই খুব দুঃখ করতে লাগল। মহিলা-যাত্রীরা প্রসাদী ফল ও মিষ্টি বার করে আমাদের খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করতে লাগল। কিন্তু সেই চটকানো ফল-মিষ্টি কণামাত্র খেয়েই ক্ষান্ত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, রুচিতে বাধল। পথে এক দেবমন্দির হতে ড্রাইভার এক ভাঁড় গরম দুধ যোগাড় করে আনল। বাবা সেই দুধ খানিকটা খেয়ে আমাকে বাকীটা দিলেন। সারা দিনের পর ওই যা একটু পেটে গেল। মায়েদের একেবারেই উপবাস। রাত্রি নয়টা আন্দাজ ষ্টেশনে পৌছে গাড়ীতে ওঠা গেল। ভুবনদা নিরুপায় উদ্বেগে ছুটাছুটি করছিলেন। তাঁদের লছমনঝোলা যাওয়া হয়নি—আমাদের বাসই শেষ বাস। দুর্যোগ দেখে আর কোনও বাস সেদিন হরিদ্বার ছাড়েনি। আমাদের কামরায় তিনি খাবার এনে রেখেছিলেন। এসেই খেতে বসা গেল। ওদিকে আমরা পৌছাবার পনের-কুড়ি মিনিট পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল। লছমনঝোলা-যাত্রায় সেবার চরম দুর্ভোগ ভোগ করা হল। এত কষ্ট আর কোন দিন হয়নি, সেইসঙ্গে দুশ্চিন্তা।

লক্ষ্ণৌতে চিড়িয়াখানা দেখেছিলাম মনে আছে। সে হল নৈসর্গিক পরিবেশে পশুপাখীদের রাখার মত চিড়িয়াখানা। বাঘ সিংহ সবই ছাড়া রয়েছে, খাঁচায় নয়। এই Natural Zoo আজকাল অনেক জায়গায় হয়েছে। তখন হয়তো শুধু লক্ষ্ণৌতেই ছিল।

অযোধ্যায় সরযূনদীতে স্নান করা গেল, এলাহাবাদে ত্রিবেণীসঙ্গমে। কাশীতে ছিলাম মাত্র একরাত্রি—খেলনা আর মনোহারী জিনিসে ভরা বিশ্বনাথের গলি ছাড়া অন্য কিছু মনে নাই। গয়াতে গদাধরের পাদপদ্ম দেখে মনে হয়েছিল এ যাঁর পা তাঁর পায়ের গড়ন আমাদের ঠাকুরের মত। তবে তিনি ঠাকুরের চেয়েও দীর্ঘাকার হবেন। বৈদ্যনাথের পেড়া দই মনে পড়ছে, আর কিছু না। প্রায় সারাভারতে এইভাবে একটা পাক খেয়ে পনরই পৌষ আমরা হাওড়া ষ্টেশনে ফিরে এলাম। ষ্টেশন থেকে সুধীরদা (শ্রীসুধীরঞ্জন রায়) তাঁর বেলঘরিয়ার বাসায় এনে তুললেন ঠাকুরকে। সে বাড়ি তখন বেঙ্গল এক্সপোর্ট কোম্পানী নামে পরিচিত ছিল। সুধীরদা মাছধরা ছিপ হুইল ইত্যাদির ব্যবসা করতেন। এই বাড়ির অল্প দূরে ছিল তপোবন নামে একটা বাগানবাড়ি। এই কি কেশব সেনের তপোবন? এইখানেই কি পরমহংসদেব প্রথম দেখেছিলেন কেশব সেনকে? কথামৃততে বেলঘরিয়ার বাগানবাড়ির উল্লেখ আছে।

সুধীরদার পিতৃদেব ৺সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাসাগর কলেজের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃত এবং অঙ্ক—দুটি আপাতবিরোধী বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল তর্কাতীত। ওই দুই বিষয়ে তাঁর লেখা অগণিত বই আজও এদেশে ও বিদেশে সমানভাবে আদৃত। এছাড়া মাছধরা ও খেলাধূলায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। তাঁকে বলা হয় 'বাংলায় ক্রিকেটের জনক'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টার কলেজিয়েট ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ-এর শিল্ড তাঁরই স্মরণে 'এস. রায় মেমোরিয়াল শিল্ড' নামে

বিখ্যাত। বাংলার সুপ্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (ওরফে ৺কামদারঞ্জন রায়) সারদারঞ্জনেরই সহোদর ভাই। এঁদের আদি বাস ছিল ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মসুয়া গ্রামে।

শ্রীসুধীরঞ্জন রায় তাঁর পিতার চতুর্থ সন্তান ও তৃতীয় পুত্র। আমি তাঁকে বিপত্নীক দেখেছি। তাঁর প্রথমা পত্নী বেলা রায় ১৩৩৫ সালে মারা যান। ঠাকুরের চিঠি তৃতীয় খণ্ডে (নং ৫ ও ৬) তাঁর পারলৌকিক সংবাদ আছে। ঠাকুর মহারাজ কি কারণে জানি না সুধীরদার স্ত্রীকে 'শান্তি' বলে ডাকতেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর যখন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল, সুধীরদা ধরে বসলেন 'ওকে একবার দেখাও।' খুব পীড়াপীড়ি করায় ঠাকুর বললেন 'আচ্ছা, সময় হলে দেখবে। কিন্তু না দেখলেই ছিল ভাল।'

এর কিছুদিন পরে দাদাশ্বশুরের আমন্ত্রণে মা ও বোনকে নিয়ে সুধীরদা এলাহাবাদ যান। সেখানে একা ঘরে একদিন জপাদি করছেন, এমন সময় হঠাৎ দেখেন সামনে ঠাকুর! আর, তাঁর কোলে সুধীরদার পরলোকগতা স্ত্রী। ঠাকুর যেন ভ্রূভঙ্গে দেখালেন বেলা তাঁকে চিনতেও পারছে না। এই অলৌকিক দৃশ্য দেখে সুধীরদা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর চিৎকার শুনে বাড়ির লোক ছুটে এসে ঘটনাটা শুনে 'মনের ভ্রম' বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন। সুধীরদা আর বিশেষ কিছু না বলে চুপ করেই গেলেন। কিন্তু দিনকয়েক পরে ঠাকুরের চিঠি এল। তাতে তিনি ঘটনাটা উল্লেখ করে লিখছেন 'অমুক দিন অমুক সময় তুমি আমাকে ও শান্তিকে দেখেছ। সে যে এখন মায়াতীত ভূমিতে আছে এবার তা নিশ্চয়ই বুঝেছ। সুতরাং নিজেও এখন স্বস্থ হতে চেষ্টা কর' ইত্যাদি। এই চিঠি পেয়ে সুধীরদার মা বোন ও দাদাশ্বশুর ঠাকুরকে অপ্রাকৃত শক্তিধর মহাপুরুষজ্ঞানে তাঁর কাছে

দীক্ষা নিতে ব্যগ্র হলেন। কিন্তু ঠাকুর সুধীরদার মা ছাড়া আর কাউকে দীক্ষা দিতে সম্মত হলেন না।

শক্তিদা এ-ঘটনাটি ৺সতীশচন্দ্র মজুমদারের কাছ হতে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সুধীরদার জ্ঞাতিসম্পর্কে ঠাকুরদা বা দাদামশাই। ঠাকুরের সন্ধান তিনিও সুধীরদার কাছেই পেয়েছিলেন।

সুধীরদাকে আমরা বেলঘরিয়ায় আহার-বিহারে ব্রহ্মচারীর মত সংযত জীবন যাপন করতে দেখেছি। ঠাকুরের উপর তাঁর যেমন ছিল বিশ্বাস তেমনি ছিল জোর। 'তুমি' বলে কথা কইতেন। ঠাকুরকে সবসময় পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি ব্যবহার করতে দেখেছি। বেলঘরিয়াতেই সুধীরদা একদিন ঘন গোলাপী মখমলের এক জোড়া চটি এনে তাঁর পায়ে পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'ওই বেঢপ চটি ছাড়। এখন থেকে সবসময় এই চটি পরবে। কেমন মানিয়েছে দেখ দেখি ভুবনদা!' ভুবনদার মুখে তো হাসি আর ধরে না। ঠাকুর আপত্তি তুললেন 'আমার ওই চটিজোড়া কি হবে?' 'ও রেখে দাও—নাহয় আমায় দাও পূজোর ঘরে রাখব।' 'না, চটিজোড়া একটুও ছেঁড়েনি, কেন বাদ দেব রে? থাক, এ আমার পায়খানায় যাওয়ার চটি হবে। কত কালের অভ্যাস এ-চটি পরা, পরতে বড় আরাম।' সুধীরদা জোর দিয়ে বলেন 'এটাতেও আরাম পাবে, দেখনা দু'দিন পায়ে দিয়ে। নরম তুলতুলে বলেই এনেছি ঠাকুর, তোমার পা দুখানা কত নরম তা কি জানি না? এ চটি তোমায় পরতেই হবে। নাহলে তোমার ওই সাবেকী চটি একদিন টান মেরে ফেলে দেব কিন্তু!'—বলে সুধীরদা বেশ হাসতে লাগলেন। তা যে তিনি পারেন, ঠাকুর জানতেন। সুতরাং সেই লাল মখমলের চটিই পায়ে গলালেন অতঃপর। শেষ দিকের ফটোগুলিতে পায়ে ওই চটিজোড়া আছে দেখা যায়। তালতলার চটি তাবলে ঠাকুর ছাড়েননি।

শোয়ার ঘরে বাহারী চটিজোড়া ছেড়ে ফেলে সেই চটি পায়ে দিয়েই প্রাতঃকৃত্য-পর্ব শেষ করতেন। স্নানের পর আবার লাল চটিজোড়া পায়ে উঠত।

সুধীরদার বাড়িতে দোতলায় মস্ত ছাদ আর দুটি ঘর। তার একখানিতে গৃহস্বামী রাত্রিবাস করতেন, অন্যটা খালিই থাকত। দুখানা ঘরই তিনি ঠাকুর ও তাঁর সেবিকাদের জন্য ছেড়ে দিয়ে নীচের ঘরে আশ্রয় নিলেন। বাড়িখানার চারদিকে গাছপালা—একটা বড় পুকুর। সব মিলিয়ে বেশ সুন্দর গ্রাম্য আবহাওয়া আর খোলামেলা। বাড়ি দেখে ঠাকুরের পছন্দই হল। কিন্তু দাদামশাইদের (ফণীবাবু) বাড়ির আড্ডাটা যে সেবার কেন ভেঙে গেল তা আমার জানা নাই। বরাবর সবাই জানতেন কলকাতায় এলে ঠাকুর পঞ্চাননতলাতেই থাকবেন। সেই প্রথম তার ব্যতিক্রম ঘটল। অনুমান করি গুরু-শিষ্যে কোন গূঢ় মানাভিমানই তার হেতু।

সেবার খড়কুসুমায় ভক্তসম্মিলনী হয়েছিল। সকলেরই আশা সম্মিলনীতে ঠাকুরকে দেখবেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঠাকুরছাড়াই সম্মিলনী হল। পূর্ববঙ্গের যেসব বিশিষ্ট ভক্ত দূর থেকে পশ্চিমবঙ্গের শেষ প্রান্তে ছুটে এসেছিলেন, ঠাকুর পনেরই পৌষ ফিরবেন শুনে তাঁদের কেউ কেউ কলকাতায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। ষ্টেশনে তাঁরা ঠাকুরকে প্রণাম করে গেলেন কয়েকজন। বেলঘরিয়ায় তিনি থাকবেন শুনে রাত্রে তাঁরা ওখানে দেখা করতে যাবেন জানালেন।

আমি কোনও ভক্ত-সম্মিলনী দেখিনি। সম্মিলনীতে যে আনন্দসভা হয় তার গল্প শুনেছি বাবার মুখে। সেবার বেলঘরিয়ায় এই আনন্দসভার একটু নমুনা দেখলাম। সে রাত্রিটা আমার খুব মনে আছে।

সন্ধ্যা হতেই নীচের বড় দালানে ঠাকুরের জন্য চেয়ার দিয়ে সুধীরদা বড় শতরঞ্চি পাতার ব্যবস্থা করলেন গুরুভাইদের জন্য। অন্নদা মাইতি, অর্জুন মেট্যা—মেদিনীপুরের গুরুভাই দুজন, কালনার সচ্চিদানন্দ সাহা ও মানুষমুড়িয়ার সচ্চিদানন্দ ভোল—দুই গুরুভাই, এঁরা স্পেশালে সহযাত্রী ছিলেন ঠাকুরের—রাত্রে ভক্তসমাবেশ হবে শুনে তাঁরা হয় ঠাকুরের সঙ্গ ধরে বেলঘরিয়া এসেছিলেন নয় তো কলকাতার আস্তানা হতেই এলেন।

ঠাকুর এসে তাঁর ভ্রমণের গল্প আরম্ভ করলেন। কোথায় এবার নতুন কি দেখলেন, পরিব্রাজক অবস্থায় কি কি দেখা ছিল, এইসব। নতুন দিল্লী তখন মাত্র তৈরী হতে আরম্ভ করেছে। আগেই বলেছি ঠাকুর ছিলেন সুবক্তা। যা-ই বলুন না কেন, বাচনভঙ্গিতে তা গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠত। বেশ কিছুক্ষণ সমাগতদের সম্মোহিত করে রেখে তারপর হুঁকার নল তুলে নিলেন মুখে। তখন শুরু হল অন্যদের অভিযোগ। যতদূর মনে পড়ে মূল বক্তা স্থলের নরেশদা (পাকড়াশী)। বছরে একবার ঠাকুরের সান্নিধ্য পাবেন আশা করেই শীতের মধ্যে পয়সাকড়ি খরচ করে তাঁরা আসেন। ঠাকুর না আসায় তাঁদের কত খারাপ লেগেছে কড়ি-মধ্যমে নরেশদা প্রাণ খুলে জানালেন। আমি তাঁকে দেখলাম সেই প্রথম।

ঠাকুরের শিষ্যরা ছিলেন গত শতকের বাঙালীদের প্রতিভূ। বেশির ভাগই দীর্ঘচ্ছন্দ স্বাস্থ্যবান এবং প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর। নরেশদা তাঁদেরই একজন। আজকাল তেমন লম্বা মানুষ বাংলায় কমই চোখে পড়ে। জাতিহিসাবে বাঙালী ক্রমেই খর্বকায় হয়ে যাচ্ছে। নরেশদা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং যেমন লম্বা তেমনি স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ দেহের অধিকারী। সেই সঙ্গে মাথায় কোঁকড়া চুলের বাবরী, যেটা শহরে তখন কমই চোখে

পড়ত। শুকচঞ্চুর মত নাসিকা নিয়ে মানুষটি যখন আবেগভরে ঠাকুরের দিকে চেয়ে কথা বলতে লাগলেন—চোখমুখ চাপা উচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠেছে—আমার ভারি ভাল লাগতে লাগল। কাঁধে শাল, আভিজাত্য-পূর্ণ চেহারা—দেখলেই তাঁকে দশজনের চেয়ে আলাদা মনে হত। সেই লোক যেন ছেলেমানুষের মত নালিশ করেছেন বাবার কাছে।

নরেশদা ছাত্রাবস্থায় ২৭, ডিষ্টিলারী রোড ঢাকায় ঠাকুরকে প্রথম দেখেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখের কাছে লণ্ঠন ধরেছিলেন চিদানন্দজী—সেই আলোতে ঠাকুরকে দেখে নরেশদার ভাষায় 'পাগল হয়ে গেলাম। অল্পবয়সী মেয়েমানুষ তার মনের মানুষ দেখলে যেমন হয়ে যায়, আমার মনও যেন তেমনি হল। কেবল মনে হয়, আবার দেখব কখন! মনে হয়, আহা, এ-মানুষটি যদি আমার হ'ত!' তিন দিনের বেশী আর দেখার সৌভাগ্য হ'ল না। চতুর্থদিন সন্ধ্যায় এসে শুনলেন ঠাকুর এক ভক্তের (সরুরাম) সঙ্গে আসাম চলে গেছেন। এ যদি ঢাকা-ত্যাগের পর্ব হয় তো সময়টা ১৩১৮ সালের শেষ।

সতের বছর বয়সে নরেশদার এক অদ্ভুত রোগ হল। তিনি প্রঃ রামমূর্তির চেলা ছিলেন। নামকরা পালোয়ান হব মনের বাসনা। লোহার চেন ছিঁড়তেন বুক দিয়ে। একদিন সেই কাজ করতে গিয়ে বুকে মারাত্মক আঘাত লেগে হৃদ্‌যন্ত্র হতে রক্তক্ষরণ শুরু হল। মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা দিনকয়েক পরে বন্ধ হলেও সব সময় আভ্যন্তরীণ রক্তপাত (hemorrhage) চলত। কোনও ডাক্তার তাঁকে সুস্থ করতে পারলেন না। নরেশদা ক্রমে শয্যাশায়ী ও অস্থিকঙ্কালসার হয়ে গেলেন। ফলের রস ছাড়া অন্য কিছু তাঁর হজম হত না। এইভাবে বছরের পর বছর

কেটে গেল। উত্থানশক্তিরহিত নরেশদা প্রায় ৪।৫ বৎসর রোগে ভুগে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

পাকড়াশীরা পাবনা জেলার স্থলের সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ-জমিদারবংশ। 'রাজা' বললে অত্যুক্তি হয় না। পাকড়াশীদের বিরাট অট্টালিকা সুবিস্তীর্ণ রম্য উদ্যান সুউচ্চ বিশাল চণ্ডীমণ্ডপাদি বাংলার ভূম্যধিকারীদের অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দিত। কলকাতার বিডন্ ষ্ট্রীটে এক বাড়িতে নরেশদাকে রেখে তাঁর দাদারা রাজসমারোহে চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। রোগীকে এখন ধরে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়—এতই দুর্বল। সর্বদা সেজন্য দুজন সেবক পালা করে কাছে থাকে। চিকিৎসকরা যখন নিতান্তই নরেশদার জীবনের আশা ত্যাগ করলেন তখন তাঁর মনে হল এবার দৈব ছাড়া পথ নাই। কোনও মহাপুরুষের কৃপায় আরোগ্য লাভ করতে পারেন না কি? অমনি বিদ্যুচ্চমকে ঢাকার সেই নবীন সাধুকে স্মরণ হল। দিব্যবিগ্রহধারী সে মহাপুরুষের যোগবিভূতির কথাও শুনেছিলেন। তখন যে-বন্ধুর কাছে ঠাকুরের সন্ধান পান প্রথমে—গোপনে তাঁকে চিঠি লিখে জানলেন ঠাকুর আলিপুরদুয়ারে রয়েছেন। আলিপুরে নরেশদার সুপরিচিত এক ভদ্রলোকও তখন থাকতেন। জানলেন, তিনিও ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত।

দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় ওই বাসায় মাঝে-মাঝে নরেশদাকে দেখতে আসতেন। তিনি কি মনে করে কে জানে, তাঁর কিছু টাকা-শুদ্ধ একটা মানিব্যাগ নরেশদার বালিশের তলায় রেখেছিলেন। বাড়ির লোককে না জানিয়ে আলিপুরে যাওয়ার জন্য নরেশদা ব্যস্ত হয়ে পড়লেও পাথেয় পাবেন কোথায়? এই সময় হঠাৎ এক দিন বালিশ উল্টাতে গিয়ে ওই টাকাশুদ্ধ মানিব্যাগ নরেশদার হাতে পড়ল। তিনি একে দৈবানুকূল্য ভেবে আলিপুরে পালাতে কৃতসংকল্প হলেন। টাকা যা ছিল

তাতে কলকাতা হ'তে আলিপুরে যাওয়ার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া জুটবে। সামান্য কিছু বেশী থাকবে যা যানবাহন বাবদ লাগতে পারে। আবাল্য সুখলালিত নরেশদা প্রথমশ্রেণী ছাড়া কখনও ট্রেনে চড়েননি। কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতায় আজ তিনি 'যেভাবে হ'ক ঠাকুরের কাছে পৌছাবই' স্থির করে থার্ডক্লাশে যেতেও পশ্চাৎপদ নন।

সেই টাকা ক'টি সম্বল করে যে পোষাকে ছিলেন তার উপরে একটা কোট ও শাল চাপিয়ে গলায় কম্ফর্টার জড়াতে জড়াতে মৃতপ্রায় নরেশদা কেবলমাত্র মনের বলে এক পা দু'পা করে টলতে টলতে ঘর হতে বার হলেন। সময়টা নির্বাচন করেছিলেন এমন—যখন প্রায় সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত। মনে ভেবে রেখেছিলেন কেউ বাধা দিলে বলবেন 'এই কাছেই হেদো, একটু বেড়িয়ে আসি।' যদি সঙ্গী হতে চায় কেউ ? হায়, তবেই সর্বনাশ ! আজ আর যাওয়া হবে না।

আশ্চর্যের কথা, তেমন কিছু ঘটল না। এত দিনের অশক্ত চলচ্ছক্তি-হীন নরেশদা শেষে সত্যই সবার অগোচরে দোতলা হতে একতলা, একতলা হতে পথে গিয়ে পড়লেন। কিন্তু পথে নেমে খানিকটা যেতেই এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। নরেশদাকে দেখে তাঁর তো চক্ষু স্থির ! এ কি ? তাড়াতাড়ি তিনি এসে নরেশদাকে ধরেন—হয়তো ভেবেছিলেন মুমূর্ষু রোগীর এবার বিকার দেখা দিয়েছে। নিরুপায় দেখে নরেশদা তাঁকে সব বলে তাঁরই শরণাপন্ন হলেন। যেভাবে হ'ক আলিপুরে তিনি যাবেনই তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প।

কিছুতেই তাঁকে ফেরানো যাবে না বুঝে সেই আত্মীয়টিই শেষে তাড়াতাড়ি একখানি গাড়ি ডেকে তাঁকে শিয়ালদা স্টেশনে এনে আলিপুরের ট্রেনে তুলে দিলেন। নরেশদা ট্রেনের টাইম বুঝেই বাড়ি হতে রওনা দিয়েছিলেন। এবার ওই আত্মীয়টিকেই বললেন এখন সে

যেন আলিপুরে তাঁর বন্ধুর বাসায় টেলিগ্রাম করে জানায় অমুক দিন অমুক ট্রেনে নরেশদা আলিপুরদুয়ার পৌছাবেন। সেই সঙ্গে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন বাড়িতে যেন এখনই তাঁর পলায়নবার্তা সে না দেয়। তাহলে হয়তো রেলপুলিশের সাহায্যে দাদারা কোনও ষ্টেশন হতেই তাঁকে ধরে নিয়ে যাবেন। তাঁর দুর্দিনের সহায় সেই আত্মীয়টি তখন সাশ্রুনেত্রে বিদায় নিলেন। আর যে নরেশদা ফিরে আসবেন এ তাঁর মনে হয়নি। নিতান্তই নরেশদার কাতর অনুনয় এড়াতে না পেরে সবার অগোচরে এই ভয়ানক দুঃসাহসের কাজে তাঁকে সহায়তা করতে হল।

তখন নাকি পৌষমাস। উত্তর বাংলার হাড়-কাঁপানো শীতে দুই-বার ট্রেন বদল করে অস্থি-চর্মসার নরেশদা শেষ পর্যন্ত কিভাবে আলিপুর-দুয়ারে গিয়ে নামলেন তা গল্পের মতই যেন অবিশ্বাস্য। টেলি পেয়ে তাঁকে নিতে লোক ষ্টেশনে এসেছিল কিন্তু ক্ষীণকায় নরেশদাকে চিনতে না পেরে সে ফিরে যায়। ষ্টেশনে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে এক ভদ্রলোকের দয়ায় একখানা গাড়িতে উঠে নরেশদা গন্তব্যস্থলে এলেন।

ঠাকুরের দেখা মিলল। নরেশদা তাঁকে প্রণাম করে কষ্টে-সৃষ্টে তাঁর পায়ের কাছে বসে থাকেন। বাল্যভোগের একটু প্রসাদ তাঁর হাতে দেওয়া হলে, ঠাকুর সদয় কণ্ঠে বলেন 'এখন বিশ্রাম করগে।' নরেশদার চেহারা দেখে উপস্থিত ভক্ত-সমাজের বাক্য হরে গেছে। এ-মানুষ কলকাতা হতে এতখানি একা এল কি করে? মনে হয় যেন এখনই পড়বে আর মরবে! ঠাকুরের অনুজ্ঞায় নরেশদা অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট স্বরে বলেন 'আমার আর বেশীক্ষণ আয়ু নাই।' ঠাকুর, যতক্ষণ আছি আমি এই আপনার পায়ের কাছেই একটু বসে থাকি? আপনাকে দেখি?'

স্মিতমুখে ঠাকুর ঘাড় নাড়লেন—অন্যদের চোখ ছলছল করতে লাগল। নরেশদা চুপ করে তাঁর পায়ের কাছে বসে অন্যদের সঙ্গে ঠাকুরের কথোপকথন শুনতে লাগলেন।

তারপর? তারপরে যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত। বেলা দু'টা কি তিনটা নাগাদ নরেশদাকে প্রসাদ নিতে বলা হল। একথালা খিচুড়ী, নানারকম ভাজা প্রচুর পরিমাণ পিঠা পায়েস ও ছোট একবাটি ঘি—অর্থাৎ রীতিমত একখানি ভোজের আয়োজন তাঁর জন্য রাখা হয়েছে দেখে মরণাপন্ন নরেশদা সবিস্ময়ে তাঁর পরিচিত বন্ধুটির * দিকে চাইতেই তিনি বললেন, 'এ সব ঠাকুরের প্রসাদ। তুমি খাও, ঠাকুর তোমায় খেতে বলেছেন।' ফলের রস খেয়ে যাঁর হজম হয় না, দু'দিন প্রায় উপবাসী সেই নরেশদা তখন বিনা তর্কে খেতে আরম্ভ করলেন। 'গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্' এই বিশ্বাসে তিনি তখন অনেকটা মরিয়া। দীর্ঘদিন রোগে ভুগে জীবনে হতাশ্বাস মুমূর্ষুর চিত্তে এ-ধরনের নির্ভরতা যে আসে, কেউ-কেউ হয়তো তা জানেন।

খাওয়ার পর নরেশদার মনে একটু ভয় হল। কলেরা হবেই, এ অবধারিত। কিন্তু তাঁর আশঙ্কা মিথ্যা করে ওই প্রসাদ তাঁর পাকাশয় সম্পূর্ণ জীর্ণ করল। প্রসাদসেবান্তে এক ঘুম দিয়ে বিকালে শৌচাদি সেরে নরেশদার মনে হয়, শরীর যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করছেন।

তাঁর রোগ-নিরাময়প্রসঙ্গে ঠাকুর প্রজ্ঞানন্দজীর কাছে বলেছিলেন 'সে কিন্তু আমার কাছে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেনি। কেবল বলেছিল "ঠাকুর এ-জীবনটা তো বৃথায় যায়। কিছুই করতে পারলাম না। শুধুই রোগে ভুগে সারা হলাম। আমার যাতে গতি হয় তাই করে দাও।" '
[শ্রুতিস্মৃতি পৃঃ ১০৫]

* ইনিই বোধহয় আলিপুরদুয়ারের তৌটারেনারী সার্জন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলিপুরেই ঠাকুরের কাছে নরেশদা দীক্ষা পেলেন।* দীক্ষাদানান্তে ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে অনুজ্ঞা করলেন 'প্রণাম কর আমায়'। নরেশদা অনেক চেষ্টায় কোনমতে মাথাটি মাটিতে নোয়ান। কারণ কেবল যে দেহটি কঙ্কালসার তা নয়, পিলেরুগীর মত পেটটি ঠেলে উঠেছে। কাজেই যথাবিধি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করার সাধ্য হয় কই? তখন ঠাকুর আসনে বসে পড়লেন এবং নতশির নরেশদার মাথাটি টেনে এনে সবলে তাঁর কপালখানা নিজের বাম উরু-ন্যস্ত ডান পায়ে 'আচ্ছা' করে ঘসে দিলেন। স্তম্ভিত বিস্ময়ে নরেশদা অনুভব করেন, তাঁর সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল মুহূর্তে। সেই সঙ্গে শুনলেন গম্ভীর অভয়বাণী 'যাও, নিশ্চিন্তে সংসার করগে। সব ভার আমার উপর রইল।'

সে-যাত্রায় আলিপুরে মাস তিনেক কাটিয়ে নরেশদা যখন স্থলে ফিরলেন, তাঁর আত্মীয়রা যেন তাঁকে চিনতে পারেন না। কে বলবে এই সেই উত্থানশক্তিরহিত কঙ্কালসার মানুষ? স্বাস্থ্যের জোয়ার এসেছে দেহে—নীরোগ শরীর। সারস্বত সঙ্ঘ শ্রীনরেশচন্দ্র পাকড়াশীর সেই বীর্যমণ্ডিত বলিষ্ঠ উন্নত বপুই চিরদিন দেখেছেন।

সেদিন যোগেশ্বর গাঙ্গুলী নৃপেন রায় হালিসহরের অমূল্যদা† এঁরা সব ছিলেন মনে পড়ছে। আর কে কে ছিলেন বলতে পারব না। দালান-ভরা লোক ছিল এই-ই মনে আছে। পরে শুনেছি ঠাকুরের প্রত্যাবর্তন সংবাদে শক্তিদাই নাকি বলেন 'তাহলে চলুন কলকাতা গিয়ে "পরিশিষ্ট সম্মিলনী" করে আসা যাক।' সুতরাং তিনিও ছিলেন।

* শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণাশ্রয়লাভে প্রথমাবধি 'নগেন মা' (শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা দেবী) নরেশদার সহায় ছিলেন।

† শ্রীঅমূল্যকুমার দাস।

এই সঙ্গে অমূল্যদার কথাও বলে নিই।* কাশীতে বিশ্বনাথদর্শনের পর অমূল্যদার ভাবান্তর হয়। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে 'সর্বদাই মন হু হু করে, প্রাণের ভিতরে কী একটা অভাব। ভিতরে কী জ্বালা যে, কিছুই ভাল লাগে না···একটা বেগ···স্থির থাকতে দেয় না, কোথায় ঠেলে নিয়ে যেতে চায় যেন।' এর বছরখানেক পরে একদিন শেষরাত্রে তিনি নিজের ঘরে অলৌকিক ভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্ঞানীগুরুমূর্তি দর্শন করেন। হালিসহরে তখন ঠাকুরের চারজন দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। ইতোমধ্যে তারই অন্যতম ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে অমূল্যদার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শন শুনে ফণীদা সানন্দে বললেন 'উনিই তো আমাদের গুরুদেব!' জ্ঞানীগুরুর ফটো দেখে অমূল্যদার মন বলে, 'এই, এই ঠাকুর আমার চাই।'

হাওড়া ফণীবাবুর বাসায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনি প্রথম দেখেন। 'দেখলাম চেয়ে চেয়ে—হ্যাঁ ঠাকুর, এই তো আমার ঠাকুর।'

ঠাকুর বলেছিলেন 'আবার যখন বাংলায় আসব তখন তোকে দীক্ষা দেব।' কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতায় বিলম্ব সহ্য করতে না পেরে অমূল্যদা ঠিক করে ফেললেন তিনি আসাম মঠে গিয়েই দীক্ষা নেবেন। খবর পেয়েছেন, পূজা পর্যন্ত ঠাকুর মঠেই থাকবেন। পথের বিবরণ কেউ কিন্তু দিতে পারলেন না। তাতে কি? অমূল্যদা জপ করেন, ঠিক যাব।

১৩২৯ সাল, আশ্বিন মাস। পূজার ভিড় ট্রেনে। যাবার দুদিন আগে ভোররাত্রে শুনলেন 'ইঞ্জিনের পাশের কামরায় উঠিস্, খালি থাকবে।' একটা ব্যাগে একখানা কাপড় একটা জামা আর গামছা পুরে বাড়ির কাউকে কিছু না বলে অমূল্যদা বার হয়ে পড়লেন।

* বিস্তারিত বিবরণ দ্র. আর্যদর্পণ—১৩৬৬ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।

"গাড়ি এল—সে কী ভিড়, মানুষ চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাচ্ছে ভিড়ে। চারদিক চেয়ে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে যাই। পাশের কামরাটায় সত্যি ভিড় কম। উঠে বসলাম।

"কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হয় না, কি রোগে ধরেছে। অনেকেই জানতে চায় 'ও খোকা কোথায় যাচ্ছ?' কখনও উত্তর দিই না, কখনও বলি 'কোকিলামুখ'। 'সে কোথায়?' মনে মনে বলি জানি না—কিন্তু যাব ঠিক।"

পথে আবার ট্রেনে স্বপ্ন দেখেছেন আসাম মঠ—ঘর বাড়ি পুকুর বাগান গেরুয়া ঝাণ্ডা, পরিষ্কার ছবি একেবারে। আর অজানা অচেনা বলে ভয় নাই। জানেন ঠিক মিলিয়ে নেব এবার।

গোঁসাইগাঁও-তে নেমে গগনদার* সঙ্গ ধরে মঠে রওনা দিলেন। পামবাড়ির কাছে এসে মঠের গৈরিক পতাকা দেখেই মাঠ বিল ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে অমূল্যদা ছুটলেন। মঠে পৌঁছে দেখেন স্বপ্নে হুবহু এই সব দেখেছেন।

পূজার বন্ধ, কলকাতা হতে বহু শিষ্য-ভক্ত এসেছেন সেবার। তাঁদের সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে সেদিন বিকালে (মহাসপ্তমী) গৌরাঙ্গঘরের বারান্দায় ঠাকুরকে অমূল্যদা আবার প্রাণভরে দর্শন করেন।

সবার পিছনে থাকায় মাথায় খাটো অমূল্যদাকে ঠাকুর প্রথমটা দেখতে পাননি। অনেকেই দীক্ষার উমেদারী করলেন, কথা হল নবমী পূজার দিন ঠাকুর সকলকে দীক্ষা দেবেন। প্রণামান্তে একে একে সবাই বিদায় নিতেই অমূল্যদাকে চোখে পড়ল। ঠাকুর বলে উঠলেন, 'কি রে তুই কোথা হতে, কবে এলি?' 'হালিসহর থেকে আজ সকালেই

* শ্রীহট্ট জেলার জগৎসীর গুরুভ্রাতা গগনচন্দ্র দেব।

এসেছি।' 'কি করে এলি? বন্যায় চার দিক ভেসে গেছে···।' অমূল্যদা যে-ট্রেনে এসেছেন সেবার সেইখানাই আসাম আসার শেষ ট্রেন ছিল।

ঠাকুর জানতে চান 'মাকে বলে এসেছিস তো?' 'না।' 'কেন?' তার উত্তর নাই। 'কবে যাবি?' ঠাকুরের এই প্রশ্নে বললেন, 'কাল দীক্ষা পেলে পরশুই যাই।'

অমূল্যদার কথা শুনে ঠাকুর শুদ্ধানন্দজীকে ডেকে বললেন, 'এ ছেলেটা দীক্ষা চায়। কাল কি সময় করে একটু জোগাড় করে দিতে পারবে? তাহলে অন্যদেরও দিয়ে দিই।' 'কেন পারব না ঠাকুর? দেব সব যোগাড় করে··।' অমূল্যদার কল্যাণেই সেবার মহানবমীতে উৎসর্গ না করে শ্রীশ্রীঠাকুর অষ্টমীর শুভলগ্নেই তাঁর বলিগুলি গ্রহণ করলেন।

অমূল্যদাকে ঠাকুর বলেছিলেন 'কাল ব্রহ্মপুত্রে স্নান করে ঠিক সকাল আটটায় আমার কাছে আসবি—দেরি করবি না।' রাত্রে ভয়ে অমূল্যদার ভাল করে ঘুম হয় না। এই বুঝি ভোর হল উৎকণ্ঠায় লাফিয়ে ওঠেন বারবার। ফলে শেষ রাত্রে গভীর ঘুম। হঠাৎ জেগে চারদিক আলো হয়ে গেছে দেখেই গামছা হাতে ব্রহ্মপুত্রের পথে পড়ি-কি-মরি দৌড় লাগালেন। দেখেন অন্যরাও ধীরে সুস্থে এগোচ্ছেন। তিনি এক দৌড়ে নদীতীরে গিয়ে ইকড়ের গোছা ধরে খরস্রোত ব্রহ্মপুত্রে কোনমতে তিনটা ডুব দিয়েই উঠে আবার দৌড়। বাদ-বাকী সবাই তখনও নদীর ধারে এসে পৌছাননি।

এক দৌড়ে মঠে ফিরে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই চোখে পড়ল গৌরাঙ্গ-ঘরের বারান্দায় কপাটে এক হাত আর কোমরে এক হাত রেখে একটু বেঁকে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। মুগ্ধ চোখে চেয়ে অমূল্যদা ভাবেন 'বাঃ, বেশ তো লাগছে। যেন কৃষ্ণের মতই লাগছে যে!' ঠাকুর

বললেন, 'তারা সব কই ?' 'স্নান করতে চলেছেন।' 'এখনও চলেছেন ? তবে তুই-ই আয়। আগে একা তোকেই দীক্ষা দিই।' ভিজা কাপড় গামছা ফেলে রেখে অমূল্যদা এক ছুটে এসে হাজির পরক্ষণে।

ঘরে দীক্ষার যোগাড়-যন্ত্র। 'ঠাকুর যখন তার মধ্যে আসনে গিয়ে অধিষ্ঠান হলেন'—অমূল্যদা উদ্‌ভাসিত মুখে আমায় বললেন 'আঃ তখন শিব বলে আমি কোথায় পালাব ? এ যে মহাশিব !!'

বিনা সাধন-ভজনে অমূল্যদার এই যে সদ্‌গুরুতে জগদ্‌গুরু-দৃষ্টি ভাবগ্রাহী ঠাকুর মহারাজ অসংশয়ে সেটি ধরেছিলেন। তাই মন্ত্র দিয়েই দক্ষিণ তর্জনীটি নিজের দিকে ফিরিয়ে তিনি তাঁর সদ্যোদীক্ষিত এই শিষ্যটিকে বলেছিলেন, 'দেখে নে—ভাল করে দেখ্।' অমূল্যদা বিভোর হয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখেন। আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'কি রে দেখলি ? দেখা হয়েছে ?' চোখ বুজে অমূল্যদা উত্তর দেন 'কিছু কিছু দেখেছি।'

চৈতন্যডোবার আশ্রমাধ্যক্ষ প্রাণকৃষ্ণ দাস বাবাজী অমূল্যদার মায়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন। মায়ের খুব ইচ্ছা তিনি ওই বাবাজীর কাছেই দীক্ষিত হবেন—এটা বুঝেই অমূল্যদা আরও মঠে পালিয়েছিলেন। মঠ থেকে আসার পর বাবাজী একদিন তাঁর ঘাড়ে হাত রেখে কি মন্ত্র পড়লেন কে জানে, তদবধি অমূল্যদার আশ্চর্যরকম এক অন্তর্দাহ উপস্থিত হল, মহা অশান্তি চিত্তে। বাবাজী ওদিকে কৃষ্ণনগরে অমূল্যদার ভগ্নিপতিকে বললেন 'এবার অমূল্যকে আমার কাছে দীক্ষা নিতেই হবে।' অমূল্যদা তাঁর অন্তরের অবস্থা কারো কাছে প্রকাশ করেননি। মাসেক কি মাসদুই পরে বাবাজী এসে প্রশ্ন করলেন 'কেমন আছিস্ ?' অমূল্যদা বললেন, 'বেশ ভালই আছি।' তিনি বললেন, 'অ্যাঁ বলিস্ কি ? তোর কিছু হয় নাই ?' 'না।' 'কিছুই হয় নাই ?'

বার বার তিন বার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। অমূল্যদার ওই এক জবাব, 'না তো!'

ঠাকুর পুরী ছিলেন। মাস কয়েক পরে হালিসহর আশ্রমে এলে অমূল্যদা তাঁকে সব খুলে বললেন। তিনি কোনমতেই বাবাজীর কাছে স্বীয় চিত্তদাহের কথা স্বীকার করেননি শুনে ঠাকুর বলে উঠলেন 'তুই তাঁকে "না কিছুই হয়নি" বলেছিস্?' অমূল্যদা 'হ্যাঁ' বলায় ঠাকুর খুব আনন্দিত হলেন। তারপরই অমূল্যদার সব কষ্টও আপনি চলে গেল।

পরে প্রাণকৃষ্ণ দাসও শ্রীশ্রীঠাকুরকে সর্বশক্তিমান্ সদ্‌গুরু জ্ঞানে খুব শ্রদ্ধা করতেন। 'আমার ঠাকুর সাক্ষাৎ পরমেশ্বর'—অমূল্যদার এই গুরুনিষ্ঠা পাকা হয়েছে কি-না—খুব সম্ভব এটি যাচাই করে নেওয়ার জন্যই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ওই পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। 'যত যন্ত্রণাই পাই, নিরাকরণের জন্য ঠাকুর ছাড়া আর কারও কাছে মুখ খুলব না'—এই সঙ্কল্পে দৃঢ় থেকে অমূল্যদা স্বচ্ছন্দে সে-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

অমূল্যদার মতে 'আমার ঠাকুর সন্তানরক্ষক—অন্তরে-বাহিরে। তাঁর সন্তানদের গায়ে হাত দিতে পারে এমন শক্তি কারও নাই। চাই শুধু কায়মনেপ্রাণে তাঁকে ধরে থাকা!'

এঁদের নিয়েই না ঠাকুর নিগমানন্দের ঠাকুরালি! 'বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর!!'

হাসিমুখে প্রিয়জনদের অনুযোগ-অভিযোগ শুনে নিয়ে ঠাকুর শেষে বললেন, 'তোমরা সম্মিলনীতে আনন্দ করতে পাওনি এবার, সে আমি বুঝতেই পারছি। তা আনন্দ-সভার অধিবেশনটা আজ এখানেই হ'ক। তাহলে তোমাদের ক্ষতি কিছুটা উসুল হবে।'

গৃহস্বামী সুধীরদা সানন্দে সম্মতি দেন—সভায় সকলেই উল্লসিত। তারপর সুরু হল হাসাহাসি। নরেশদার 'গুরুসেবা' এবং অমূল্যদার 'কনে দেখানো'র কাহিনী এ-জীবনে ভুলব না। দুজনেই কিছু কিছু অভিনয় করে দেখালেন কাহিনীটা। যত হাসছেন বাবা, তত দরজার আড়ালে মায়েরা। সভায় তো হাসির ঝড় বইছে। মাদুর কিনতে গিয়ে পূর্ববঙ্গের ক্রেতা যখন দোকানীকে মাদুরের মাপ বললেন, আমি একহাত আর আমার গৃহিণী দেড়হাত চওড়া সেই মাপে মাদুর দিও, তখন হাসির চোটে বাবার চোখে জল এসে গেল। সেই মাদুর কিন্তু গৃহস্থ শেষে গুরুঠাকুরের জন্যই রেখে ছিলেন। আর শীতকালে সেই শীতল পাটিতে শুইয়ে সারারাত ফুলকাটা পাখার বাতাস করে গুরুদেবের সেবা করেছিলেন! 'গুরু হওয়ার ঠেলা আছে' কথাটা যে কত সত্যি গল্পটা শুনে বেশ বোঝা গেল।

রাত্রি প্রায় দশটা নাগাদ সভা ভাঙল। সুধীরদা বোধহয় সকলকেই সে রাত্রে প্রসাদ পেয়ে থেকে যেতে বলেছিলেন। তাঁর বাড়িতে জায়গার অভাব নাই, তিনি নিজে বিপত্নীক আর মজলিশী লোক। ঘরে মানুষ থাকলেই তাঁর হাসি-গল্পের সুবিধা। অনেক রাত পর্যন্ত নীচে হাসির হর্‌রা শুনতে শুনতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন কেউ জানতাম না এ-হাসির পর কি বিভীষিকা আসছে সামনে!

পরদিন সকালে উঠে ঠাকুর বললেন, তাঁর একটু জ্বরভাব হয়েছে। গায়ে যেন ব্যথা। সকলেই মনে করলেন তিনমাস ট্রেনের অনিয়মে শরীর ভিতরে ভিতরে অসুস্থ হয়ে আছে, এ তারই সামান্য বহিঃপ্রকাশ। যাই হ'ক সামনে বসন্তকাল এবং মারীর সময় এই ভেবে সুধীরদা তাঁর পরিচিত ডাক্তার যোগেশ মুখার্জিকে ডেকে আনলেন। তিনি এসে ঠাকুরকে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ বললেন, 'স্বামীজি এটা কিসের

ফুস্কুড়ি আপনার মুখে ?' হাত বুলিয়ে বাবা বল্লেন, 'তাই তো। মশা কামড়িয়েছে বোধ হয়।' ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'উঁহু মশা নয়। দেখুন তো আর কোথাও এরকম হয়েছে নাকি ?' চেয়ে দেখি ভুবনদা সুধীরদা মা দিদি সকলের মুখই যেন কেমন হয়ে গেল। বাবার মুখখানাও যেন শুকিয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি গায়ে বুকে হাত বুলিয়ে হাতখানা দেখে থমকে গিয়ে বললেন, 'এই যে আর একটা।' ডাক্তার তাঁর হাতের পাতাখানা টেনে নিয়ে দেখলেন হাতের চেটোতে আরেকটা ফুস্কুড়ি। সন্ত্রস্তভাবে ভুবনদা ঝুঁকে পড়ে সেটা দেখে বললেন, 'ভাল করে দেখুন ডাক্তারবাবু। মশার কামড়ই তো মনে হচ্ছে।' সবার সঙ্গে আমিও দেখলাম। মশা কামড়ালে যেমন ছোট্ট একটা লালমতন ফুস্কুড়ি ওঠে তেমনিই দেখতে দুটি ফুস্কুড়ি। কিছুতেই অন্য মনে হয় না। তাছাড়া আমি তো বুঝতেই পারলাম না কি রোগের আশংকায় সকলের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। ডাক্তার বললেন, 'ভগবান করুন যেন মশার কামড়ই হয়। তবে সময়টা খারাপ কিনা! আর এঁরও জ্বর, গায়ে ব্যথা বলছেন। ওই উপসর্গ থাকলেই মনে ভয় হয়।'

ষোলই পৌষ সারাটা দিন বাড়ি থমথমে হয়ে রইল। যেন ঝড়ের আগে স্তব্ধ প্রকৃতি। কোথায় গেল আগের দিনের সেই আনন্দ-কলরোল। সকালে উঠেই নরেশদারা সব চলে গেছেন বলে বাড়ি ফাঁকা। তাহলেও লোক কম নাই—কিন্তু সবাই যেন পা টিপে টিপে হাঁটছে। মুখে কথা নাই কারও।

রাত্রি প্রভাত হতেই দেখা গেল ডাক্তারের আশংকা সত্য। ঠাকুরের সারা মুখে গায়ে অগণিত সেই লাল ফুস্কুড়ি দেখা দিয়েছে। সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা প্রবল জ্বর সেই সঙ্গে। জল বসন্ত নয় একেবারে আসল মারী।

বসন্তরোগ এরপর অনেক দেখেছি—নিজেও ভুগেছি। কিন্তু ঠাকুরের যেরকম হয়েছিল এ পর্যন্ত অমন ভয়াবহ বসন্তের আক্রমণ আর দেখিনি। দেখতে দেখতে সমস্ত শরীর গুটিতে ছেয়ে গেল। মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কোথাও আর বাকী ছিল না। মুখখানা ফুলে এমন হয়ে গেল যে চেনা যায় না। গুটিগুলি পুঁজে ভরা বড় বড় ফোসকার মত হয়ে পরস্পরের গায়ে লেগে ঠাকুরের সারা শরীর যেন দগদগে ঘায়ের মত করে তুলল। কিন্তু যাঁর দেহে এ নিদারুণ ব্যাধির প্রকোপ তিনি ধীরভাবে সব সহ্য করছেন। মল-মূত্রত্যাগের সময় বসতে বা বিছানায় শুতেও অত্যন্ত কষ্ট হওয়ার কথা—কারণ শরীরের সর্বত্র ওই সব গুটিতে দারুণ ব্যথা। কিন্তু একদিনও তাঁকে রোগের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে শুনেছি বলে মনে হয় না। প্রথমাবধিই জ্বর ছিল বলে ঠাকুরের নির্বাক স্তব্ধ ভাবটাকে সেবকরা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ভেবেছিলেন। প্রথম দিকে কিছু কিছু অসংলগ্ন কথাও নাকি বলতেন। কিন্তু তিনি সুস্থ হওয়ার পর জানা গেল ধারণাটা সর্বৈব ভুল। তাঁর এই বসন্তরোগের কথা তুলে ঠাকুর বললেন—'তখন আমি নিজের মাঝে এমন গভীরতম প্রদেশে ডুবে যেতাম আর সেখানে এত শান্তি এত নীরবতা যে, আমার যে বসন্ত হয়েছে তা আমি জানতেই পারতাম না—শরীরের জ্বালা কিছু বোধ করতাম না। সে বড় সুন্দর অবস্থা। বাইরে ভুবনরা বলত আমি নাকি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমি জানি আমি কোন সময়ের দরুন অজ্ঞান হইনি। ডিলিরিয়াম বকছি—তখনও দেখছি, আমার সাক্ষী মন দেখছে আমি ডিলিরিয়াম বকছি—কিন্তু জ্ঞানহারা কখনো হইনি।' (জীবনী ও বাণী, পৃঃ ২৪৭-৪৮)

সব সময়ের জন্য যিনি ঠাকুরের কাছে থাকতেন সেই স্বর-মাও কিন্তু ভুবনদাদের কথার প্রতিবাদ করেছিলেন। না, ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান নাই মনে হলেও অজ্ঞান হয়ে যাননি তিনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সর্বদা লক্ষ্য করায় স্বর-মা তাঁর নড়া-চড়া ভাব-ভঙ্গি দেখে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারতেন ভিতরে ঠাকুরের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। নেশার ঘোরে ডুবে থাকার মত কি এক ভাবে বাইরের বোধ তাঁর লোপ পেয়েছে। স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে মা ভাবতেন এ আমাদের ঠাকুরাণীরই দয়া। নইলে এই ভীষণ রোগযন্ত্রণা ঠাকুর সইতেন কি করে? আর প্রলাপ? তার একটা নমুনা দিই। একদিন সন্ধ্যায় উঠে বসতে চাইলেন ঠাকুর 'স্বর, আমায় ধরে বসিয়ে দাও তো।' আস্তে আস্তে তাঁকে বিছানায় বসতে সাহায্য করলেন মা। উঠে বসে গুটিতে ঢাকা দুই চোখের পাতা প্রাণপণে একটু মেলে ধরে ঠাকুর মৃদুকণ্ঠে বললেন 'ঘরে ওরা কারা? এত লোক?' গায়ে মার কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে কি কথা? তিনি ছাড়া আর জনপ্রাণী তো নাই ঘরে। তাড়াতাড়ি সেকথা বলতেই ঠাকুর যেন সবিস্ময়ে আরেকবার চারদিকে ভাল করে চাইতে চেষ্টা করলেন। তারপর একটু পরে আবার নীচুগলায় বললেন 'ঘরে আমায় কোন সময় একা রেখে যেও না। হয় তুমি নয় ভুবন একজন কেউ থেক। আর আজ থেকে যেই থাক না কেন আমার বিছানাটা ছুঁয়ে থেক।' সেই রকম ব্যবস্থাই হল এরপর থেকে। কিন্তু ঘরে লোকদেখাটা প্রলাপ ছাড়া আর কি? ওই রকম একেকটা খাপছাড়া কথা মাঝে-মাঝে বলতেন। আমি তখন নেহাৎ ছোট, তাহলেও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতাম বৈকি! ঠাকুর ভুল বকছেন—যাঁকে সত্যস্বরূপ বলে ভাবি তাঁরও ভুল হয় যে-দশায় সে কী ভয়াবহ দশা? সারা বাড়িতে একটা অব্যক্ত আতঙ্ক আর ভয়ের শিহরণ। সন্ধ্যা হলে বড়রাও শুধু শুধু ভয় পেতেন। মনে

আছে সারা রাত্রি ছাতের ধারে একটা আমগাছে বসে কালপেঁচা ডাকত। সে যে কি দিন সব! অথচ নীচের তলায় ততদিনে সাত আট জন কি তারও বেশী মানুষ এসে গেছেন। নীলমণিদা জিতেনদা নৃপেনদা প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ যোগেশ্বর গাঙ্গুলি চন্দ্রমোহনদা সুধীরদা ভুবনদা আরও কারা সব রয়েছেন। তবু গা ছমছমানি যায় না কারও। বাড়িতে যেন বিভীষিকা ভর করেছে—দম আটকে আসছে তার চাপে।

ডাঃ নিয়োগী নামে একজন বায়োকেমিক চিকিৎসক খুব যত্ন করে ঠাকুরের চিকিৎসা করছিলেন। ক্রমে ঠাকুর সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। তখন একদিন তাঁর মুখেই তাঁর প্রলাপের অর্থ শুনলাম। ঘরের মধ্যে দাড়িওয়ালা পাগড়িমাথায় অনেকগুলি মানুষ প্রায়ই এসে বসত। তারা ওই বেলঘরিয়ার বাড়ির আগানে-বাগানে থাকে, থাকে কাছাকাছি কোন কবরখানায়। অর্থাৎ মানুষ নয়, অশরীরী প্রাণী। কিন্তু হঠাৎ দেখে ঠাকুরও প্রথম তা ধরতে পারতেন না। এজন্য কখনও বা তাদের সঙ্গে কথা কইতে যেতেন। কখনও বা বলে বসতেন 'ঘরে এরা কারা?' ঘরশুদ্ধ সবাই শুনে এ ওর মুখের দিকে চান। ও হরি! তাই ঠাকুরের অসুখের সময় সকলের এত ভয় ভয় করত!

রোগে ঠাকুরকে কাতর হতে দেখিনি কিন্তু কাতর হতে দেখেছিলাম মনোবেদনায়। বসন্ত হওয়ার দুই-একদিন পরেই বোধহয় হাওড়া থেকে দাদামশাই দিদিমণি (ফণীবাবু ও তাঁর স্ত্রী সন্তোষ-মা) এলেন ঠাকুরকে দেখতে। তখনও রোগ তত ভয়ানক হয়ে ওঠেনি, ঠাকুর খাটে শুয়ে আছেন। পরে খাট খুলে মেজেতে বিছানা করা হয়। দিদিমণি কাছে এসে দাঁড়াতেই ঊর্ধ্বস্বরে ডেকে উঠলেন, 'সন্তোষ! মা, আয় আমার কাছে আয় মা।' বসন্তরোগীসম্বন্ধে নানা নিয়ম-কানুন

মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে একটা হল লালশাড়ীপরা পানখাওয়া অবস্থায় তাকে ছুঁতে নাই। দিদিমণি লাল শাড়ী পরে সেদিন আসেননি কিন্তু পান ছিল মুখে। তাছাড়া রাস্তার কাপড়ও বটে। তিনি তাই দূরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ওই ব্যাকুল আহ্বানে তাঁর দুই চোখ জলে ভরে গেল। 'বাবা'—বলে তাড়াতাড়ি কাছে ছুটে আসতেই দুইহাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলের মত বাবা কেঁদে উঠলেন। চেয়ে দেখি বাইরে মাথা হেঁট করে দাদামশাই দ্রুতপায়ে পায়চারী করছেন। ব্যাপারটা তাঁর বুঝতে বাকী নাই। এ একটা নীরব অভিমানের পালা। তিনি তাঁর বাড়ীতে জোর করে সেবার ঠাকুরকে নিয়ে যাননি। বেলঘরিয়ায় সুধীরদার বাসায় এসেছেন ঠাকুর কিন্তু ফণীর উপর অভিমানটি পোষা আছে। চোখের জলে সেই অভিমান সেদিন গলে পড়ল। ঠাকুরের গায়ে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে দিদিমণিও চোখের জলে ভাসতে লাগলেন। ভারি মধুর লেগেছিল সেদিনের সে দৃশ্য। এরপর হাওড়া থেকে দাদামশাই প্রায় প্রতিদিন আসতেন। ঘরের কাজ সেরে সময় পেলে দিদিমণিও সঙ্গ ধরতেন তাঁর। আর আমার ছোটমা (ঢাকার ননী-মা) একেবারে বেলঘরিয়াতেই থেকে গেলেন কিছু দিনের জন্য। ঠাকুরের অসুখ একটু কমের দিকে গেছে দেখে তবে তিনি হাওড়া ফিরে যান।

নৃপেনদা ভাল হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তিনি বাড়ির সকলকে বসন্তপ্রতিরোধক ওষুধ খাইয়েছিলেন।* তবু চন্দ্রমোহনদা আর প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের বসন্ত হল। কিন্তু দিনরাত যাঁরা ঠাকুরের আশে-পাশে থাকতেন সেই ভুবনদা ও মায়ের কিছুই হয়নি। যাক, ঠাকুর

* শেষদিকে তিনিই নাকি ঠাকুরের চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন শুনেছি।

ভাল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবার পনেরই পৌষ রাত্রির মত আনন্দ-সভা জমে উঠল বেলঘরিয়ার বাড়িতে। শিষ্য-ভক্তে সন্ধ্যাবেলা ঘর ভরে যেত। বিছানায় বসেই ঠাকুর তাঁর জীবনকাহিনী বলতে আরম্ভ করতেন। ঘরের এক কোণে আমিও থাকতাম। সেই প্রথম আমি বাবার মুখে তাঁর সম্পূর্ণ জীবন-কথা শুনলাম। সন্ধ্যা হবে কখন সারাদিন এই প্রতীক্ষায় কাটত।

শক্তিদার লেখা হতে জানি ১৩৩৯ সালের অসুখ সম্বন্ধে ঠাকুর নাকি বলেছিলেন 'ব্যাধি দুরন্ত হলে কি হবে? দেখলাম মহামায়া সব দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছেন, যাবার উপায় নাই। আরও কিছুদিন থাকতে হবে।' কিন্তু এই বসন্তরোগ তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিয়েছিল। '৪০ সালে কোনও এক সময় ওই বেলঘরিয়াতেই কানুমামা (অশ্বিনীবাবুর মেজ ছেলে শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত) ঠাকুরের একখানা ফটো তুলেছিলেন। ফটোখানায় আমার কথাটার প্রমাণ মেলে।

বেলঘরিয়ার বাড়িতে ঠাকুরের অনেক শিষ্যকে সেবার চিনলাম। তার মধ্যে হালিসহরের তিনটি শিষ্যের কথা বলার মত। এক জনের কথা শুনেছি। অন্য দু'জনের সঙ্গে আমার ভাল রকম ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। প্রথমে হালিসহরের হরিধনদার কথা বলি। এঁরা দুই ভাই-বোন ঠাকুরের দীক্ষিত শিষ্য-শিষ্যা।

শুনেছি হরিধনদা ঠাকুর আরোগ্যলাভ করার পর দেখা করতে এসেছেন। 'কি হরিধন?' বাবা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেন 'এত দিন দেখা নাই যে? আমার অসুখ শুনে কতজন এল আর তুমি একদিনও এলে না!' হরিধনদা সরল মনে বললেন, 'ঠাকুর রোগটা তো ভাল না। বড় ছোঁয়াচে কিনা তাই আসিনি।' বলতে হবে গুরুকে হরিধনদা চিনতেন। কপটতার চেয়ে অকপট স্বীকারোক্তিই তাঁর মনোমত ছিল।

তিনি প্রসন্নমুখে বললেন 'বেশ করেছ হরিধন। তুমি যে মুখের উপর সত্যি কথাটা এমন অনায়াসে বলতে পারলে এতে আমি খুশী হলাম।' হরিধনদার সরল কথা ক'টির প্রশংসা ঠাকুর অনেকের কাছেই করেছেন। ভক্তির নামে ভান বা কপটতা তাঁর দু'চোখের বালাই ছিল। অনেক সময় নিজের সরলতায় অন্যের কাপট্য ধরতে পারতেন না। কিন্তু এই বলে সকলকেই সাবধান করতেন যে 'আমায় ঠকালেও ফলদাতা অন্তর্যামী যিনি তাঁকে কিন্তু ঠকাতে পারবে না।'

ঠাকুরের অসুখের খবর পেয়ে কিছুদিন পরে বগুড়া হতে শক্তিদারাও এসেছিলেন শুনেছি। হরপ্রসাদদা এবং নটবরদাকে নিয়ে শক্তিদা বেলঘরিয়া গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'এ কি, তোমরা যে এমন সময়ে ?' শক্তিদা উত্তর করেন 'শুনলাম ঠাকুরের অসুখ তাই—' তাঁর কথা শেষ না হতেই ঠাকুর বলে ওঠেন 'এখন বুঝি সুখ দেখতে এসেছ !'

সেদিন বিকালে বেড়াতে যাওয়ার সময় মোটরে উঠতে গিয়ে ঠাকুর শক্তিদা নটবরদা ও হরপ্রসাদদার খোঁজ করলেন। তাঁদের নিয়েই ব্যারাকপুরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিলেন। গঙ্গাতীরে গিয়ে বহুক্ষণ গঙ্গার ধারে বসে তারপর আবার বেলঘরিয়ায় ফিরে এলেন।

নীলমণিদাও হালিসহরের ছেলে। তাঁর উপরে ভার পড়েছিল ঠাকুরকে রেঁধে খাওয়ানো—বেলঘরিয়ার তিনি হয়েছিলেন রান্নাবাড়ির কর্তা। সরলচেতা এই ব্রাহ্মণকুমারটিকেও ঠাকুর ভালবাসতেন। পরে নিজস্ব সেবক হিসাবে নীলমণিদাকে তিনি পুরী নিয়ে যান। তার আগেই আমার সঙ্গে নীলমণিদার ভাব হয়ে গেছে।

*

হালিসহরে ঠাকুরের অনেক ভক্ত-শিষ্যের বাস। অন্যতম ট্রাষ্টি নারায়ণদাস নন্দী ওখানকারই মানুষ। নীলমণিদাও হালিসহরের এক ভক্ত-পরিবারের ছেলে। তিনি ছোটবেলায় অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মচর্য পালন করে তাঁর কাছে থাকলে নিশ্চয়ই নীলমণির স্বাস্থ্য ভাল হবে এই আশ্বাস দিয়ে নীলমণিদাকে ঠাকুর নিজের কাছে রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁর আশ্বাস মিথ্যা হয়নি। ঠাকুরের কাছে থেকে নীলমণিদার স্বাস্থ্য ফিরে গিয়েছিল। অথচ তাঁর কাছে এসে বসে বসে পায়ের উপর পা দিয়ে কেবল দুধে-ভাতে থেকেছেন তা কেউ বলবে না। বেলঘরিয়ায় তিনি নিয়েছিলেন রান্নাঘরের ভার—অর্থাৎ জল তোলা বাটনা বাটা রান্না পরিবেশন অনেক সময় বাসনমাজা, সবই করতে হত। পুরীর বাড়িতে তিনি রান্নাঘরের সহকারী সেবক। নীলাচলকুটিরের চল্লিশ হাত গভীর কুয়া হতে রান্নার জল তোলা কাঠ চেরা এবং আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই তাঁকে করতে হত। বাড়িতে রুগ্ন ছেলেটিকে নিশ্চয়ই এত খাটতে হয়নি! তবু যে তাঁর স্বাস্থ্য ফিরে গেল সে কি তবে প্রসাদের গুণ? প্রসাদ বলতে আমি কিন্তু কেবল লৌকিক অর্থ ধরছি না। প্রসাদসেবনের মহিমা আছে অস্বীকার করব না। কিন্তু চিত্তে প্রসাদগুণ সঞ্চারিত না হলে চার বেলা প্রসাদ খেলেও তা অন্ন-ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছু না হতে পারে। অর্থাৎ আমি যে প্রসাদ খাচ্ছি, এ-বিষয়ে চিত্তের সমনস্কতা চাই। আসল কথা গুরুতে শ্রদ্ধাবুদ্ধি চাই। তাহলেই তাঁর সাহচর্য তাঁর ভুক্তাবশেষ অমৃতপ্রসূ হতে পারে। অনুমান করি ব্রাহ্মণসংস্কারে নীলমণিদার মনে সেটি ছিল। তাই দিনরাত খেটেও ঠাকুরের কাছে থেকে তাঁর শরীর ফিরে গেল। 'নাম চিন্তামণি' একটা কথা আছে,—বড় গভীর কথা। আমার চিন্তার মধ্যমণি হলেই নাম চিন্তামণি। তা নইলে 'প্রোক্ত বর্ণান্ত কেবলাঃ।'

এই সময় হালিসহর আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন জিতেনদা। রন্ধন-বিদ্যায় নীলমণিদার চেয়ে তাঁর নৈপুণ্য ঢের বেশী। কারণ তিনি আশ্রমজীবন যাপন করছেন নীলমণিদার অনেক আগে থেকে। ঠাকুর বেলঘরিয়ায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়া মাত্রই জিতেনদা পাচকের ভূমিকা নিয়েছিলেন। বোধ হয় নীলমণিদা তাঁর সহকারী ছিলেন তখন। তিনি আবার হালিসহরে চলে যাওয়ার পর সম্ভবত নীলমণিদা হাতা-বেড়ি ধরেছিলেন। এ সব আমার ঠিক মনে নাই। তবে জিতেনদা আর নীলমণিদা দুজনকেই যে বেলঘরিয়ার রান্নাঘরে দেখেছি তা মনে আছে।

জিতেনদাকেও সেই প্রথম দেখলাম। তার আগে যদি দেখে থাকি মনে নাই। জিতেনদা ও নীলমণিদাকে আমার খুব ভাল লাগল এই জন্য যে দুজনেই যেন বড় সরল অথচ ঠাকুরকে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করেন। আমি ওড়িশার গুরুভাইদের ছোটবেলা থেকে চিনি। নৃপালদা, লখিন্দরদা, দুর্গাচরণদা—এঁদের যে ভাব দেখেছিলাম মনে হল জিতেনদা আর নীলমণিদার ধরনটা যেন ঠিক তেমনি। এঁরা দুজনেও আড়ালে সেই নৃপালদাদের মত বাবা কি বলছেন কি করছেন কি ভালবাসেন এ-সব জানতে চাইতেন। সে-তুলনায় ভুবনদা কি অন্যান্য মহারাজেরা অন্য স্তরের মানুষ বলে মনে হ'ত। একটু বেশী গম্ভীর, ঠাকুর সম্বন্ধে একটা অভিভাবকত্বের ভাব তাঁদের। এঁদের আমি ভয় করতাম।

জিতেনদার পূর্বাশ্রমের গল্প শুনেছি। সংক্ষেপে বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাপ-মায়ের এক ছেলে জিতেনদা ছোট থেকেই একটু আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন। এটা সচ্চরিত্র পিতার প্রভাবও হতে পারে, জন্মান্তরীণ সংস্কারও হতে পারে। ১৯১৭ সালে ঢাকায় অক্সফোর্ড মিশনে থেকে তিনি পড়াশোনা করতেন। নিরামিষ খাওয়া সৎগ্রন্থ

পড়া আর সাধুদর্শনের ঝোঁক তাঁর আকৈশোর। এজন্য মিশনের কর্তা ভারি ভালবাসতেন তাঁকে। ঢাকাতেই স্বামীবাগে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ভাই হঠযোগী ত্রিপুরলিঙ্গজীকে দেখেছিলেন। ছোটখাট মানুষটি—দেখলে সাধু বলে শ্রদ্ধা হয়। জিতেনদা প্রায়ই যেতেন সেখানে কিন্তু ঠিক মন ভরত না। দৈবের অনুগ্রহে একদিন হষ্টেলে একটি ছেলের হাতে ব্রহ্মচর্য-সাধন নামে একখানা বই দেখলেন। ছেলেটি লুকিয়ে পড়ত বইখানা। কি পড়ে, কৌতূহল হওয়ায় তাকে ধরে বসে জিতেনদা ব্রহ্মচর্য-সাধন আবিষ্কার করে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললেন। পড়ে মনে হল যা খুঁজছিলাম এতদিনে তা পেয়েছি। বাজারে তখন ব্রহ্মচর্য বিষয়ে বই যে না ছিল তা নয়। জিতেনদার ভাষায় 'এমন কোনও ব্রহ্মচর্য-সাধন নাই যে পড়িনি। কিন্তু এ বই পড়ে মনে হল ব্রহ্মচর্য বলতে সব মিলিয়ে কি বোঝায় তা আর কেউ বোঝেনি, ইনিই বুঝেছেন। এমন আর পড়িনি।'

গ্রন্থকারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে মঠে চিঠি দিলেন। চিদানন্দ মহারাজ কি প্রেমানন্দজী তার উত্তর দিয়ে তাঁকে কোনও শাখা আশ্রমে কিছুদিন কাটাতে বললেন। ১৯২২ সালের শেষ দিকে উত্তর বঙ্গে বন্যা হয়। জিতেনদা গিয়ে সেবাকার্যে যোগ দিলেন। তখন বগুড়া আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বরূপানন্দজী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই নবাগত তরুণটিকে তিনি খুব উৎসাহ দিলেন। বললেন, 'এখানে ব্রহ্মচারী হয়ে ঠাকুরের কাজ কর। ক্রমে সব হয়ে যাবে।' জিতেনদার কিন্তু একবার ঠাকুরকে না দেখে তাঁর সঙ্গে কথা না কয়ে আশ্রমে থাকতে উৎসাহ হয় না। ব্রহ্মচর্য পালন ঘরে থেকেও হয়। কিন্তু যাঁর কাজে ঘর ছাড়ব তিনি কেমন না জেনে কি অকূলে ঝাঁপ দেওয়া চলে? একদিন সঙ্গে যা-কিছু জামা-কাপড় ইত্যাদি ছিল সব একজনকে দিয়ে

তার পরিবর্তে পুরীযাত্রার পাথেয় নিয়ে বগুড়া ছাড়লেন। ঠাকুর যে পুরীতে আছেন সে খবরটা জানা হয়ে গেছে।

ঠাকুর তখন গিরিকুটিরে। বিকালে জিতেনদা যখন সেখানে যাচ্ছেন তাঁর পাশ দিয়েই বিমলা-মাসীমাকে নিয়ে ঠাকুর বেড়াতে চলে গেলেন। গিরিকুটিরে ঢুকে ওখানকার সেবকের কাছে ইনিই তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি জেনে জিতেনদা তাড়াতাড়ি পথে গিয়ে ধরলেন। কিন্তু যা কিছু প্রশ্ন করেন মনোমত উত্তর পান না। বলাবাহুল্য ঠাকুর তাঁকে এড়াতে চাইছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জিতেনদার মন খারাপ হয়ে যায়, বড় কষ্ট হয়। কিন্তু হাল ছাড়ার পাত্র নন তিনি। পরদিন আবার গিয়ে ধর্ণা দিয়ে বসলেন গিরিকুটিরে। সে সময় হরিদাসদা আর অশ্বিনীদা (ভজু) ছিলেন সেবক। হরিদাসদা বাজারে গেছেন। অশ্বিনীদা তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। জিতেনদা বসেই আছেন। পাশের ঘরেই খড়মের শব্দ শুনলেন ঠাকুরের, তামাকের গন্ধ ভেসে আসছে। কিন্তু দেখা আর হয় না। হরিদাসদা বাজার এনে রান্নাঘরে ঢুকেছেন—নিশ্বাস ফেলার সময় থাকত না তাঁর। অশ্বিনীদা বাইরের কোন কাজে গেছেন হয়তো। জিতেনদাকে কেউ আর ডাকে না। অস্নাত অভুক্ত জিতেনদা ঠিক জিদ করে বসে আছেন, আমি যাব না। দেখি কি করে ফেরায়। বেলা তিনটার সময় দুপুরের বিশ্রাম সেরে উঠে ঠাকুর নাকি নিজেই খোঁজ করলেন—'একটা ছেলে এসেছিল না? দেখ্ তো আছে না গেছে?' তখন হরিদাসদা এসে ডেকে নিয়ে গেলেন।

তামাক খেতে খেতে ঠাকুর জানতে চান 'কি চাও তুমি?' জিতেনদা এক কথায় উত্তর দিলেন 'আপনার কাছে থাকতে চাই।' প্রার্থনা মঞ্জুর হল না। তিনি বললেন, 'এটা গৃহস্থ-বাড়ি। আমার তিনজন সেবক রয়েছে, আবার একজনকে রাখি কি করে?, তুমি ভাওয়াল আশ্রমে

যাওণ যদি রাখতে না চায় বলবে ঠাকুর বলেছেন তিনি না আসা পর্যন্ত আমায় রাখতে হবে।' গিরিকুটিরে ঠাকুর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে থাকতেন। তবে গৃহস্থ-বাড়ি বললেন কেন এ নিয়ে কারও মনে খট্‌কা লাগতে পারে। কথাটার নিহিতার্থ হল এটা আশ্রম নয়। নীলাচল-কুটিরকেও তিনি অনেক সময় গৃহস্থ-বাড়ি বলে উল্লেখ করতেন। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সহ তিনি একটি ছোট সংসারের কর্তা হয়েই সেখানে থাকতেন। আশ্রমাধীশের ভূমিকা সেখানে তাঁর ছিল না।

যাক, জিতেনদা ভাওয়াল আশ্রমে চলে গেলেন এরপর। যাওয়া সহজ হয়নি। মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে তিনি কেঁদে অস্থির হলেন। দুর্ভাবনায় শেষে তার মূর্ছা হতে লাগল। রাশভারি বাবা মায়ের কাছ থেকে এ-খবর পেয়ে কি যে করবেন, ভয়ে জিতেনদা গা ঢাকা দিলেন একদিন। চারদিকে তাঁর খোঁজ পড়েছে। বাবা-মা ভাবলেন সত্যিই বুঝি ছেলে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মায়ের কষ্ট দেখেই জিতেনদাকে আবার ঘরে আসতে হল। ছেলে যে ঘরে থাকবে না—বাবা বোধহয় বুঝেছিলেন। তেমন বকাবকি কিছুই করলেন না। সেবা-শুশ্রূষায় মাকে একটু সুস্থ করার জন্য মাসখানেক জিতেনদাকে থাকতে হল তাঁর কাছে। তারপর এক অমাবস্যার রাতে বাইরে থেকেই উদ্দেশে মা-বাবাকে প্রণাম জানিয়ে অন্ধকারে মিশে গেলেন।

সে-যুগে ঠাকুরের কাছে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই এক ইতিহাস। বেশীর ভাগই সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে।—ঘরে তাঁদের অভাব ছিল না কিছু। কেউ বাবা-মার একমাত্র সন্তান, কেউ আত্মীয়-পরিজনের বহুসমাদরে লালিত। তবু তাঁরা ঘরে টিকতে পারেননি। শুনে মনে হয় বাঁশি শুনে গোপবধূর সংসার ভুলে বনে ছুটে যাওয়াটা গল্প-কথা নয়। যুগে যুগেই তা ঘটে।

ভাওয়াল আশ্রমে ছেলেকে দেখতে গিয়েছিলেন জিতেনদার বাবা-মা। গিয়ে দেখলেন তাঁদের বড় আদরের একটি মাত্র ছেলে মনের আনন্দে গরু চরাচ্ছে। ছেলে কি চায় কেন সে ঘর ছাড়ল তাঁরা কি বুঝতে পেরেছিলেন? ঠাকুর আরও একদিন জিতেনদাকে প্রশ্ন করেছিলেন 'কি চাস্?' সেবার প্রথম দিনের চেয়েও স্পষ্ট জবাব দিতে আটকায়নি। পরিচয়ের ফলে কুণ্ঠা তখন কেটে গেছে।—মুখের দিকে চেয়ে জিতেনদা বলেছিলেন, 'গোপীরা যেমন ভালবেসেছিল শ্রীকৃষ্ণকে, আমি তেমনি করে তোমায় ভালবাসতে চাই ঠাকুর!'

এই জিতেনদার মুখে ঠাকুরের সম্বন্ধে একটি খবর পেয়েছি যা আমার মতে উল্লেখযোগ্য। এটা ওই বেলঘরিয়ারই ঘটনা। ঠাকুর কেন মায়েদের সেবা নেন. একদিন স্থানীয় এক ভদ্রলোকের এ-ধরণের সমালোচনা শুনে জিতেনদার বড় গায়ে লাগল। সত্যই—সাধুর কাছে কেবল সেবকরা থাকলেই শোভন হয়। সেবিকারা সদা সন্নিহিতা, সাধারণত অনেকেই এটা ভাল চোখে দেখবেন না জানা কথা। এর কি কোনও প্রতিকার করা যায় না?

সেদিন ঠাকুর বেড়িয়ে আসার পর জিতেনদা নিজে গেলেন তামাক দিতে। হাতে নল তুলে দিয়ে বললেন 'আমার কয়েকটা কথা আছে।' সেই লোকটির বক্তব্য শুনিয়ে আক্ষেপের সঙ্গে বললেন, 'আমার এসব সহ্য হয় না ঠাকুর। কেন তুমি মায়েদের কাছে রেখেছ? আমরা কি তোমার সেবা করতে পারি না?' ঠাকুর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন জিতেনদার অভিযোগ। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, 'দেখ বাবা, আমি চিরকাল এই ভাবে চলে এসেছি। বুড়ো বয়সে কি আর স্বভাব বদলাতে পারব? তার চেয়ে বরং তুই চলে যা—এ ঠাকুরকে তোর যদি ভাল না লাগে!' এই অকুণ্ঠিত এবং বলতে পারি স্পর্ধিত উত্তরে

জিতেনদা প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রাগ হল না একটুও। কারণ বক্তা শান্ত স্থির স্বরে তাঁর যা বলার বলেছেন। সে-তুলনায় জিতেন-দার উষ্মাই যেন বিসদৃশ। বিস্ময় কাটতেই লজ্জা হয়। ঠাকুর তাঁকেই চলে যেতে বলেছেন, যেন তিনিও নিন্দুকদের সমগোত্রীয়! তা নইলে কি বলে ঠাকুরের চাল-চলনের সমালোচনা করতে গেলেন? প্রণাম করে অপরাধ স্বীকার করেন জিতেনদা। না, তাঁর এই ঠাকুরই ভাল। এঁকে ছেড়ে আর কোথাও যাবার কথা ভাবতেও পারেন না।

১৩৩৯ সালটা ঠাকুরের বাইরে ঘুরেই কেটেছিল। বসন্তরোগ থেকে ভাল হয়ে উঠে কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করতেই তিনি পুরী ফেরার আয়োজন করতে লাগলেন। মাসখানেকের মধ্যেই তাঁর মুখ ও সর্বাঙ্গের ক্ষতচিহ্ন সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেল। বোধহয় চোখের নীচে কোন দিকের গালে একটা ছোট দাগ ছিল আর কোথাও নয়। যাওয়ার আগে আমাকে কিন্তু এবার নির্বাসনদণ্ড দিয়ে গেলেন। স্থির হল হাওড়া বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Class II) আমায় ভর্তি করে দেওয়া হবে। মা আমায় নিয়ে দাদামশাইয়ের বাড়িতে থাকবেন। ফাল্গুন মাসে হাওড়ায় আমাদের রেখে সরযূ-মাকে এবং নীলমণিদাকে নিয়ে ঠাকুর পুরী চলে গেলেন। যাওয়ার আগে সেই পূর্বোল্লিখিত ডাক্তার শ্রীযোগেশ মুখার্জির পরামর্শে আমার টনসিল অপারেশন করিয়ে দিলেন। ছোট থেকেই খুব সর্দিকাশিতে ভুগতাম। তারপর ডিপথিরিয়া হয়। টনসিল খুব বড় হয়ে পেকে উঠেছিল। আমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে অপারেশন করে টনসিল কেটে আবার বেলঘরিয়ায় আনার ব্যবস্থা করলেন। বলা বেশীর ভাগ, তাঁর প্রধান সেবক

ভুবনদার উপরেই এ-ভার পড়েছিল। পরমাত্মীয়ের মত অতি যত্নে ভুবনদা আমায় নিয়ে ডাক্তার দেখানো হাসপাতালে আনা সব করেছিলেন মনে আছে। এই বেলঘরিয়াতেই ভুবনদাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনলাম। হরিদাসদার স্নেহ পেয়েছিলাম অজ্ঞানে। কিন্তু জ্ঞান হওয়ার পর হরেনদা ও ভুবনদার কাছে যে-স্নেহ পেয়েছি তা কখনও ভুলব না। সোদরাকে মানুষ এর চেয়ে বেশী মমতা করে না। অপারেশনের ধাক্কা সামলিয়ে আমি উঠে বসতেই আমাদের হাওড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ২৪ ফাল্গুন ঠাকুর পুরীতে পৌছে ২০৩ নং পঞ্চাননতলা রোডে লিখলেন—

'গত কল্য প্রাতে ঠিক সাতটার সময় বাড়ি আসিয়া পৌছিয়াছি। * * * * ভিতর বাহির চূণ ও দরজা জানলাগুলিতে গাঢ় সবুজ রং দেওয়ায় বাড়িটা নতুন বাড়ির ন্যায় সুন্দর দেখাইতেছে। এই লোভে লীলা পুরী আসিতে চাহিত। লীলার ঔষধ দিয়া আসিয়াছি। ওই ঔষধের কভারের মধ্যে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র দিয়াছি। (লীলাকে) ভুলাইয়া বুঝাইয়া স্কুলে পাঠাইও। ওখানে রেখে আসা যেন ব্যর্থ না হয়।'

এরপর ১৭ই চৈত্র দাদামশাইকে লেখা একখানা চিঠি আছে দেখছি। স্কুলের জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে আমমোক্তারনামা নিয়ে কি যেন গোলমাল হয়েছিল। দাদামশাইকে কাজটার ভার দিয়ে লিখেছেন—

'আমার কাজের জন্য তোমাকেও কম হয়রান হইতে হয় না। কি করিবে? আমার আর কে আছে?'

দাদামশাইকে তিনি কি রকম আত্মীয় জ্ঞান করতেন এই দুটি ছত্রে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। এ চিঠির উল্টা পিঠে রয়েছে—

স্নেহের লীলু,

এখনি তোমার চিঠি পেলাম। এবার বড় ভাবনা হয়েছিল। এত দেরী করে চিঠি লিখ না। আমি আগের মত বেশ ভাল হয়েছি। রোজ

এক মাইল করে সমুদ্রধারে হেঁটে বেড়াই। তোমার পড়াশোনার খবর শুনে আনন্দিত হলাম। যা ইচ্ছা হয় তা খেতে পাও ত? আমরা এখানে খুব আমভাল থাচ্ছি। আমার স্নেহ ভালবাসা জেন, সকলকে আশীর্বাদ দিও। ইতি—

তোমার আদরের ছেলে

এর মধ্যে ওড়িশার ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। বিকালে তাঁরা তো আগে থেকেই প্রতিদিন আসতেন। এখন ঠাকুর প্রায়ই ওঁদের সঙ্গে আলাপ করেন। সন্ধ্যায় তিনি উপরে বিশ্রাম করতে যাওয়ার পরও নীলমণিদা ও হরেনদাকে ঘিরে বাইরের রোয়াকে আসর বসে। নীলমণিদা সহকারী হওয়ায় হরেনদার কাজ কিছু হাল্‌কা হয়েছে। তাই সান্ধ্য বৈঠকে ছেলেদের ফল-মিষ্টি প্রসাদ দিয়ে বেশ ধর্মালোচনা চলে। ফলে দুর্গাচরণদাদের সাহস বেড়েছে। ১৩৩৯ সনের ফাল্গুনেই তাঁরা সমবেতভাবে ঠাকুরের কাছে দীক্ষা চেয়ে বসলেন। সেদিনের কথা নীলাচল-বাণীতে ধরা রয়েছে। অল্পবয়সী ছাত্রকয়টির প্রস্তাব শুনে ঠাকুর বলে উঠলেন,—'সবাই? সবাই দীক্ষা নেবে? পুরী ছেড়ে আমায় পালাতে হবে দেখছি। দেখ উৎকলে আমার সাত-আটজন দীক্ষিত শিষ্য আছে। এরা অধিকাংশই দক্ষিণ ওড়িশার। এদের মধ্যে কেউ কিছু পেয়েছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ তারা আমার সঙ্গে মিশতে পারে না। সুতরাং ভাবের আদান-প্রদানও হয় না। তোমরা হয়তো শুনেছ আমি আমার বাংলার ভক্তদের বলেছি সহস্র সাধকের মধ্যে হয়তো একজন সিদ্ধ হন। সেই সিদ্ধ পুরুষকে আশ্রয় করে বহুজনের উন্নতি হয়। আমি তোমাদের জন্য সাধন-ভজন করেছি। তোমাদের আর পৃথকভাবে সাধন-ভজন কিছু করতে হবে না। একজন সদ্‌গুরুর শক্তি

পরবর্তী তিন জন গুরুতে সঞ্চারিত হয়। নানকের শক্তি পরবর্তী নয়-জনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জাত হলে তখনই এই শক্তির সংক্রমণ হয়। তাঁর সঙ্গে মেলামেশা আলাপ-আলোচনা হলে তবে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তারি ফল শ্রদ্ধাভক্তি। ওড়িশার শিষ্যদের সঙ্গে আমার তো সে-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কি করে হবে? তারা আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করে না। এই দেখ তোমাদের লোকনাথ, পুরীতেই তার ঘর। কিন্তু সে ছয়মাসে একবার আমার সঙ্গে দেখা করে না। এ-রকম করলে কি হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হয়? বাংলায় আমার এমন অনেক শিষ্য আছে যারা সাধন-ভজন করে না কিন্তু আমার জন্য পাগল। তাদের কি সুন্দর সব অনুভূতি হয়েছে!'

এরপর এই ছাত্রমণ্ডলী ঠাকুরের কাছে আর দীক্ষা চাইলেন না কিন্তু তাঁদের নীলাচল কুটিরে যাতায়াত আরও নিয়মিত হল।

১৩৩৯ সাল শেষ হয়ে গেল।

১৩৪০ সাল—

১৩৪০ সালের ২৪শে বৈশাখ ঠাকুরের চিঠি এল। গরমের ছুটি পড়তেই যেন আমরা পুরী যাই—নির্দেশ দিয়েছেন। বিমলা-মাসীমা ও শুকোমামাকে (শ্রীশুকদেব সেন—ফণীবাবুর বোনপো—ঠাকুর এঁকে আমার গৃহশিক্ষকরূপে মনোনীত করেছিলেন) নিয়ে আমরা মা-মেয়ে প্রায় একবৎসর পরে কিছুদিনের মত পুরী গিয়ে বাঁচলাম। হাওড়ায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল। সব সময় সমুদ্র আর পুরীর খোলা-মেলা আবহাওয়ার জন্য মন কাঁদত।

১৩৪০ সালের বৈশাখেই ডাক্তার মা তাঁর বাড়িখানা ঠাকুরকে বিক্রয়-কবালামূলে দান করেন। পুরী রেজেষ্ট্রী অফিসে সেই বাড়ির (লক্ষ্মণ কুটির) দলিল রেজেষ্ট্রী হয়। হরেনদা নৃপালজী ও সচ্চিদানন্দ সাহা (বোধহয়) সাক্ষী ছিলেন। ১৩৬৭ বা '৬৮ সালে ওই বাড়ি বিক্রীর টাকা বুঝে নিয়ে ডাক্তার মা নীলাচল কুটিরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৩ই আষাঢ় পর্যন্ত ঠাকুর নীলাচল কুটির হতে ভক্তদের চিঠি লিখছেন দেখা যায়। সুতরাং অনুমান করি আষাঢ়ের শেষেই তিনি আমাদের নিয়ে কলকাতা রওনা হলেন। আমাদের পঞ্চাননতলায় রেখে নিজে আবারও বেলঘরিয়ায় গিয়ে উঠলেন। এই সময় অন্নদা বলে মেদিনী-পুরের একটি ছেলে তাঁর সেবক হতে আসে। মনে হয় ছেলেটি আগে খড়কুশমা আশ্রমে কিছুদিন ছিল। তারপর সম্ভবত হরেনদার ভাবী সহচর হিসাবে তাঁকে পুরীতে পাঠাবার কথা হয়। নীলমণিদা পুরী থেকে ঠাকুরের সঙ্গে এসে বেলঘরিয়ায় ছিলেন। পুরী যেতে হলে বা ঠাকুরের সদা সহচর থাকতে হলে কিছু তালিম নেওয়া দরকার। কাজেই অন্নদা ব্রহ্মচারী বেলঘরিয়ায় এসে নীলমণিদা ও ভুবনদার কাছে তালিম নিতে লাগলেন। অল্প দিন পরেই ঠাকুর তাঁকে হাওড়ায় আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের রান্না-খাওয়ার পৃথক ব্যবস্থা ছিল। বাজার-হাট করা আমাকে স্কুলে টিফিন দিয়ে আসা স্কুল থেকে নিয়ে আসা এসব কাজের জন্য মায়ের একজন লোক দরকার হত ঠিকই। এবং সে বেশ বিশ্বাসী লোক হওয়া চাই। এই ভার অন্নদাভাইয়ের উপর পড়ল। ছোটখাট বেঁটে গোলগাল স্ফূর্তিবাজ এই ছেলেটিকে ঠাকুরের বেশ ভাল লেগেছিল। পরে আবার অন্নদা ব্রহ্মচারীর কথা বলব।

বেলঘরিয়া আসার পর ঠাকুরের একখানা গাড়ি কেনা হয় সুধীরদার মাধ্যমে—প্রতিদিন বিকালে ঠাকুরকে একটু বেড়িয়ে আনার জন্য এর-ওর কাছে ধরনা দেওয়ার চেয়ে একটা গাড়ি কেনা ভাল এই তাঁর মনে হয়েছিল। তখন হাজার দেড়েক বা দু'হাজার টাকা হলেই একখানা ভাল গাড়ি হত। এ গাড়িটা বেশ বড় ছিল। আমার স্কুল শনি-রবিবার বন্ধ। সুতরাং শুক্রবার সন্ধ্যায় গাড়ি আসত—অন্নদাভাই আমাদের দুজনকে নিয়ে বেলঘরিয়া চলে যেতেন। কোন-কোনও দিন আমার ছোটমাও (শ্রদ্ধেয় ৺অশ্বিনীবাবুর মেজ মেয়ে ননীমা) সঙ্গী হতেন। তিনি ওই ২০৩ নং পঞ্চাননতলার পাশের বাড়িতেই টিচার্স কোয়ার্টারে থাকতেন। তখন ও-বাড়ি হাওড়া বালিকা বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষিকার বাসস্থলী। তার আগে তিনি আমাদের মতই দাদামশাইদের বাড়ির একজন হয়ে ছিলেন।

অনেক সময় ওই মোটরে বেলঘরিয়া হতে ঠাকুর নিজেই আসতেন। হয়তো আমাদের সঙ্গে দাদামশাইকেও তুলে নিয়ে রেড রোড ধরে একপাক ঘুরে কিংবা কোনও দিন লেক পর্যন্ত বেড়িয়ে, ফেরার সময় তাঁকে পঞ্চাননতলায় নামিয়ে দিয়ে আমাদের নিয়ে চলে যেতেন। গুরুদাস (ফণীবাবুর ছোট ছেলে) আমার সমবয়সী ছিল, সে তো আগেই বলেছি। বেচারী রোজই ভাবে 'লীলুরা কেমন বেড়াতে যায়। আমি যদি একদিন ঠাকুরের সঙ্গে মোটরে বেড়াতে পেতাম!' কিন্তু তার বাবা সেকথা মুখে আনবেন না। 'লীলুটাও এমন মাইরি! কোন দিন ঠাকুরকে বললে না যে, বাবা খোকা আজ চলুক না!' মুখে কিন্তু তখন গুরুদাস ঘুণাক্ষরে এসব আমায় বলেনি। মনে ভয়, বাবা শুনলে মেরে ফেলবেন।



বেলঘরিয়ায় ঠাকুর (১৩৪০)

সেদিনও গাড়ি এসেছে। আমরা উঠেছি, দাদামশাই আর অন্নদা সামনের সিটে। হাফপ্যাণ্টপরা খালি পা আধময়লা একটা হাফসার্ট হাতে—বিমর্ষ মুখে গুরুদাস সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। রোজই থাকত। আচমকা গাড়ি হতে মুখ বার করে ঠাকুর বলে উঠলেন 'আজ খোকাও চলুক আমাদের সঙ্গে—আয় রে!' 'আমি?' হতচকিত গুরুদাস নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারে না। ওদিকে দাদামশাই ধমকে উঠেছেন 'না, না, তুই কোথায় যাবি? এই পড় গে যা…।' 'কেন যাবে না? তুমি থাম তো ফণী। তুই চলে আয় খোকা!' ঠাকুর এ কথা বলামাত্র জামাটা কোনমতে গায়ে গলাতে গলাতে দুই লাফে গুরুদাস গাড়ির দরজার কাছে এসে পড়ে। 'আরে, ও কোথায় যাবে? সর্বাঙ্গে ধূলা-কাদা-নোংরা…আপনার গায়ে লাগিয়ে দেবে হয় তো… জায়গাই বা কই?' সমানে প্রতিবাদ করছেন ফণীবাবু। 'জায়গা হবে, উঠে আয়। যেমন আছিস তেমনি চলে আয় তো'—ঠাকুর ঈষদ্ দৃঢ় কণ্ঠে এই অনুজ্ঞা করতেই মোটরের দরজা খুলে শ্রীমানের ভিতরে প্রবেশ এবং সিটের অভাবে ঠাকুরের পায়ের কাছেই গুটি-সুটি হয়ে উপবেশন। তার সেই বোকা-বোকা অপ্রস্তুত মুখে চকিতে ঠাকুরের দিকে চাওয়ায় ঠাকুর বুঝে ফেলেন ওর ভয়—বাবা না শেষকালে গাড়ি হতে নামিয়ে দেন। আশ্বাস দিয়ে বলেন 'ওখানে কেন, সিটে উঠে বোস্। সুর, লীলাকে কোলে নাও দেখি!' সে-ব্যবস্থা আগেই হয়ে গেছে, সরে বসে মা ওকে উঠতেও বলছেন। কিন্তু গুরুদাস অত নির্বোধ নয়। ও-কাজ করলে বাড়ি ফিরে বাবা পিঠের চামড়া তুলে ফেলবেন না? খুশীতে চকচকে মুখে এক ফালি হাসি—চকিতে আবার ঠাকুরের দিকে একবার চেয়ে খোকা মাকে উদ্দেশ করে বলে 'আমার অসুবিধা হচ্ছে না ছোড়দি, আমি এখানেই বসি।' ইশারায় দাদামশাইকে দেখিয়ে দেয়। ওর শঙ্কা

কোথায় বুঝে মা নিরস্ত হলেন। দাদামশাই ফিরে চেয়ে দেখছেন অবস্থাটা—তাঁর মুখ কঠিন, চোখে রোষ। ঠাকুরও বুঝে গেলেন। গুরুদাসকে আর কিছু বললেন না।

গড়ের মাঠে নেমে সঙ্গী পেয়ে মনের খুশীতে আমি তার সঙ্গে বক্ বক্ করি। গুরুদাসের আনন্দ তো অবর্ণনীয়! ঠাকুর আবার তাকে ঝাল-চানা বাদামভাজা কিনে দিয়েছেন। সেই আনন্দ-স্মৃতি গুরুদাস আজও ভোলেনি। এর পর বেড়াতে যাওয়ার সময় মাঝে-মাঝে ঠাকুর আরও কয়েকবার তাকে সঙ্গে নিয়েছেন। তবু প্রথম দিনের অভাবনীয় প্রাপ্তির সঙ্গে অন্যদিনের কি তুলনা হয়? গুরুদাস বলে, 'ওই যে ঠাকুর আমায় ডাকলেন "খোকা তুই চলে আয়, যেমন আছিস তেমনিই আয়" আমি জানি ওই আমার দীক্ষা হয়ে গেছে। তিনি নিজে যে আমায় সেদিন ডেকে নিয়েছেন!'

গুরুদাসের মনে নাই, রাধাকান্তপুরে যেদিন ভট্টাচার্য পরিবারের সকলকে নিয়ে ঠাকুর এক সঙ্গে খেতে বসেছিলেন, সেদিনও ঠাকুরই তার খোঁজ করে তাকেও ডেকে এক পাশে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তার কথা কারও মনে হয়নি—দিদিমণির মনে থাকলেও বলবেন না, বোঝাই যায়। বেলা তখন প্রায় ছুটো আড়াইটা—খিদেয় আধমরা খোকাকে ঠাকুর কিন্তু ঠিক স্মরণ করেছিলেন। এ-ও ঠাকুরের একটা দিক, আশ্চর্য দরদ আর সবদিকে দৃষ্টি রাখা!

ছুটি রাত ও ছুই দিন বেলঘরিয়ায় পরমানন্দে কাটিয়ে রবিবার সন্ধ্যায় প্যাঁচার মত মুখ করে হাওড়া ফিরতাম। বেড়াতে যাওয়ার পথে ঠাকুরই গাড়িতে আমাদের পৌছে দিয়ে কিছুক্ষণ পঞ্চাননতলার বৈঠক-খানায় বসে দাদামশাই ও দিদিমণির সঙ্গে কথা বলে চলে যেতেন। আমার কান্না পেত। আবার পড়তে হবে, স্কুলে যেতে হবে!

বেলঘরিয়ায় সেবা ও গোপালের সঙ্গে আবার দেখা হল। এর আগে ১৩৩৮ সালের কথা বলতে গিয়ে একবার নীহাররঞ্জন নন্দী মশায়ের নাম করেছি। ইনি বেলঘরিয়ার সুধীরদার ভগ্নিপতি এবং ঠাকুরের শিষ্য। সেবা ও গোপাল তাঁর ছেলে-মেয়ে। পুরীতে সচ্চিদানন্দদা যে-বাড়িতে ছিলেন নীলাচল কুটিরের পার্শ্ববর্তী সেই ছোট জ্যোতিনিবাসেই তাঁরা স্বামী-স্ত্রী ও দুই ছেলে-মেয়ে প্রায় মাস দুই-তিন ছিলেন। সেবা বড় গোপাল ছোট, ফর্সা ফুটফুটে দুটি ভাইবোনকে ঠাকুর বড় পছন্দ করতেন। ওদের শিক্ষা সহবৎ নাকি চমৎকার। আমার মত বুনো জংলি বেয়াড়া জিদী নয়। আমাকে ঠেস দিয়েই ওদের প্রশংসা করা হত। তা হ'ক, চিরদিন নিঃসঙ্গ আমি বাড়ির পাশে ওদের পেয়েই মহানন্দে বন্ধুত্ব করে ফেললাম। একসঙ্গে খেলি দিনরাত। ওরা এ-বাড়িতে আসে, কারণ আমার কোথাও যাওয়া বারণ। একদিন নীহারদা বিশেষ অনুমতি নিয়ে আমাকে তাঁদের ঘরে ডেকে আনলেন। সেবা ও গোপাল আমায় তাদের ঘরে পেয়ে ভারি খুশী। ওদের খেলনা আমায় দেখাচ্ছে, তিনজনে ওখানেই খেলছি। আমার খেলনা ওদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। কিন্তু দুটি নতুন জিনিস ওখানে চোখে পড়ল। দুইরঙা কাঠের বল আর পোড়া মাটীর কালো চকচকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা। পুরীরই খেলনা ও-সব—নিতান্ত তুচ্ছ বলে কিনিনি। আমার নজর থাকত আলুর পুতুল রবারের খেলনায়। কিন্তু সেদিন মনে হল বেশ জিনিস এগুলি। দুবার তিনবার নেড়ে চেড়ে দেখছি আর 'বাঃ কি সুন্দর' বলছি। মনের ইচ্ছা নিয়ে যাই এ দুটি। কিন্তু কারও বাড়িতে খাওয়া বা কিছু নেওয়া আমার নিষেধ জানি। কাজেই মুখে সেকথা আনব না। সেবারা বারবার বলছে, 'তুমি ও-দুটো নাও।' ঘাড় নাড়ি, 'না'। সেবা তখন নীহারদাকে বলল, 'বাবা তুমি লীলুদিকে ওই

রকম একটা বল আর জগন্নাথ কিনে দিও। এ দুটো আমাদের বলে ও নেবে না।' আমি এই কথার পিঠে বললাম 'তোমাদের খেলনা নিলে বাবা বকবেন।' ভারি মিষ্টি স্বভাব ছিল সেবার। তেমনি মিষ্টি কথা। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'তাই তো বাবাকে বলছি ভাই! নতুন কিনে দেবে তোমায় না? তাহলে ঠাকুর আর বকবে না।' এইখানে উচিত ছিল প্রত্যাখ্যান—তাহলেই পিতাঠাকুরের নিষেধের মর্যাদা থাকে। আমার দুষ্টবুদ্ধি, আমি প্রকারান্তরে সম্মতিই জানালাম। তাঁর পরের কথাও কি বলতে হবে? নীহারদা দুটি খেলনা ঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে বলে গেলেন 'খুকি এ-খেলনা দুটো খুব পছন্দ করেছিল। তাই ওর জন্য কিনে এনেছি।' আর যায় কোথায়? সে খেলনা তো ফেরৎ গেলই, সেই সঙ্গে পেলাম কটু ভর্ৎসনা। 'তোমার কি খেলনার অভাব আছে? এত লোভ কেন? যার যা দেখ তাতেই লোভ? আর যদি অত লোভই হয়েছিল বাড়ি এসে বলতে পারনি? লোকের কাছে কিছু চাইতে না বারবার তোমায় নিষেধ করেছি?' চোখের জলে ভেসে একবার বলতে চেষ্টা করেছিলাম আমি চাইনি। কিন্তু নিজেই বুঝি কথাটা মিথ্যা। চাওয়া যায় অনেক রকমে, কেবল মুখে চাইলেই কি আর চাওয়া হয়? তাছাড়া আমি যে চেয়েছিলাম নীহারদা তো তা একরকম বলেই দিয়েছেন। পুরা একদিন বাবা আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি, কাছে ডাকেননি। বড় হওয়ার পর এমন বকুনি আর খাইনি তাঁর কাছে।

তবে অত বকুনি না খেলেও পরোক্ষ শাসন এবং মৃদু ভর্ৎসনা ঢের সইতে হয়েছে। তাছাড়া একদিন প্রচণ্ড এক ধমক খেয়েছিলাম। সেটা এখানেই বলি। ওই বেলঘরিয়াতেই কোনও এক শনি-রবিবারের ঘটনা।

সকাল হতেই সেদিন পিতাঠাকুরের মেজাজ ভাল নাই। মাঝে মাঝে তাঁর এ-ধরনের বিরক্ত বিমর্ষভাব দেখা আমার ততদিনে গা-সওয়া হয়ে গেছে। তেমন গুরুত্ব দিই না তাঁর অপ্রসন্নতাকে। সেইটি আমার কাল হল।

রোদে টো টো করে ঘুরে শরীর খারাপ হলে স্কুল কামাই হবে। সেজন্য ঠাকুর নিজে আমায় দুপুরে তাঁর ঘরে আটকাতেন। ওখানেই শুয়ে ঘুমাতে হত একটু।

সেদিনও যথাসময়ে ডাক পড়ল 'লী-লা!' ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। 'ভুবন, জানলা বন্ধ করে দে' বলে জলের গ্লাসটা ভুবনদার হাতে দিয়ে তিনি আমায় হুকুম করলেন 'শোবে এস।' আমার ঘরে ঢুকেই কি খেয়াল হল কে জানে—তাঁর পায়ের দিকে খাটের যে রেলিং—সেখানে উঠে রেলিঙের ফাঁকে পা গলিয়ে বাঁদরের মত ঝুলছি। 'কিরে, কথা কানে গেল না? বললাম না, এসে শুয়ে পড়্'...'এই যে যাচ্ছি' বলে রেলিঙের ফাঁকে ফাঁকে পা গলিয়ে এক পা এক পা এগোচ্ছি আর খাটের ছত্রি ধরে দুলছি...ভুবনদার জানলা বন্ধ করা সারা, তিনি দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাবেন এমন সময়, ও কি? চড়্ চড়্ করে কি বাজ পড়ল কোথাও? জানলা-দরজা ঠক্ ঠক্ করে কেঁপে উঠল না?... 'বা-হা-র যাও'...সে কী ভৈরব হুঙ্কার! কানে না শুনলে বলে সে-জিনিস বোঝাবার নয়। কোনও মানুষের কণ্ঠে যে এমন রুদ্র আরাব ধ্বনিত হতে পারে, যিনি তেমন কিছু শুনেছেন তিনি ছাড়া অন্যের তা ধারণা হবে না। অবশে কখন যে খাট হতে মাটিতে খসে পড়েছি জানি না। দু'এক মুহূর্ত বোধহয় সম্বিৎ ছিল না, কে কাকে কি বলল তখনও বুঝে উঠতে পারিনি—একটি সিংহগর্জনেই আমি কুপোকাৎ! ভুবনদা তাড়াতাড়ি আমায় এসে ধরলেন। 'নিয়ে যা ওকে' রুষ্ট মুখে

এই বলে শুয়ে পড়লেন শান্তা। তখন বুঝলাম, ধমকটা তাহলে আমাকেই! বাবা অমন করে আমাকে ধমকালেন? কি এমন করেছিলাম? লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যায়, কান ঝাঁ-ঝাঁ করে, চোখে জল এসে যায়। তারই মধ্যে মুখে একটুকবো বোকার মত হাসি ফুটিযে বাইরে চলে যাই—যেন এমন কিছুই হয়নি।

ততক্ষণে যে যেখানে ছিলেন কাজ ফেলে ছুটে এসেছেন। নীচ থেকেও শোনা গেছে সেই ভয়াল নির্ঘোষ—'বা-হা-র যাও।' আমি যেন তখনও শুনছি সেই আকাশ ভেঙে পড়া বাজেব মত আওয়াজ। বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে, থেকে থেকে হাতে পাযে খিল ধবে আসছে, হাঁটু কাঁপছে। 'কি কবেছিল?' সকলেব প্রশ্নে ভুবনদা সস্নেহ প্রশ্রয়ে বললেন 'শুয়ে পড়তে বললেন ২।৩ বার, ও শোনেনি, খাট ধরে ঝুলছিল—তাই। আর কিছু না…।'

আসলে কর্তার যে সকাল থেকে মেজাজ বিগ্ড়িয়েছে সেটা সেবক-সেবিকারা জানতেন। কাজেই তাঁরা এতে তেমন আশ্চর্য না হয়ে বরং আশ্বস্তই হলেন। লীলার অপবাধ গুরুতব হলে তার জের সহজে মিটত না উল্টে তাঁদের কপালেও দুঃখ ছিল। শুনতে হত, মেয়েকে তোমরা অসভ্য বেয়াদব বানাচ্ছ।

মৌন অভিমানে আমি কিন্তু মনে মনে জেহাদ ঘোষণা করি 'আর বাবার কাছে যাব না। কি এমন করেছিলাম যে অত ধমকালেন রাগ করে?' চুপি চুপি সবার অগোচরে চোখ মুছি বার বার।

বিকালবেলাই কিন্তু আবার ডাক পড়ল, 'লীলা!' আমিও তৎক্ষণাৎ হুজুরে হাজির। বাব্বা, আর কি এতটুকু অমান্য করতে পারি সে ডাক? কি জানি কপালে আবার কি জুটবে, ভারি ভয় করছিল। 'বেড়াতে যাবি না? যা জামা পরে আয়…।' মনে-মনে

কৃতার্থ হয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেজেগুজে আসি। এত শীগ্‌গীর যে ক্ষমা মিলবে আশাই করিনি। কাজেই আমার স্ফূর্তি দেখে কে? তিনি আমার হাত ধরে গিয়ে মোটরে উঠলেন।

আড়ালে মায়েরা মুখ টিপে হাসেন। কেমন জব্দ—আদরে আদরে মেয়ের বড় বাড় বেড়েছিল। কারও কথা মানতে চায় না, ঠাকুরকে ভয় করে না!

বেলঘরিয়াতেই সেবা ও গোপালের সঙ্গে বহুদিন পরে নতুন করে দেখা হল। তিনজনই আগের চেয়ে বড় হয়েছি। কাজেই পুতুলখেলার বন্ধুত্ব আর জমল না। কিন্তু বাবার সঙ্গে তাদের আগের মতই ভাব দেখলাম। হাতে তুড়ি দিয়ে ছোট্ট গোপাল একটা গানের কলি গাইত তারস্বরে—'জবাফুলের কুঁড়ি মোরা খন্দ (গন্ধ!) পাবে না। পক্ষুটিত জবা মোরা খন্দ পাবে না।' উচ্চারণ ভাল করে হয় না ওর, তার উপর কি যে গানের আদ্যন্ত তারও ঠিক নাই। কিন্তু এ-গান শুনে বাবা একেবারে উচ্ছ্বসিত। নিজেও তুড়ি দেওয়ার চেষ্টা করে ওকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন "জবা ফুলের কুঁড়ি মোরা"—তারপর কি গোপাল?' গোপালবাবু অমনি আবার চেঁচিয়ে গান ধরতেন। বেলঘরিয়ায় দেখা হতেই ঠাকুর ওর গান শুনতে চাইলেন। সে-ও শুনিয়ে দিল দু'চারটা। তারপর একটা মজার কথা হল। গোপাল 'হিসি' করবে চুপি-চুপি ঠাকুরকে জানাল। তিনি বললেন 'বেশ তো প্যাণ্ট ছেড়ে ছাতের ওই কোনায় যাও।' 'না, লোক রয়েছে চারদিকে'—গোপাল ঘাড় নাড়ে। 'আচ্ছা ওরা চলে যাবে। আমি থাকব তো?' ঠাকুরের প্রশ্নে গোপাল বলে উঠল 'হ্যাঁ তুমি থাক, তোমাকে লজ্জা করবে না।' 'কেন রে?'

ভাই-বোন সমস্বরে উত্তর দিল 'তুমি যে ঠাকুর! তোমায় কেন লজ্জা করবে?' কী সুন্দর সরল প্রাণের আত্মীয়তা! সেবা ও গোপাল আজ কোথায় জানি না। কিন্তু তাদের ওই কথাটি ভুলিনি। কথাটি শুনে ঠাকুরের চোখ ছল ছল করে উঠেছিল তা-ও ভোলবার নয়।

বেলঘরিয়াতেই ঠাকুরের আরেকটি ছোট্ট বন্ধুকে দেখেছিলাম। সে ভুবনদাদের কোন আত্মীয়। বাবা-মা ভাই-বোনদের সঙ্গে এসেছিল, ফর্সা গোলগাল ছেলে। তখনও তাঁরা কেউ উপরে ঠাকুরের কাছে আসেননি। ও কেমন করে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে তুর্ তুর্ করে একা দোতলায় উঠে এসে একেবারে ঠাকুরের কাছে। 'এ কি বন্ধু তুমি?' উৎফুল্ল অভ্যর্থনা জানান ঠাকুর। ছেলেটি পূর্ববঙ্গের টানে গড়গড়িয়ে বলে যায় বাবা মায়েরা সবাই এসেছেন নীচে। ও একা আগে এসেছে ঠাকুরকে দেখতে। তারপর গলা নামিয়ে গোপন খবর দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে 'ফুল আন্‌ছে আরও কত কি আন্‌ছে। তোমারে হাজাইব গুজাইব।' চোখ বড় বড় করে ঠাকুরকে বলতে হয় 'তাই নাকি? হাজাইব গুজাইব?' বাঙাল কথা তাঁর মুখে অদ্ভুত শোনায়। আমি হেসে ফেলি। নবাগতের সঙ্কোচ নাই। সে ঠাকুরের গা ঘেঁষে বসে কত কি যে বলে! এরকম সখা ঠাকুরের অনেক গৃহস্থবাড়িতেই জুটত। শিশুরা কেমন করে যেন এই 'বিরাট শিশু'টিকে নিজেদের একজন বলে চিনতে পারত।

মায়ের মুখে আরেকটি ঘটনা শুনেছিলাম। ভ্রমণান্তে একবার নীলাচল কুটিরে ফিরে ঠাকুর নিজে এ-গল্পটি করেছিলেন। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র কিছুই আর মায়ের এখন স্মরণ নাই।

সেবার কোনও এক শিষ্যগৃহে ঠাকুর রয়েছেন। একদিন ন'টা নাগাদ তিনি আপন মনে শৌচাগারের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় পিছন থেকে

ঝিন্‌ঝিনে মিঠে গলায় কে যেন বলে উঠল 'থাতুল! আমালে বান্দি।' চমকে ফিরে চেয়ে ঠাকুর দেখেন আঙিনার একপাশে ফর্সা ফুটফুটে একটি বাচ্চা—তার দুই হাত শক্ত করে এক গাছের সঙ্গে বাঁধা! রোদ এসে পড়েছে কচি মুখে—ঘেমে লাল হয়ে উঠেছে একেবারে। তাড়াতাড়ি নিজের হাতে তার বাঁধন খুলে দিতে দিতে ঠাকুর বলে ওঠেন 'এই, কে ওকে এমন করে এখানে বেঁধে রেখেছিস্?' তাঁর চড়া গলার হাঁক শুনে বড়রা ছুটে এসে ব্যাপার দেখে বলেন—'বড় দুরন্ত ও—, ভোগের কোনটা যে কখন নষ্ট করে ঠাকুর তার ঠিক নাই'…। বাধা দিয়ে ঠাকুর বললেন 'যাই করুক, ওকে আর বাঁধবি না। ও যে আমার কাছে নালিশ করেছে…'

সে কোন্ সুকৃতিশালী গো, ঠিক জায়গাটিতেই বন্ধনমোচনের দরবার করেছিল বটে!

১৩৪০ সালের কার্তিক মাসে বেলঘরিয়া হতে ঠাকুর ভ্রমণে বার হলেন। ৯ই কার্তিক তিনি ঘড়িসার গিয়েছিলেন। ঘড়িসারনিবাসী শ্রীহরিদাস কুড়ি বহুদিন আগে ঠাকুর যখন কাশীতে ৪৮ নং পিলখানায় আছেন তখন তাঁর ঘড়িসারযাত্রার পাথেয় পাঠান। কিন্তু ঠাকুর সে টাকা ফেরৎ দিয়েছিলেন। তখন হতেই ঘড়িসার বোধহয় আকুলভাবে তাঁকে কামনা করেছে। আর ঠাকুরও তাঁদের ব্যাকুলতা প্রাণে অনুভব করেছেন। ১৩৩৮ সালে তদানীন্তন মঠাধ্যক্ষ প্রজ্ঞানন্দ মহারাজকে ঘড়িসারবাসীবৃন্দ জিজ্ঞাসা করেন 'দাদা, কি করলে আমরা ঠাকুরকে আমাদের মাঝখানে পাব?' মহারাজ উত্তর দিলেন 'তাঁর কাজ করলেই তাঁকে পাবে। সম্প্রতি মঠে গৃহসংস্কার হচ্ছে। তোমরা তাঁর কাজের জন্য পাঁচশ টাকা দাও।' ঘড়িসার সংঘ নিতান্ত ছোট একটি সংঘ। তবু সংঘসেবীরা প্রাণপণে এ টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুই

বৎসরের মধ্যে দুইশত পঞ্চাশ টাকার বেশি তাঁরা মহারাজকে দিতে পারলেন না। সুতরাং ঠাকুরকে তাঁদের পাওয়া হবে না এই ভেবে সকলেই যখন মনঃক্ষুণ্ণ এমন সময় প্রজ্ঞানন্দ মহারাজকে ঠাকুর চিঠি দিলেন 'ঘড়িসারবাসীর আকুল আহ্বান আমাকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি ৯ই কার্তিক আসিতেছি, তোমরা প্রস্তুত হও।'

ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে সেবার ঘড়িসারে বিভাগীয় সম্মিলনী হয়। তাঁর সঙ্গে নীলমণিদা ও ভুবনদা সেবক হিসাবে এসেছিলেন। আর দাদামশাই (ফণীবাবু) নৃপেন রায় যোগেশ্বর গাঙ্গুলী নরেশচন্দ্র পাকড়াশী হরপ্রসাদ রায় প্রসন্নকুমার দাস দুর্গাচরণ দত্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট শিষ্য-ভক্তরা সঙ্গী হয়েছিলেন। প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ তো ঘড়িসারে ছিলেনই! সেবার ঘড়িসারে ও পার্শ্ববর্তী দশ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম সর্বত্র যে কি উল্লাস কলরোল উঠেছিল ঠাকুরমহারাজকে নিয়ে, দাদামশাই একখানা চিঠিতে মাকে তা লিখে জানিয়েছিলেন। দিনে রাত্রে হাজার হাজার লোক একবার তাঁর দর্শন ও প্রণামের জন্য অপেক্ষা করত।*

ধন্য হইল ধরণী তোমার রাতুল চরণ পরশিয়া।
দীনহীন জন হইল ধন্য তব কৃপাকণা লভিয়া॥
যুগে যুগে তুমি গুরুরূপে আসি
ঘুচাও ধরার দুঃখ তাপ রাশি
শুষ্ক হৃদয় সিক্ত কর গো করুণা-অমৃত সিঞ্চিয়া॥
নিগমানন্দ রূপেতে এবার প্রকাশিলে যদি ভূতলে
অনাথ কাঙাল মোরা যাচি ঠাঁই তব শ্রীচরণতরুমূলে।
ভজনবিহীন মূঢ় অভাজনে নিজ কৃপাগুণে ক্ষমিয়া
ধন্য কর গো স্নিগ্ধ করুণ করুণাকণা প্রদানিয়া॥

* দ্রষ্টব্য. আর্যদর্পণ—১৩৭৬ মাঘ।

—এই সুন্দর গানটিও সেবার ঘড়িসার সংঘের প্রেমাঞ্জলি। ঘড়িসার থেকে ঠাকুর গেলেন সন্দ্বীপ। ১৩ই কার্তিক রওনা হয়ে ১৪ই কার্তিক চট্টগ্রাম পৌছে সন্দ্বীপ রওনা হওয়ার আগে আমিলাইসের ভক্তদের তিনি বলে গেলেন ১৭ই বা ১৮ই কার্তিক তিনি আবার চট্টগ্রাম ফিরে এসে আমিলাইস যাবেন। সন্দ্বীপে সেবার কেন, বরাবরই ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দোৎসবের সমারোহ পড়ে যায়—আমরা সন্দ্বীপনিবাসী গুরুভগ্নীদের কাছে শুনেছি। পরলোকগতা সরযূ-মা সন্দ্বীপের মেয়ে ছিলেন। তাঁর আত্মীয়পরিকরদের মুখে শুনেছি ঠাকুরের আগমনে কিভাবে সন্দ্বীপ টলমল টলমল করত। কিন্তু আমিলাইস গ্রামের অভ্যর্থনা অভিনব। মোটকথা এবার যেন ঠাকুর মহারাজকে ঢাকা চট্টগ্রাম নতুন করে বুকে পেয়েছিল। শ্রীমৎ সিদ্ধানন্দ মহারাজের কাছে আমিলাইস গ্রামের উৎসব-বিবরণী দেখেছি। প্রজ্ঞানন্দ মহারাজের কাছে পূর্ববঙ্গবিজয় নামে একখানা খাতায় সেবারের মহামহোৎসবের কাহিনী লিপিবদ্ধ ছিল। আমি এখানে স্বয়ং ঠাকুর মহারাজের একখানা চিঠি উদ্ধৃত করে সেবারের ভ্রমণকাহিনীর পরিচয় দেব—

'এবার যে কি লগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম বলিতে পারি না। ঘড়িসারের কথা ফণির পত্রে জানিয়াছ। সর্বত্রই এবার ঐরূপ বিরাট অভ্যর্থনা। বিশেষতঃ সন্দ্বীপ আমিলাইস রোসাংগিরি প্রভৃতি চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থান উল্লেখযোগ্য। এসব স্থানে ভক্তসংখ্যাই অধিক কাজেই প্রাণের পরশও বেশী। * * *

'১৫ দিন চট্টগ্রামেই কাটিয়া গেল। অনেক স্থানের লোককে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছে। ভক্তের আকুলিবিকুলি ও বুকফাটা কান্না দেখিলে পাষাণও স্থির থাকিতে পারে না। সাক্ষাতে ভিন্ন পত্রে সে সব কথা লেখা অসম্ভব এবং সময়ও নাই। এবার যেন দিগ্বিজয়ে বাহির

হইয়াছি। সঙ্গেও বহু গৃহস্থ ভক্ত চলিতেছে। রাস্তায় ঘাটে নদীবক্ষে সর্বত্রই লোক। যাক, এখান হইতে ৫ই শ্রীহট্টে যাইব। ৮ই শিলচর যাইবার কথা। আর কোথাও যেতে হবে কি-না এখনও অজ্ঞাত। তবু ১৫ই-এর পূর্বে মঠে পৌঁছিতে পারিব না।

'ভুবন প্রাণপণে আমাকে আরামে রাখিয়াছে। একমাত্র তাহার জন্যই এত লোকের ভিড়ে আমার আরামের ব্যাঘাত হয় নাই। প্রজ্ঞানন্দ অনর্থক ভক্তদের উপর রাগিয়া মাঝে মাঝে শান্তি ভঙ্গ করে। লজ্জাও পেতে হয়। তবে তার ধাত অনেকেই জেনে নিয়েছে। ভুবন সব দিকেই উপযুক্ততার পরিচয় দিচ্ছে। ভুবন সঙ্গে না থাকিলে আমার পক্ষে এরূপ পর্যটন অসম্ভব হইত সন্দেহ নাই।'

এই চিঠিখানা ২রা অগ্রহায়ণ ময়নামতী আশ্রম হতে লেখা। মনে রাখতে হবে ঠাকুরের চলে যাওয়ার আর ঠিক দু'বছর বাকী ছিল। এই বিজয়োৎসব বিসর্জনের বিজয়া। শ্রীগৌরাঙ্গ যেবার শেষ বাংলা ভ্রমণে এসেছিলেন বাঙালী যেন অন্তরে বুঝেছিল আর পাব না প্রেমের ঠাকুরকে। তাই যেখানে তিনি গেছেন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ঠাকুরের এবারকার পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে যেন অনেকটা তেমনি আকুলতা ফুটেছিল জনসাধারণের। ভক্তশিষ্যরা শুধু নয়, সর্বসাধারণ যেন ছুঁতে চেয়েছে, কাছে পেতে চেয়েছে তাঁকে। তিনিও অবিরাম ঘুরেছেন। ১৩৪১ সালের শেষার্ধ হতে '৪২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্তও আবার একটানা বাইরে থেকেছেন। এ সবই বিদায়ের প্রস্তুতি। নীচের চিঠিখানায় তার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত পাই। ৪ঠা পৌষ মঠ থেকে লিখলেন,—

'সম্মিলনীতে আমার উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। মঠ ও আশ্রমের ভার পুনরায় ট্রাষ্টির হাতে দিয়া আমি অবসর লইব। সম্মিলনীতে উপস্থিত না হইলে সে সুবিধা হইবে না।'

সেবার জোড়পাকড়ি (জলপাইগুড়ি) আশ্রমে ভক্তসম্মিলনী হয়েছিল। ঊনবিংশ বার্ষিক ভক্তসম্মিলনী সেটি। তাঁর নির্বাচিত প্রথম মঠাধ্যক্ষ বিদায় নেওয়ায় কিছুদিন ঠাকুরকে আবার মঠাশ্রমের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এবার নতুন করে সে ভার পরিত্যাগ করার তোড়জোড় আরম্ভ হ'ল।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ঠাকুর বেলঘরিয়া হতে পুরীতে চলে গেলেন। আমি মা এবং অন্নদাভাই তাঁর সঙ্গী হলাম। স্কুল ছাড়িয়ে আমাকে বাড়িতে পড়িয়ে ম্যাট্রিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। আগেই বলেছি সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে ঠাকুর দেশের এবং বিদেশের সব রকম সংবাদ খুঁটিয়ে রাখতেন। তার ফলে জাগতিক ব্যাপারে এত ওয়াকিবহাল ছিলেন যে যুক্তিসহায়ে অনায়াসে কতগুলি ভবিষ্যদ্‌বাণী করতে পারতেন। যেমন এই ১৯৩৪ সালেই (বাংলা ১৩৪০-৪১) তাঁকে বলতে শুনেছিলাম আবার একটা মহাযুদ্ধ বাধবে আর সেই যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। এ-উক্তি তাঁর যোগজ জ্ঞানসম্ভূত না বলে পত্র-পত্রিকা খুঁটিয়ে পড়ার ফলই বলব। তিনি নিজেও তা-ই বলেছিলেন। বলেছিলেন 'হাওয়া কোনদিকে বইছে কাগজপত্র পড়লেই বোঝা যায়।' যাই হ'ক—তিনি জেনেছিলেন ইংরেজী ১৯৪১ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলায় ম্যাট্রিক পরীক্ষা গ্রহণ করবে। তাঁর ইচ্ছা হল যে-বৎসর প্রথম বাংলায় পরীক্ষা নেওয়া হবে আমি যেন সেই বৎসরই ম্যাট্রিক দিই। আমার মাষ্টারমশাই শুকোমামার সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ ক'রে দুই বৎসরের জন্ম তাঁকেও ঠাকুর পুরীতে আনার ব্যবস্থা করলেন।

বাবা পুরী যাওয়ার পর ১৩৪০ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কটকের গুরুভাই শ্রীচৈতন্তচরণ দাসের দীক্ষাগ্রহণ।

১৯২৬ সালে চৈতন্যদা ছিলেন স্কুলেব ছাত্র। স্কুল-প্রাইজ হিসাবে একজন ছাত্র ব্রহ্মচর্য-সাধন পেয়েছিল। তার কাছ থেকে নিয়ে সেই বইখানা পড়ে চৈতন্যদার বড ভাল লাগল। গ্রন্থকারের নির্দেশানুযায়ী আসন অভ্যাস করতেন, সচ্চিন্তা সদ্‌ভাবে জীবনযাপনের আদর্শ মানতে চেষ্টা করতেন। উনি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। জলপানি হিসাবে দিন দুটি পয়সা বরাদ্দ ছিল। একবৎসব ধরে সেই পয়সা থেকে কিছু কিছু জমিয়ে দেডটাকা দিয়ে একখানা যোগীগুরু কিনলেন। বইয়ের নাম ও প্রাপ্তিস্থান ব্রহ্মচর্য-সাধন থেকেই পাওয়া। সেই বই পড়ে চৈতন্যদার একটি ধারণা পাকা হয়ে গেল—গুরু ছাড়া কিছু হয় না, হবেও না। এবার আসাম মঠে ঠাকুরের দর্শন চেয়ে চিঠি লিখলেন। প্রজ্ঞানন্দ মহাবাজ উত্তর দিলেন আসামে এলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে। আসাম যাতায়ত মানে ত্রিশ টাকার ধাক্কা। দিন দুটি পয়সা যার আয, কি করে ত্রিশ টাকা সে ব্যয় করবে? মাঝে-মাঝে কেবল রিপ্লাই কার্ড দিয়ে মঠেব খবর নিতেন। ঠাকুর কোথায় আছেন কি করছেন যেটুকু জানতে পারেন ভাল লাগে। কখনও যাঁকে চোখে দেখেননি কেবল লেখা পড়ে আর ফটো দেখেই তাঁর সম্বন্ধে আশ্চর্য একটা আকর্ষণ চৈতন্যদাকে থেকে-থেকে উন্মনা করে। আবার পাঁচ কাজে ভুলে যান। এমনি করে বছর ঘুরে যায়। ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিক পাশ কবে চৈতন্যদা সমাজ অফিসে চাকরিতে ঢুকলেন। জীবনের নব অধ্যায় আরম্ভ হল। মঠে চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেছে। যে ছিল ছাত্র সে এখন সংসারের দায়িত্ব নিতে চলেছে। ভাবুকতা রেখে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সেইদিকেই সর্বশক্তি নিয়োগের পালা শুরু হয়েছে। আরও চারবছর কেটে গেল তারপর। ১৯৩৪ সালে প্রজ্ঞানন্দ মহারাজ অযাচিতভাবে সংবাদ দিলেন ঠাকুর পুরীতে নীলাচল

কুটিরে বাস করছেন। সেখানে গেলে দেখা হবে। অপ্রত্যাশিত এ-সংবাদে ছাত্রজীবনের সেই প্রবল আকাঙ্ক্ষা নতুন করে জেগে ওঠে মনে। যিনি সুদূর আসামে ছিলেন, তিনি আজ এত কাছে? তাড়াতাড়ি নীলাচল কুটিরে চিঠি লেখেন চৈতন্যদা। কিন্তু উত্তর আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে মন মানে না। অল্পদিন আগেই রথযাত্রা হয়ে গেছে। উল্টা রথের দিন 'যাই রথ দেখে আসি' বলে পুরীর গাড়িতে উঠে বসেন। স্বর্গদ্বারে এসে নীলাচল কুটির খুঁজে বার করে হরেনদার সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি প্রথমে আমলই দিতে চান না। দেখা হবে না বলে বিদায় দিতে চান। চৈতন্যদা চুপ করে বসে থাকেন বাইরের ঘরে। মানুষটি শান্তপ্রকৃতির এবং স্বভাবত অল্পভাষী। কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তা আছে। একবার অন্তত ঠাকুরকে দেখব এই ভেবে মৌন মুখে বসে থাকেন। হরেনদা আরও দুবার তাড়া দিলেন এসে—'এখনও বসে আছ কেন? বলছি দেখা হবে না।' কোনও উত্তর নাই, চৈতন্যদা বসেই আছেন। দুর্গাচরণদা প্রমুখ স্কুলের ছাত্রগুলি একরকম হরেনদার পক্ষপুটে আশ্রিত বললেই চলে। এদের তিনিই প্রথমে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। সেজন্য ঠাকুরের কাছে তাঁকে কিছু তিরস্কারও শুনতে হয়েছে। এরা যখন কেবল আসত আর উপদেশ শুনত, তখন ঠাকুর কিছু বলেননি। কিন্তু তারা দীক্ষা চাওয়ার পর হরেনদা বকুনি খেয়েছিলেন। দীক্ষা চাওয়াটা হরেনদার পরামর্শ—ঠাকুরের এই মনে হয়েছিল। কাজেই নতুন কাউকে আমল দেওয়ায় হরেনদার দ্বিধা স্বাভাবিক।

যাই হ'ক, অনেক করেও যখন চৈতন্যদাকে তাড়ানো গেল না তখন বেলা সাড়ে এগারটা আন্দাজ হরেনদা এসে বললেন 'যাও মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ খেয়ে এস। বিকালে দেখা যাবে।' প্রসাদ খেয়ে ফিরে আসার সময় উঠানির (নীলাচল কুটিরে আসার পথে এক জায়গায় রাস্তা বেশ

উঁচু চড়াইয়ের মত ছিল বলে স্থানীয় ভাষায় ওকে 'উঠানি' বলা হত) কাছে গোবিন্দ পট্টনায়কের সঙ্গে দেখা। গোবিন্দদা তাঁর আসার উদ্দেশ্য শুনে বললেন 'চিঠি দিয়ে উত্তর না পেয়েই এলেন কেন? এটা আপনার অন্যায় হয়েছে। যাক, যান। যদি নিষ্ঠা থাকে ঠাকুরের দেখা পাবেন।'

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে-দুলতে নীলাচল কুটিরে ঢোকেন চৈতন্যদা। ঢুকেই যে-উৎকলদেশীয় ভদ্রলোককে দেখলেন, তিনি দুর্গাচরণদার বাবা। সেদিন কোনও কারণে তিনিও ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেছিলেন। চৈতন্যদা তাঁকে বলেন 'একবার দর্শন পেলেই পালাব, বেশি কিছু চাই না।' দুর্গাচরণদার বাবা আশ্বাস দিয়ে বললেন 'তা কেন? আমি ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।' অবশেষে ঠাকুরকে দেখা হল। ছাত্রাবস্থা থেকেই ব্রহ্মচর্য-সাধন পড়ে মঠের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন চৈতন্যদা, প্রজ্ঞানন্দ মহারাজই তাঁকে নীলাচল কুটিরের হদিশ দিয়েছেন একথাগুলি চৈতন্যদার ভাল পরিচয়পত্র বলতে হবে। ঠাকুর এই ছেলেটিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন।

এরপর থেকে চৈতন্যদা অবসর পেলেই কুটিরে এসে তাঁর জাত-ভাইদের সঙ্গে মিলে ঠাকুরের উপদেশ শুনতেন, পরস্পরে সেসব আলোচনা করতেন। তাঁর দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা আছে বুঝে দুর্গাচরণদা শিখিয়ে দিলেন 'তুমি নিজে মুখ ফুটে দীক্ষা চাও ঠাকুরের কাছে। সস্ত্রীক দীক্ষা চাইবে।' চৈতন্যদা তাঁর কাছ থেকে সাহস পেয়ে একদিন নিজের প্রার্থনা জানালেন। আশ্চর্যের কথা একবার বলতেই ঠাকুর রাজী হয়ে গেলেন।

১৯৩৪ সালে ৬রা মার্চ (১৩৪০ ফাল্গুন) দোলপূর্ণিমার দিন চৈতন্যদা ও তাঁর স্ত্রী ঠাকুরের কাছে দীক্ষা পেলেন। এর আগে ঠাকুরের কথা

হতেই আমরা জেনেছি যে ওড়িশায় তাঁর আরও ৭।৮ জন দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। কিন্তু আমি যাঁদের চিনি তাঁদের মধ্যে গুণনিধিদা ১৯৩৩ সালের ১৩ই এপ্রিল দীক্ষা পান। তারপরই সস্ত্রীক চৈতন্যদা। অন্তত নীলাচল-বাণী পড়ে এই ধারণাই আমার হয়েছে। আর চৈতন্যদা যেদিন দীক্ষা নিলেন সেই দিন সন্ধ্যাতেই একজন বন্ধুর সঙ্গে বনমালীদা প্রথম দেখা করতে আসেন। বনমালীদা নীলাচল কুটিরে যখন এলেন ঠিক সেই মুহূর্তে একটা মজার আলোচনা চলছিল। এখানে তার সারাংশ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

কোনও একজন ভক্ত সেদিন ঠাকুরকে আর্যদর্পণের হিমাচলের পথে প্রবন্ধটির উল্লেখ করে প্রশ্ন করেছিলেন সদ্‌গুরুর শিষ্য হলেই তার তিনজন্মে মুক্তি ঘটে কি-না। উত্তরে ঠাকুর বলেন 'আর্যদর্পণে একথা লেখা হলেও আমি কথাটা মানি না।' বলে তিনি সচ্চিদানন্দজীর কাছে শোনা সেই গল্পটি বললেন—এক শিষ্য কিরকম সদ্‌গুরুর আশ্রিত হয়েও কুকুর ও সর্পযোনিতে গিয়ে বদ্ধ হয়েছিল। তারপর বললেন, 'আমি কিন্তু জগদ্‌গুরুকে চুক্তিতে আবদ্ধ করে তবে গুরুগিরির ভার নিয়েছি। গুরুগিরি করা আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আচার্যঋণ পরিশোধের জন্য যখন আমায় গুরুভার নিতেই হল তখন আমি গুরুর কাছে প্রার্থনা জানাই যে আমার শিষ্য যারা হবে আমার শত্রুতাচরণ করলেও তারা যেন তিন জন্মে মুক্ত হয় এই বিশেষ শক্তি আমায় দাও। জগদ্‌গুরু আমায় সে-শক্তি দিয়েছেন বলেই যারা আমার শিষ্য হতে চায় আমি সহজে তাদের ফেরাই না। অনেকে বলে ঠাকুর তুমি পরীক্ষা না করে শিষ্য কর না। আমার কথা হল আমি তো কাউকে বিপথগামী হবার জন্য শিষ্য করি না। যদি আমার কথা শোনে, মহা উপকার হবে।

না শুনলেও ক্ষতি হবে না। আমি যদি পরীক্ষা করে শিষ্য গ্রহণ করতে বসি তাহলে কোনও শালা সে-পরীক্ষায় টিকবে না বেশ জানি।'

ঠিক এই কথাটি বলেছেন আর দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখা দেখা গেল পুরীর স্বনামধন্য উকিল এবং উৎকলমণি গোপবন্ধু দাসের অনুবর্তী যশস্বী কংগ্রেসকর্মী বনমালী দাশ বি-এ, বি-এল এক বন্ধুর সঙ্গে ঠাকুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী। ওড়িশার ভক্তসঙ্ঘে সেইদিন একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

বনমালীদা পরপর কয়েকদিন নীলাচল কুটিরে এসে ঠাকুরকে তাঁর কতকগুলি জিজ্ঞাস্য জানান। তিনি দুর্গাচরণদাদের মত অল্পবয়সী ভাবপ্রবণ নন, রীতিমত পণ্ডিত ও প্রবীণ ব্যক্তি। ঠাকুরের বইগুলি বিশেষ করে যোগীগুরু ও তান্ত্রিকগুরু তাঁর অনেকদিন আগেই ভাল করে পড়া ছিল। এখনও তাঁর বলিরেখাঙ্কিত ললাটে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টি মনে পড়ে। খুব নীচু গলায় চমৎকার বাংলাতে একেকটি প্রশ্ন করে ঠাকুরের মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন। কেবল যে উত্তরটি মনে-মনে যাচাই করে নিতেন তা নয়, উত্তরদাতাকেও তিনি তাঁর জ্ঞানবুদ্ধিমত যাচাই করতেন। এই প্রৌঢ় উৎকলী ব্রাহ্মণকে ঠাকুরও প্রথম থেকে কেন কি জানি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। দ্বিতীয় দিন আসতেই হরেনদাকে বলেছিলেন তাঁর [illegible] কম্বলাসন পেতে দিতে। বনমালীদা অবশ্য আসনে বসেননি, ঠে[illegible] সরিয়ে রেখে মাটিতেই বসেছিলেন। আলাপ-আলোচনায় বনমালীদা কতটা ঠাকুরকে বুঝেছিলেন জানি না। আমি তাঁকে একদিন এ প্রশ্ন করায় তিনি স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন। তাঁর সদাসহচর দীনবন্ধুদা (ডাঃ মহাপাত্র) বললেন, 'পরে ঠাকুরের সমগ্র জীবনী ও বাণী অনুধ্যান করে যা বুঝেছেন তখন অত শ্রদ্ধা নিশ্চয়ই হয়নি মা! কিন্তু শক্তিমান

ধু মনে হয়েছিল। তা নইলে দাদা দীক্ষা নিতেন না।' দীনবন্ধুদার
া সত্য। ওড়িশায় কুলীন ব্রাহ্মণগোষ্ঠি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। দেশাচার
াচার ও শাস্ত্রসম্মত বিধি এবং জগন্নাথ মহাপ্রভু ছাড়া সহজে কারও
াছে তাঁরা মাথা নোয়াতে রাজী হন না। তার উপর বনমালী দাশ
রেজী শিক্ষিত যুক্তিবাদী। অথচ তিনি কয়েকদিন যাতায়াত করেই
ক্ষা চেয়ে বসলেন। ঠাকুরের ব্যক্তিত্বে অভিভূত না হলে এটা
নি করতেন না। ঠাকুরও এই মানুষটিকে যোগ্য অধিকারী মনে
রেছিলেন। বনমালী দাশ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ দেখে আমাদের মনে
য়ছিল ঠাকুর যেন এতদিনে ওড়িশায় একটি মানুষের মত মানুষ
জে পেয়েছেন।

১৯৩৪ সালের ২০শে মার্চ বনমালীদার দীক্ষা হয়ে গেল। তার
াদিন পরেই বিশেষ প্রয়োজনে ঠাকুরকে দিন কুড়ির জন্য কলকাতা
ত হয়। কি এই প্রয়োজন কোথাও তার কোন সূত্র দেখছি না।
ড়শার ভক্তদের বলেছিলেন ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে যেতে হচ্ছে।
ই এপ্রিল তিনি আবার পুরী ফিরে এলেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত